# বিশ্বায়ন

## সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি

ইয়াসির নাদীম

# বিশ্বায়নঃ

## সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি

(দ্বিতীয় সংস্করণ)


মূল

ইয়াসির নাদীম (ভারত)

অনুবাদ

শহীদুল ইসলাম ফারুকী

শিক্ষক, মাদরাসা দারুর রাশাদ,

মিরপুর, ঢাকা।

সম্পাদনায়

জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ



প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

মগবাজার, ঢাকা

# বিশ্বায়নঃ সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্রাটেজি

## মূলঃ ইয়াসির নাদীম

অনুবাদঃ শহীদুল ইসলাম ফারুকী

**প্রকাশনায়**
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
মগবাজার, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৭১১-১২৮৫৮৬

**প্রকাশকাল**
জমাদিউস সানী ১৪২৬ হিজরী
শ্রাবণ ১৪১১ বাংলা
জুলাই ২০০৫ ইংরেজী

**দ্বিতীয় সংস্করণ**
সেপ্টেম্বর ২০০৮ইং

**মুদ্রণ ও বাঁধাই**
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

**বর্ণ বিন্যাস ও প্রচ্ছদ**
প্রফেসর'স ডিজাইন সেন্টার

নির্ধারিত মূল্যঃ ১৫০.০০ টাকা মাত্র।

PPBN-055
ISBN- 985 31-1426- 55

**Bishshayon: Shamrazzobader Natun Strategy** (Globalizaiton: New Strategy of Imperialism) Globalization Awr Islam in Urdu Written by Yasir Nadim, Translated into Bangla by Shahidul Islam Faruqi, Edited by Zainul Abedin Abdullah Published by Professor's publications, Moghbazar, Dhaka-1217. Phone: 8358734, 01711128586, Printed by Cricent printing press, Moghbazar, Dhaka-1217. Fixed Price : Tk- 150.00 Only.

# মূল লেখকের অনুমতিপত্র

میں دارالعلوم دیوبند کے فاضل مولانا شہید الاسلام فاروقی (بنگلہ دیشی) کو
"گلوبلائزیشن اور اسلام" کے بنگلہ زبان میں ترجمے اور اشاعت کی اجازت دیتا ہوں۔
بشرطیکہ وہ کتاب کے مضامین میں کوئی حذف واضافہ یا ترمیم وتبدیلی نہ کریں۔ اسکے علاوہ اور
کسی کو ترجمے واشاعت کی اجازت نہیں۔ واللہ الموفق والمعین

(یاسر ندیم الواجدی)
دارالکتاب دیوبند
DARUL KITAB
DEOBAND—247554 (U P.)

'আমি দারুল উলুম দেওবন্দের ফাযেল মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী (বাংলাদেশী)-কে 'গ্লোবালাইজেশন আওর ইসলাম' নামক গ্রন্থটির মূল বক্তব্যের মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করে এর বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশের অনুমতি প্রদান করছি। তিনি ছাড়া আর কারো অনুবাদ ও প্রকাশের অনুমতি নেই। আল্লাহপাক তাঁকে সুন্দরভাবে কাজটি সম্পাদন করার তাওফীক দান করুন।

ইয়াসির নাদীম
দারুল কিতাব, দেওবন্দ।

## উৎসর্গ

বিশ্বব্যাপী ইসলামের নব জাগরণের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদের
বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আপোষহীন তরুণদের উদ্দেশ্যে...

# প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ববানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর।

বিশ্বায়ন আজকের পৃথিবীর একটি সুপরিচিত স্লোগান, পুঁজিবাদী বিশ্ব এ স্লোগানের উদ্গাতা, জনগণ বা নিপীড়িত মানুষ নয়, এ স্লোগানের প্রধান ধারক ও বাহক কথিত একক সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তার সাথে আছে পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলো। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর পুঁজিবাদী বিশ্ব নতুন স্লোগান নিয়ে মাঠে নামে। এর উদ্দেশ্য তাদের স্বার্থের বৈধতা দান করা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের মাধ্যমে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে প্রচণ্ড গতিদান করা।

বিশ্বায়ন পুঁজিবাদী বিশ্বের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ার। তারা চায় বিশ্ববাজারে তাদের পণ্যের অবাধ প্রবাহ, তারা চায় তাদের মূল্যবোধ দ্বারাই সবাই পরিচালিত হোক, নিজদের মূল্যবোধের দ্বারা স্ব-স্ব জাতি চলবে এটা তারা মানতে রাজি নয়। তাদের চোখ দিয়ে সবাইকে দেখতে হবে। দুনিয়া মার্কিনী চিন্তায় চলুক এটাই তাদের চেষ্টা। তারা চায় পৃথিবীর সবাই তাদের ভাষায় কথা বলুক এবং তাদের আচরণ গ্রহণ করুক। মার্কিনীরা মনে করছে দুনিয়ায় তারাই সবচেয়ে সভ্য ও অনুকরণীয়, দুনিয়ার সবাইকে তাদের পথ ধরেই চলতে হবে। তাদের অর্থনীতির স্বার্থে স্লোগান দিতে হবে, কেউ তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের পথে বাধা হলে তার বিরুদ্ধে যে কোন কিছু করার অবাধ অধিকার তারা চায়। এতে অন্যদের বড় ধরনের ক্ষতি হলেও তা মেনে নিতে হবে। মানতে না চাইলে জোর করে মানানোর ব্যবস্থা করতে হবে, এ হচ্ছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন। এই বিশ্বায়নের আড়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়িত করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য বহুবিধ-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক। মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য জগত তার একাধিপত্য গোটা বিশ্বের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, বিশ্বায়নের নামে তারা তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বকে নিশ্চিত করতে চায়। বিশ্বায়ন আজ পুঁজিবাদী শোষণের হাতিয়ার। বিভিন্ন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করা বিশ্বায়নের লক্ষ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পাশ্চাত্যের একক আধিপত্য বিস্তার করাই বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর ছোট ও দুর্বল দেশগুলো যাতে কখনও মাথা উচুঁ করে

দাঁড়াতে না পারে, বিশ্বায়নের নামে তার পাকা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিশ্বায়নের লক্ষ্য এক সংস্কৃতি ও এক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে বিশ্বকে নিয়ে আসা, আর সে সংস্কৃতি ও অর্থনীতি হচ্ছে মার্কিন সংস্কৃতি ও অর্থনীতি। সংস্কৃতি ও অর্থনীতির কর্তৃত্বের আড়ালে একক সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাও মার্কিনী বিশ্বায়নের লক্ষ্য। বিশ্বায়নের নামে আমেরিকা চায় এককেন্দ্রিক বিশ্ব, যার কেন্দ্র হবে আমেরিকা।

আমেরিকার এই বিশ্বায়ন মুসলিম বিশ্বের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। এ চ্যালেঞ্জ আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক সবই। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ প্রস্তুতি আদর্শিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রযুক্তিগত, সামরিক সবক্ষেত্রেই। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আজ প্রয়োজন আদর্শিক চেতনার নবায়ন। প্রয়োজন নব জাগরণের, প্রয়োজন সর্বব্যাপী রেনেসাঁর, প্রয়োজন সুদৃঢ় ঐক্য। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাওহীদ ভিত্তিক বিশ্বায়নের কোন বিকল্প নেই।

যা-ই হোক **বিশ্বায়নঃ 'সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি'** গ্রন্থে বিশ্বায়নের যাবতীয় দিক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে ইহুদী-মার্কিন ষড়যন্ত্র বিশ্বায়ন বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার। আমাদের জানামতে-বিশ্বায়নের উপর বাংলা ভাষায় এ যাবত পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। সে শূন্যতা পূরণে এগিয়ে এসেছেন লেখনীর ময়দানে উদীয়মান প্রতিভা মাওলনা শহীদুল ইসলাম ফারুকী। আশা করি এ বিষয়ের উপর বক্ষ্যমান গ্রন্থটি একটি রেফারেন্স বুক বলে বিবেচিত হবে।

পরিশেষে পাঠকদের কাছে বিনীত নিবেদন, এ গ্রন্থ নির্ভুলভাবে আপনাদের হাতে তুলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এরপর যদি কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আমাদের জানালে আমরা তা কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তীতে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

—এ এম আমিনুল ইসলাম
১৫-১০-২০০৮ইং

# দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহপাকের লাখো কোটি শোকর যে, **'বিশ্বায়নঃ সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি'** নামক গ্রন্থটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে সচেতন ওলামায়ে কেরাম, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি ও লেখক-গবেষকদের মাঝে গ্রন্থটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ক্রমেই গ্রন্থটির চাহিদা বাড়তে থাকায় প্রথম সংস্করণ দ্রুত ফুরিয়ে যায়। ফলে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দেয়। এবারে গ্রন্থটিকে আরো পরিমার্জন, সংযোজন ও সম্পাদনার সাথে প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রথম সংস্করণ ছেপেছিলেন মুহাম্মদ ব্রাদার্সের সত্বাধিকারী প্রফেসর আব্দুর রউফ সাহেব। এখন দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপছেন প্রফেসর'স পাবলিকেশন্সের সত্বাধিকারী জনাব এ এম আমিনুল ইসলাম। আল্লাহপাক তাদের এ খেদমতের ধারা অব্যাহত রাখুন।

বিশ্বায়ন আজ একটি বিশ্ব বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্বায়নের বিকাশে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। একুশ শতকে এসে বিশ্বায়ন একটি দর্শন থেকে বাস্তবতা এবং চিন্তা-চেতনা থেকে একটি জীবন্ত ও চিরন্তন বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। আজ বিশ্বায়নের সুসংগঠিত আন্দোলনের আড়ালে পশ্চিমা বিশ্ব আরব বিশ্বের সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে নিজেরা বিনিয়োগ করছে। সম্পদে ভরপুর আবর বিশ্ব প্রতিনিয়ত ঋণের বোঝাতলে পিষ্ঠ হচ্ছে। এক জরিপ অনুযায়ী আরব বিশ্ব প্রতি মিনিটে পঞ্চাশ হাজার ডলার ঋণ করছে আর এ পরিমাণই ইউরোপ প্রতি মিনিটে বিনিয়োগ করছে।

বিশ্বায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের শক্তি ও কর্তৃত্বকে নির্মূল করে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ইসরাইল ও আমেরিকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। বিশ্বায়নের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো, সে স্বাধীন বাণিজ্য ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির শ্লোগান দিয়ে গোটা বিশ্বের সম্পদ গুটিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু হাতের মধ্যে নিয়ে আসতে চায়। এটি অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের সেই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, যার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় কিছু শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর শক্তি গোটা বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের একটি আন্তর্জাতিক হাতিয়ার এবং জুলুম ও নির্যাতনের একটি সাম্রাজ্যবাদী মানদন্ড। বিশ্বায়ন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সরাসরি আগ্রাসন। অতীতেও ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রসন চালানো হয়েছে। কিন্তু এত ভয়াবহ আগ্রাসন আর কখনো চালানো হয়নি। অতীতের যে

কোন সময়ের তুলনায় এ আগ্রাসন সর্বগ্রাসী। বিশ্বায়ন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের যেসব পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তা নিম্নরূপ :

০১. বিশ্বায়নের প্রচেষ্টা হলো, মুসলমানদের দীনি আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে মুসলিম উম্মাহ তাদের দীন ও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ধর্মের আশ্রয় নিতে না পারে। কারণ ধর্মই তাদের প্রকৃত আশ্রয়স্থল।

০২. পশ্চিমা বস্তুবাদ, জড়বাদ ও ধর্মহীন চিন্তা-চেতনাকে অধিকতর বিকাশ ও বিস্তার করা, যাতে ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন লোক বাকী না থাকে, যার মস্তিষ্কে পশ্চিমা নীতির বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন ও অভিযোগ খাড়া হতে পারে এবং তার মুখ দিয়ে জায়নবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন শব্দ বের হতে পারে।

০৩. মুসলিম উম্মাহর পবিত্র স্থানগুলোকে পশ্চিমা শক্তির প্রভাবাধীনে নিয়ে আসা, যাতে মুসলিম উম্মাহর নিকট কোন কেন্দ্র না থাকে।

০৪. প্রতিটি দেশে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের স্থলে বস্তুবাদী দর্শনকে চাপিয়ে দেয়া, যাতে মুসলিম উম্মাহ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস থেকে আলো গ্রহণ করতে না পারে।

০৫. ইসলামকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা এবং তার স্থলে পশ্চিমা মূল্যবোধের আলোকে প্রতিষ্ঠিত সেক্যুলার দর্শনের ওপর সরকার গঠন করা।

০৬. ইসলামী বিশ্বের শক্তিশালী নেতৃত্বকে হটিয়ে দুর্বল ও অযোগ্য নেতৃত্বকে ক্ষমতার মসনদে বসানো এবং মার্কিন স্বার্থের পক্ষে কর্মরত সকল নেতৃত্বকে শক্তিশালী ও রক্ষা করা।

০৭. আঞ্চলিক ক্ষমতাকে দুর্বল করা, তার প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খর্ব করা কিংবা শেকড় থেকেই তাকে নির্মূল করে দেয়া এবং জনগণের হৃদয় হতে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেয়া।

০৮. ইসলামী শরীয়াহ, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন এবং ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক ব্যবস্থাই প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় আতংক। পশ্চিমারা একথা ভাল করেই জানে যে, যদি বিশ্বায়নের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে ইসলামকে মুল টার্গেট বানিয়ে সেটাকে দুর্বল করে দিতে হবে এবং মুসলিম উম্মাহর হৃদয় হতে তাদের দীনি বড়ত্ব, মাহাত্ম, চেতনাবোধ ও মর্যাদাবোধকে নির্মূল করে দিতে হবে। যাতে পশ্চিমাদের পুরাতন স্বপ্ন পূরণ হতে পারে এবং বিশ্বের কোনায় কোনায় শ্বেতাঙ্গদের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

০৯. অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের শক্তি ও কর্তৃত্ব খতম করে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপর মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা।

১০. গোটা বিশ্বে একই ধরনের তাহযীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার ও একই প্রকারের সভ্যতা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া এবং ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী লোকদেরকে স্যাটালাইট, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে জুড়ে দেওয়া হবে, যাতে একটি বিশেষ জাতি গোষ্ঠী যখনই ইচ্ছা তার চিন্তাধারা, কৃষ্টি-কালচার ও দৃষ্টিভঙ্গিকে এ সমস্ত যন্ত্রের মাধ্যমে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে। ফলশ্রুতিতে প্রতিটি জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পৃথক পৃথক না হয়ে এক ও অভিন্ন হয়ে যাবে। পুরো বিশ্বের চিন্তা করার পদ্ধতি এক হবে। লোকদের গবেষণা ও চিন্তা-চেতনার ধরণ একক হবে। তাদের ইচ্ছা, কামনা-বাসনা, চাহিদা, আচার-আচরণ, কথাবার্তার আদব ও ওঠা-বসা মোট কথা প্রতিটি বিষয় এক, অভিন্ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আর গোটা বিশ্বের সেই অভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি হবে মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি, মার্কিন কৃষ্টি-কালচার, মার্কিন তাহযীব-তামাদ্দুন, মার্কিন চিন্তা-ধারা ও ধ্যান-ধারনা এবং মার্কিন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। এটাই হবে গোটা বিশ্বের একক ও যৌথ সভ্যতা-সংস্কৃতি। অন্য কোন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বরদাশত করা হবে না। এই একক ও অভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি যদি বিশ্ববাসী সহজেই গ্রহণ করে নেয় তাহলে তো ভালই, আর না হয় এটা বাস্তবায়ন করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেও কুণ্ঠাবোধ করা হবে না।

সুতরাং আজ প্রতিটি মুসলিম দেশে এমন কিছু সংগঠন-সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে, যারা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত। এসব সংগঠন-সংস্থার প্রতি চিন্তা-চেতনা ও বস্তুগত দিক দিয়ে সরাসরি পাশ্চাত্যের সমর্থন রয়েছে। এসব সংগঠন-সংস্থার উদ্দেশ্য ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের বিরুদ্ধাচারণ করা এবং ইসলামী আইন-কানুনের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছাড়ানো এবং এর মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া। সবচেয়ে বিপজ্জনক কথা হলো, বিশ্বায়নের নেতৃবর্গ সরাসরি ইসলামের পরিচায়ক বিষয়াবলী, ইসলামী মূলনীতি ও মূলবোধ্যের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। তারা ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত আকীদা-বিশ্বাসের অস্তিত্বকে নির্মূল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে, যাতে ভূ-পৃষ্ঠে ইসলামের অনুসারী বলতে কেউ না থাকে। এক কথায় বিশ্বায়ন ও গ্লোবালাইজেশন মানবতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা এবং ইসলামী রেনেসাঁ ও পূনর্জাগরণকে প্রতিহত করার একটি হাতিয়ার, যাকে প্রোপাগাণ্ডা ও প্রতারণার মাধ্যমে একটি দর্শন ও আইন হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করা হচ্ছে।

শহীদুল ইসলাম ফারুকী
পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।

# অনুবাদকের আরজ

আল্‌হামদুলিল্লাহ। লাখো কোটি শোকর সেই মহান মাওলা পাকের যিনি তার অপার কুদরতে বক্ষ্যমান গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার তাওফীক দিয়েছেন, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তিদূত বিশ্ব নেতা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর যার আজীবন মিশন ছিল ইসলামকে সকল মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করা। মানবতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, বিশ্বের তাবৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নির্মূল করে বিশ্ববাসীর ওপর এক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের নতুন কৌশল **"বিশ্বায়ন বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা"**। এই বিশ্বায়নের নেতৃত্ব দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বে পরিচালিত বিশ্বায়ন আজ বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনে ক্রিয়াশীল এবং এই ক্রিয়ার ব্যাপ্তি ও গভীরতা ক্রমবর্ধমান। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রই তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে, এমনকি বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনে কোন একটি দিকও এমন নেই যা বিশ্বায়নের ভয়াল থাবা থেকে মুক্ত। আফগানিস্তান ও ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আক্রমন, ধ্বংসলীলা ও জবর দখলের ঘটনাও বিশ্বায়নের কার্যক্রম থেকে বাইরে নয়।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এমনকি শাসকশ্রেণী পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত। বিশ্বায়নের মতবাদ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী ও কার্যক্রম অন্ধভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। সকল স্তরের জনজীবনই বিশ্বায়নের কার্যক্রমের আওতায় এসে যাচ্ছে। এই বিশ্বায়নকে তারা 'অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য, ইতিহাসের অমোঘ বিধান, মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, নিরপেক্ষ সত্য' ইত্যাদি বলে মন্তব্য করেছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শাসক শ্রেণীই এই বিশ্বায়নকে ইতিহাসের অমোঘ বিধান মনে করে মেনে নিচ্ছেন।

বাংলা ভাষায় 'বিশ্বায়ন' শব্দের ব্যবহার গত দশ বছর ধরে চলছে। তার আগে এই শব্দটির ব্যবহার বাংলা ভাষায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইদানিং ইংরেজী ও আরবীতে গ্লোবালাইজেশন ও "আওলামাহ" শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায় ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে। তার পর বিশ্ব ব্যবস্থা যে রূপ নেয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সবদিক দিয়ে তা এককেন্দ্রিক তথা ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক হয়ে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী বৃহৎশক্তিবর্গ তখন বিশ্ব ব্যবস্থার তত্ত্ব হিসেবে জাতিসংঘ ও তার শাখা-প্রশাখা, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ইত্যাদির

মাধ্যমে গ্লোবালাইজেশন শব্দটি সামনে নিয়ে আসে। অত:পর ইউরোপ-আমেরিকার শক্তিশালী সব প্রচার মাধ্যম পৃথিবীর সকল ভূ-ভাগে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে কথাটি ব্যাপকভাবে চালু করে দেয়।

বিশ্বায়ন তত্ত্বের সূচনা ও বিকাশ শুরু হয়েছে ১৯৯০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে। গ্লোবালাইজেশন শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বৈশ্বিকীকরণ, বিশ্বায়ন, গোলকীকরণ, গোলকরণ, ভুবনীকরণ, ভুবনায়ন ইত্যাদি শব্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অতিক্রম করে বিশ্বায়ন শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। বেতার-তরঙ্গে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা ভাষায় বিশ্বায়ন শব্দটিকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

অতীতের উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদেরই নতুন রূপ এই বিশ্বায়ন। অতি উন্নত প্রযুক্তির সুবিধার সাহায্যে এর উদ্ভব ও বিকাশ। গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন পুঁজিবাদী উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী মহল থেকে উদ্ভাবিত, প্রচারিত ও বাস্ত বায়িত বিশ্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি আদর্শ। বিশ্বায়ন সূচনা পর্বে বিশ্ব অর্থনীতির একটি আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও এখন অর্থনীতির গন্ডি পেরিয়ে তা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে, এমনকি পরিস্থিতি এখন এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, বিশ্ববাজারে পণ্য সামগ্রীর বাণিজ্যের সাথে সাথে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগসমূহের উপর বিশ্বায়নের দেয়াল তৈরী করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ভাষায়, "বিশ্বায়ন শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, বরং তা রাজনৈতিক, সভ্যতা-সংস্কৃতি, পরিবেশ-পরিস্থিতি, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসার মত বিষয়ের সাথেও সম্পর্ক রাখে।"

বিশ্বায়ন পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা, সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জীবনের চাল-চলন, রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের অবকাঠামোর নাম যা গোটা দুনিয়ার ওপর জোর পূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং লোকদেরকে তার চিত্রিত সীমারেখার মধ্যে জীবন-যাপন করতে বাধ্য করা হবে।

বিশ্বায়ন বলা যায় ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক বিশ্ববিস্তৃত পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার আদর্শ। বিশ্বায়নের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও সুদূর প্রসারী লক্ষ্য বুঝতে হলে সব কিছুর আগে বোঝা দরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বগ্রাসী আধিপত্যবাদী নীতিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সামরিক আয়োজনের পাশাপাশি অত্যন্ত শক্তিশালী বিশ্ববিস্তৃত কার্যকর কূটনীতি ও গোয়েন্দানীতি রয়েছে। সকল বিষয়ে জ্ঞান ও গবেষণা আছে, আছে দর্শন-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আছে পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও ক্রমাগত নতুন জ্ঞান আহরণের ধারা। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝতে হলে তার বিশ্বগ্রাসী রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি, তার সেনাবাহিনী, যুদ্ধপ্রস্তুতি, কূটনীতি ও

গোয়েন্দানীতি, তার দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তার সমস্যা-সম্ভাবনা, তার শক্তি ও দুর্বলতা- সব কিছু সম্পর্কেই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যে সব শক্তির অধিকারী হয়ে যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্বব্যাপী মানব জাতির সামনে দানবরূপে দেখা দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের দুষ্কর্মের গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে হলে সেই সব শক্তিকে জানতে ও সেগুলোতে অধিকার অর্জন করতে হবে। যে শক্তির বলে যুক্তরাষ্ট্র সকলকে পদানত করছে, সেই শক্তির অধিকারী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অপশক্তিকে আঘাত হানতে হবে। শক্তি অর্জন অপরিহার্য। ইতিহাস মোড় পাল্টাতে বাধ্য। মনে রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতি ও বিশ্বনীতির লক্ষ্য অভিন্ন। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র চায় শক্তি বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি। এতে তারা প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদী। তবে সে তার নীতিকে গোটা মানব জাতির উপর চাপিয়ে দিতে চায়। বিশ্বনীতির বেলায় সে বল প্রয়োগে বিশ্বাসী। গোটা পৃথিবীকে সে নিজের কর্তৃত্বে আনতে চায়। এ লক্ষ্যে সাজিয়েছে তার রাজনীতি, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্র নীতিকে, কূটনীতি ও গোয়েন্দা নীতিকে, দর্শন-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগকে।

প্রচার মাধ্যম ও তথ্য প্রবাহের কর্মধারায় ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীরাই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে আছে। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের সকল খারাপ উপাদানের একক সমাবেশ ঘটালেও তা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মানবতাবিরোধী আক্রমন নীতির মত ভয়াবহ হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের শাসকেরা সাদ্দাদ, নমরূদ, ফেরাউন, হালাকু খাঁ, চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শাহ, হিটলার ও আলেকজান্ডারের বিজয়লিপ্সা ও উম্মাদনা অন্তরে লালন করে বিশ্ব বিজয়ে যাত্রা করেছে। সাম্রাজ্যবাদের পতাকা হাতে নিয়ে প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের অগ্রসরতার ক্ষিপ্রতা দেখে মনে হচ্ছে সেদিন বেশী দুরে নয়, যেদিন জলে স্থলে তথা তাবৎ দুনিয়ার প্রতিটি ধুলিকণা পশ্চিমা রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে যাবে।

বিশ্বায়ন এমন একটি আকাঙ্খা যা বাস্তবায়িত হতে পারে গোটা পৃথিবীকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এনে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ও রাজধানী বিলুপ্ত করে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র চায় পৃথিবীতে একটি মাত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। যে রাষ্ট্রের রাজধানী হবে ওয়াশিংটন, যে রাষ্ট্রের শাসক হবে যুক্তরাষ্ট্রের শাসকেরা। যুক্তরাষ্ট্র গোটা মানব জাতির উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করার দুরভিলাষ অর্জন করল কিভাবে, আফগানিস্তান ও ইরাকে যুদ্ধ চালিয়ে জয়ী হতে পারল কিভাবে, এটাই এখন মূল প্রশ্ন।

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধান মন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ যিনি বিশ্বায়ন ব্যবস্থার কট্টর বিরোধী এবং ইসলামী দেশগুলোর মাঝে অর্থনৈতিক একতার বিরাট প্রবক্তা। তিনি বলেন, "বিশ্বায়ন প্রভাবিত বিশ্বে কখনোই ন্যায়, ইনসাফ ও সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, বরং এর কারণে দুনিয়া একদিন কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্ধ নেশায়

মত্ত দেশগুলোর গোলাম ও অধীন হয়ে যাবে। যেমনিভাবে বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর হাজারো লোক ধ্বংসের গ্রাসে চলে গেছে, তেমনিভাবে বিশ্বায়ন দ্বারাও বিপুল সংখ্যক লোক মৃত্যুর গ্রাসের শিকার হবে। বিশ্বায়ন প্রভাবিত এই যুগে সম্পদশালী দেশগুলোর জন্য অবশিষ্ট দেশগুলোর উপর তাদের নীতি-পলিসি চাপিয়ে দেওয়া খুবই সহজ হবে। এজন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভাল করেই জেনে রাখা উচিত তাদের অবস্থা সে যুগ হতে কখনোই উন্নত হবে না যখন তারা উন্নত বিশ্বের কলোনী ছিল।

ড. ইমাদুদ্দীন খলীল বলেন, "বিশ্বায়ন গোটা বিশ্বকে এমন এক পল্লীতে রূপান্তর করে দেবে যার নেতৃত্ব থাকবে মার্কিনীদের হাতে আর কর্তৃত্ব চলবে ইহুদীদের। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য যা-ইচ্ছা তাই তারা করবে, ইনসাফের নির্দেশদাতা কেউ থাকবে না। এর জন্য কোন জাতি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করেই দিক না কেন।"

গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রতিদিন দেওয়া হচ্ছে। সকল প্রচার মাধ্যম থেকেই প্রচারিত হচ্ছে নানা কথা। অনেকে বিষয়টাকে দেখছেন অর্থনৈতিক ধারণা ও কর্মনীতিরূপে। তবে ক্রমেই সকলে উপলব্ধি করছেন যে, বিশ্বায়নে রয়েছে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতি ও সামরিক পরিকল্পনা। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কূটনৈতিক ও গোয়েন্দা কার্যক্রম। বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রয়োজনে বিশ্লেষণ করেছেন এর বিভিন্ন দিক। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনেকেই বিশ্বায়নকে মানব জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে অভিসাপ মনে করছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী, ধনিকশ্রেণী ও অধিপতিশ্রেণী সকলে আদর্শটিকে বরণ করে নিয়ে এর বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ও তার শাখা-প্রশাখা, বিশ্বব্যাংক ও তার শাখা-প্রশাখা, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, এনজিও ব্যবসা ও ইঙ্গ-মার্কিন প্রচার মাধ্যম এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বাস্ত বায়নে প্রধান নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করছে। বাংলাদেশে এনজিও ও তাদের সহযোগীরা বিশ্বায়নবাদীদের মুখপাত্র রূপে কাজ করে যাচ্ছে। বুদ্ধিজীবি বলে পরিচিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত রয়েছেন।

এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের পেছনে বহু ঘটনা কাজ করছে। সেগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আবিস্কার, উদ্ভাবন ও তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিংশ শতকের শেষ দিকে যেসব উপাদান মানুষের জীবনযাত্রায় নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে, সেগুলো মানুষের বিস্মিত হওয়ার সামর্থকেও নিতান্ত অসহায় করে দিয়েছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসেছে মার্কিন আধিপত্যবাদীরা। এটাই হচ্ছে তাদের বিশ্বায়নবাদের মূল অবলম্বন। পৃথিবীর সকল দেশের সরকার আজ মার্কিনী আধিপত্যবাদী বিশ্বায়নের সমর্থক।

**বিশ্বায়নঃ "সাম্রাজ্যবাদের নতুন ট্র্যাটেজি"** নামক গ্রন্থে বিশ্বায়নের যাবতীয় দিক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে ইহুদী-মার্কিনী ষড়যন্ত্র বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার। এ গ্রন্থে যেমনিভাবে বিশ্বায়নের সকল কর্মময়দান নিয়ে সারগর্ভ, জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণামূলক আলোচনা করা হয়েছে তেমনিভাবে মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে চলা মার্কিন বর্বরতার।

বাংলা ভাষায় বিশ্বায়নের উপর এটাই পূর্ণাঙ্গ প্রথম গ্রন্থ। আশা করি ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় বিশ্বায়ন সম্পর্কে যা কিছু লেখা হবে তার জন্য এ গ্রন্থ একটি " রেফারেন্স বুক" হিসেবে বিবেচিত হবে।

মূল বইটি উর্দু ভাষায় লিখিত, লেখক মাওলানা ইয়াসির নাদীম। তিনি ভারতের বিশিষ্ট আলেমে দীন, উদীয়মান সাংবাদিক ও লেখক।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা যেভাবেই সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তবে যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক মাওলানা লিয়াকত আলী, মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেব, যিনি একটি সুন্দর ও সুচিন্তিত অভিমত লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। পাকিস্তানের মাওলানা যাহেদ রাশেদী সাহেবও একটি জ্ঞানগর্ভ অভিমত লিখে দিয়ে আমার প্রতি ইহসান করেছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক জনাব কামারুজ্জামান, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মকবুল আহমদ, সম্পাদক জয়নুল আবেদীন আবদুল্লাহ, প্রথম প্রকাশক প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুর রউফ ও দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক জনাব এ এম আমিনুল ইসলামসহ সবাইকে আল্লাহ্ তায়ালা দোজাহানের কল্যাণ দান করুন। আল্লাহ পাক লেখককেও জাযায়ে খায়ের দিন।

পাঠকের দরবারে বিনীত নিবেদন এই দু:সাহসিক কাজে হাত দেওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। শুধু আল্লাহর করুনা ও মুরব্বিদের দু'আ ও সৎ সাহসকে সম্বল করে এ দু:সাহসিক কাজে অগ্রসর হই। কাঁচা হাত, এ ময়দানে জীবনের নতুন পদচারণা, কাজেই ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সম্মানিত পাঠক ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিলে পরবর্তীতে তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করব।

সর্বশেষ আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে নিবেদন, তিনি যেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উসিলায় অধমের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করেন এবং এ মেহনতটুকু অধমের মরহুম পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, জীবন সাথী ও কলিজার টুকরো মুহাম্মদ যুবাইর আহমদ ছামীন ও মুহাম্মদ যুহাইর আহমদ রাফীন-এর নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমীন-ছুম্মা আমীন!

তারিখ:১২/১০/০৮ইং **শহীদুল ইসলাম ফারুকী**

# সূচীপত্র

## তৃতীয় অধ্যায়

## চতুর্থ অধ্যায়

**পঞ্চম অধ্যায়**

**ষষ্ঠ অধ্যায়**

# ভূমিকা

বিগত শতাব্দীর সূচনালগ্নে খেলাফতে উসমানিয়ার পতন ও মুসলিম উম্মাহর ধ্বংস সাধনে যে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল একবিংশ শতাব্দীতে এসেও তা থেমে যায়নি। এমনিই তো মুসলিম উম্মাহর লাঞ্ছনা ও অপদস্থ হওয়ার অসংখ্য অগণিত কারণ রয়েছে, যেগুলো ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের লেখনিতে বিভিন্ন সময় বিশ্লেষণ করে আসছেন। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের একটি দীর্ঘ তথা বেদনা দায়ক ইতিহাস রয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনের কাহিনীতে ইতিহাসের পাতা ভরা। তবে এসব ষড়যন্ত্র ও গোপন আন্দোলন সেদিন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে যেদিন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর মর্যাদার প্রতীক ও নিদর্শন এবং ইসলামী বিশ্বের রক্ষক খেলাফতে উসমানিয়ার পতন হয়। বিশ্বের এক বিস্তৃত অঞ্চল যা খেলাফতে রাশেদার যুগ হতে খেলাফতে উসমানিয়ার যুগ পর্যন্ত মুসলমানদের দখলে ছিল তা টুকরো টুকরো হয়ে পাশ্চাত্য সাম্রাজন্যবাদের কলোনীতে পরিণত হয়। দীর্ঘকাল যাবত মুসলিম বিশ্বে যদিও বাস্তবে পাশ্চাত্যের কলোনী নেই কিন্তু অবশ্যই তারা আজও বুদ্ধিবৃত্তিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিবেকের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যদি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ও গোপন আন্দোলনের বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এ বাস্তবতাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এসব গোপন ষড়যন্ত্রের বংশপরম্পরার উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু হলো আব্দুল্লাহ বিন সাবা, যে সিরিয়াবাসী শামের ইহুদী। এ নরাধম খেলাফতে রাশেদার যুগেই ইসলামের শক্তিশালী ও মজবুত দুর্গকে দুর্বল করা, বরং তা সমূলে নির্মূল করার প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছিল। চীনে ঘাপটি মেরে থাকা তার প্রভুদের সহযোগিতায় সে ক্রমবর্ধমান সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ইহুদী আব্দুল্লাহ বিন সাবা যেমনিভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ও ভীত নড়ানোর প্রয়াস পেয়েছিল তেমনিভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মুসলমানদেরকে বিপদগামী ও সঠিক রাস্তা হতে দূরে সরানোর পরিকল্পনা তৈরি করেছিল এবং তার অনুসারীদের সাহায্যে তা বাস্তবতায় রূপও দিয়েছিল। সাবায়ী আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়নকারী ব্যক্তি একথা ভাল করেই জানেন যে, ইহুদীরা সর্বদাই ষড়যন্ত্রের জাল তৈরী করেছে, এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ পাক তাদের ওপর

যে লাঞ্ছনা ও অপমানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন তা দূর করা এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা যে নেতৃত্বের সিংহাসন থেকে বঞ্চিত তা দ্বিতীয়বার অর্জন করার প্রয়াস চালিয়েছে।

নবুওতের আবির্ভাবের নিকটবর্তী যুগে খৃষ্ট জগত যে ধ্বংস ও অধ:পতনের শিকার হয়ে ছিল তা ইহুদীদেরকে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার আকাঙ্খা সৃষ্টি করে দিয়েছিল, বরং তাদেরকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের নিকট এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কারণ যে খৃষ্টবাদ হযরত ঈসা (আ:)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল তা হযরত ঈসা (আ:)-এর অযোগ্য অনুসারী ও গভীর ইহুদী ষড়যন্ত্রের কারণে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং একটি ধর্ম হিসেবে তার মধ্যে এমন কোন শক্তি ও প্রাণ বাকী ছিল না যা দ্বারা সে বিশ্ব নেতৃত্বের বাগডোর হাতে নিতে পারে। খৃষ্টধর্মের এই দুর্বলতার ফলে ইহুদীদের বহু শতাব্দী লালিত স্বপ্নের ক্ষীণ আলো উদ্ভাসিত হতে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তারা এমন নবীর প্রতীক্ষায় ছিল যিনি তাদের নেতৃত্ব দেবেন এবং তাদেরকে চলমান এই অধ:পতন ও ধ্বংস হতে রক্ষা করবেন।

শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব হলো। ইহুদীদের আশা ও স্বপ্নের উল্টো আরবদের ভাগ্য জেগে উঠল। জাহেলিয়াতের অমানিশা ভেদ করে আরবদের মধ্যে শেষ নবীর বৈপ্লবিক আবির্ভাব ঘটল। এই নবুওতের সূর্য যখন মক্কা হতে মদীনায় স্থানান্তরিত হলো তখন ইহুদীদের সকল আশা-আকাঙ্খায় পানি পড়ল এবং তারা নিশ্চিত বুঝে ফেলল যে, তাদের লাঞ্ছনা ও আপমানের ঘন আঁধারের রাত কখনো উজ্জ্বল প্রভাতে রূপান্তরিত হবে না। কারণ তারা ভাল করেই আঁচ করতে পেরেছিল, খৃষ্টান জাতির পর বিশ্ব নেতৃত্বের বাগডোর এখন মুসলিম জাতির হাতেই অর্পণ করা হবে। সুতরাং ইহুদীরা তাদের ষড়যন্ত্রের কৌশল পরিবর্তন করল। গোপন আন্দোলন তখন তার দিকে পরিবর্তন করল এবং খৃষ্টানদের পরে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ তাদের টার্গেটে পরিণত হলো।

যুগ যুগ ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা, সফলতা ও ব্যর্থতার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে চলে আসছে। কখনো মনে হয় ইহুদীরা তাদের লক্ষ্যস্থলের অতি নিকটে চলে এসেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য একেবারে তাদের সামনে। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়। এজন্য বহু শতাব্দী ধরে চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর ইহুদী কৌশলে পরিবর্তন আসে। তাদের অনুমান হয়ে গিয়েছিল, একা একা ইসলামের প্রতিরোধ করা এবং তাকে পরাজিত করা

অসম্ভব। এজন্য তারা খৃষ্ট জগতকে নিজেদের নিকটে আনার প্রয়াস চালায়। যে ধর্মকে তারা পরস্পরবিরোধী বস্তু এবং ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার সমষ্টিতে পরিণত করেছিল, আজ তারা সে ধর্মের অনুসারীদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারিত করল।

ইহুদীরা তাদের স্বভাবজাত গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্বীয় কৌশলে সফলকামও হয়ে গেল। সুতরাং ইহুদীদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলে খৃষ্টজগত বিশ্বাস করে বসল, হযরত ঈসা (আ:)-এর আবির্ভাব তখনই হবে যখন তারা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। এজন্য গোটা খৃষ্ট জগত ইহুদী স্বার্থ রক্ষা ও তাদের রচিত পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেল। যুগ যুগ ধরে ইহুদী পরিচালিত ষড়যন্ত্রের কারণে ইসলামী সালতানাতের সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। খেলাফতের মজবুত দুর্গ-চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হলো এবং গোটা বিশ্বে পশ্চিমা আধিপত্য কায়েম হয়ে গেল। কিন্তু এই খেলাফত ধ্বংস পর্যন্তই তাদের টার্গেট ছিল না, তাদের লালিত স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল না। এ দ্বারা তারা তাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছার পথ অবশ্যই খুঁজে পেয়েছিল কিন্তু উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা শুধু ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠা করেই তুষ্ট হয়নি, বরং গোটা বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়া ও শাসনকার্য পরিচালনা করার স্বপ্ন দেখে আসছিল। তারা বিশ্ব নেতৃত্বের আসন দখল করেই ক্ষান্ত নয়, বরং তারা অর্থনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রেও স্বীয় ইজারাদারি ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এর জন্য তাদের এমন একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়, যার ছায়াতলে তারা তাদের পুরাতন স্বপ্ন ব্যাখ্যার সীমান্ত পার করাতে পারে। সুতরাং ইহুদী চিন্তাবিদরা এমনই একটি বিশ্ব আন্দোলনের মাধ্যমে যায়নবাদী ইতিহাসের সুপরিকল্পতি ও সুসংগঠিত ষড়যন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। পরবর্তীতে তারা সেই আন্দোলনের নাম দেয় 'বিশ্বায়ন'।

মুসলিম উম্মাহ যদিও রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়েছিল, অর্থনৈতিকভাবেও তাদেরকে পরাজিত করা কোন কঠিন বিষয় ছিল না। কিন্তু সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদেরকে পরাজিত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, এই পরিকল্পনা তখনই সফলকাম হতে পারে যখন ইসলামকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেওয়া হবে এবং তার উপস্থাপিত সভ্যতা-সংস্কৃতি পরিপূর্ণভাবে খতম করে দেওয়া হবে। এজন্য বিশ্বায়নের যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সফল হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের ওপর প্রচন্ড হামলা চলছে। মুসলমানদের মগজ-মস্তিস্ককে কিনে নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। ইসলামী

তাহযীব-তামাদ্দুন থেকে তাদের সম্পর্ক বিছিন্ন করার প্রয়াস চলছে। এই ধারাবাহিকতা যুগ ও উপকরণের পরিবর্তন সত্ত্বেও আজও অব্যাহত আছে। আর ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতদিন পর্যন্ত বিশ্বায়নের মাধ্যমে পাশ্চাত্য মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি বিশ্বের কোনায় কোনায় বিজয়ের পতাকা উড্ডীন না করবে এবং পৃথিবীর তাবৎ সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিশেষ করে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি চিরনির্মূল না হবে। সুতরাং মুসলমানদের (যারা বিশ্বায়নের আসল টার্গেট) এই আন্দোলন সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়া এবং নিজেদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একান্ত জরুরী, যাতে মুসলিম উম্মাহ পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে পরিচালিত প্রচন্ড প্লাবনের চপেটাঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, তথাকথিত মুক্ত চিন্তা ও উদারতার স্রোতে ভেসে তারা নিজেদের জীবনের বহু কর্ম আঞ্জাম দিচ্ছে। এ দ্বারা মূলত তারা বিশ্বায়নের রাস্তাকেই সুগম করেছে এবং অনিচ্ছায় তাদের জীবনে বিশ্বায়নের প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটছে। উলামায়ে কেরাম (যারা এই উম্মাহর নেতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথপ্রদর্শক) তাদের জন্য এই বিশ্ব ও ইসলামবিরোধী আন্দোলনের সকল বিভাগ সম্পর্কে অবগত হওয়া একান্ত জরুরী। কারণ তাদের ওপরই এই নাযুকতম যুগে উম্মাহর হাত ধরার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ পাক উলামায়ে কিরামকে জাতির সঠিক নেতৃত্বের অনুভূতি দান করুন। আমীন!

২৪ জমাদিউস সানী
১৪২৪ হিঃ মুতাবিক
২৩ আগষ্ট ২০০৩

ইয়াসির নাদীম

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার, তৃতীয় বিশ্বের দূরদর্শী ও সফলনেতা

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী

## ড. মাহাথির মোহাম্মদ এর ভাষণ–

# বিশ্বায়ন এশিয়ার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ এর মতো নেতার জন্ম বাংলাদেশে হলে এ দেশকে দরিদ্র ও দুর্নীতিবাজ দেশের কলঙ্ক বহন করতে হতো না। প্রথম জীবনে পেশায় একজন চিকিৎসক হলেও পরবর্তী জীবনে তিনি দেশের সবচেয়ে সফল রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি একটি দরিদ্র দেশকে বিশ্বের দশম অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। ১৯৯৭ সালে তাঁর দেশ মালয়েশিয়ার অভাবিত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে মুদ্রা বাজারে ধস নামানো হয়। মাহাথির তাঁর দেশকে এই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। গভীর অন্তরদৃষ্টির অধিকারী মাহাথির মোহাম্মদ বুঝতে পেরেছেন, পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলো চায় না দরিদ্রদেশগুলো উন্নতি করুক। পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক।

আজ বিশ্বে বিশ্বায়নের জয় জয়কার! মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক স্থপতি মাহাথিরের কাছে এ কথা পরিস্কার, দরিদ্র দেশগুলোর বাজার দখল ও তাদের অর্থনীতি ধ্বংস করাই এ বিশ্বায়নের লক্ষ্য। তাই তিনি বিশ্বায়নের বর্তমান সংজ্ঞা পরিবর্তন করার আহবান জানিয়েছেন। এশিয়ার কণ্ঠস্বর হিসাবে তিনি এশীয় দেশগুলোর প্রতিই এ আহক্ষান রেখেছেন। ২০০২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী নিউ ইয়র্কে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ)-এর সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে এশীয় দেশগুলোর প্রতি তিনি এ আহবান জানান। নীচে তাঁর বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হলো:

বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি শব্দ যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিশ্বের সকল দেশকে একটি অভিন্ন সত্ত্বার আওতায় নিয়ে আসা। গতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতির আলোকে ধনী দেশগুলো বিশ্বায়নের ধারণা উদ্ভাবন করে। কিন্তু বর্তমানে পুঁজির অবাধ সরবরাহ ও পণ্য বেচাকেনা ও সেবার ওপরই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বেশী। তবে পণ্যের অবাধ গতির মতো মানুষ ও অন্যান্য জিনিসের অবাধ প্রবাহ সম্ভব নাও হতে পারে।

অবাধ শব্দের অর্থ হচ্ছে সরকারী রীতি নীতি, আইন-কানুন ও নীতিমালার প্রভাব মুক্ত থাকা। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো রীতি নীতি, আইন-কানুন ও নীতিমালার

প্রভাব মুক্ত থাকা। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো রীতি নীতি তৈরী করবে এবং তারাই তা বাস্তবায়ন করবে। তাদের হাতে থাকবে বিশ্বের ভাগ্য। দুর্বল দেশগুলোর প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, বিশ্বায়ন চালু হলেও এসব দেশে বিদ্যমান রীতি নীতি, আইন-কানুন ও নীতিমালা টিকে থাকবে। তবে এসব রীতি নীতি প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের 'না' বলার সুযোগ থাকবে না। তবে অধিকাংশ উন্নত দেশের কাছে বিশ্বায়ন মানে হচ্ছে অধিক স্বাধীনতা নয়, বরং বিদ্যমান আইন-কানুন, রীতি নীতি ও নীতিমালা থেকে কম স্বাধীনতা ভোগ করা। দু:খের কথা হচ্ছে, এসব অভিন্ন আইন-কানুন, রীতি নীতি ও নীতিমালা প্রনয়নকালে দরিদ্র দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

গরীব দেশগুলোকে বলা হচ্ছে, দরিদ্র হলেও তারা নিজ নিজ দেশে পুঁজির অবাধ প্রবাহে লাভবান হবে। বস্তুত পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে পুঁজির অবাধ প্রবাহ নজিরবিহীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এমন কি তাদের স্টক মার্কেটও বিদেশী বিনিয়োগে লাভবান হয়েছে। তবে তাদের এ কথা বলা হচ্ছে না, পুঁজির এ অবাধ সরবরাহ দেশের বাইরেও চলে যেতে পারে এবং তারা দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে।

এটা দূর্ভাগ্যজনক যে, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একথা জানতে পেরেছে এবং এখন তারা বুঝতে পেরেছে, পুঁজির অবাধ প্রবাহের ক্ষতি কত ভয়াবহ হতে পারে এবং তা পুনরুদ্ধার করা কত কঠিন!

পুঁজির অবাধ বর্হিগমনে পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং পরিকল্পিতভাবে এসব দেশে মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে এ সংকটের সূচনা করা হয়। মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটায় বৈদেশিক মুদ্রার মান হ্রাস পায়। ফলে বিদেশী বিনিয়োগ হ্রাস পায়। অর্থের অবমূল্যায়ন ঘটায় অধিক ক্ষতি এড়িয়ে যেতে বিদেশী পুঁজি প্রত্যাহর করা হয়। বাজারে ধস নামে। এতে অলস ঋণের পরিমান দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাংক ঋণ বন্ধ হয়ে যায়। বহু লোক দেউলিয়া হয় এবং পরিশেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়।

অর্থনীতি ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়ায় পূর্ব এশীয় দেশের সরকারগুলোকে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আঁইএমএফ)-এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। তবে আইএমএফ'র কাছে আত্মসমর্পণ ও অবমূল্যায়নকৃত ব্যাংক ও ব্যবসা বাণিজ্যগুলো বিদেশী শ্বেতাঙ্গ ধনীদের দখলে যাবার সুযোগ দেয়ার পর এ ঋণ প্রদান করা হয়। বিদেশের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ শোধ করতে গিয়ে অনেক দেশ আইএমএফ'র কাছ থেকে নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে। ফলে এসব দেশকে ঋণ পরিশোধে নাকানি চুবানি খেতে হচ্ছে। স্থানীয়দের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখা

হয়নি। আইএমএফ-এর কাছ থেকে এসব দেশ যে ঋণ গ্রহণ করেছিল তা এখনো তাদের শোধ করতে হচ্ছে।

পূর্ব এশীয় দেশগুলো তাদের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠলেও আর্জেন্টিনার মতো দেশগুলো বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আইএমএফ তার শর্ত চাপিয়ে দিলে ঋণ গ্রহীতা দেশগুলো দেউলিয়া হয়ে যায়। স্পষ্টত পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে যা ঘটেছে তা হচ্ছে বিশ্বায়নের বহি:প্রকাশ। সরকারগুলো মুদ্রার মান নির্ধারণে নিজেদের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ এবং তথাকথিত আন্তর্জাতিক বাজার শক্তির কাছে তা নির্ধারণে দায়িত্ব অর্পণ করলেই কেবল মুদ্রা বাণিজ্য সম্ভব। তথাকথিত আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজার শুধু মুনাফার কথাই চিন্তা করে। পক্ষান্তরে সমাজের কল্যাণে তাদের কিছুই করণীয় নেই। আন্তর্জাতিক বাজার ধনী ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত দেশগলোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে। আজকাল ব্যাংক ও কর্পোরেশন একীভূত হয়ে যাচ্ছে এবং আরো ফুলে ফেঁপে ওঠার লক্ষ্যে একে অপরের আস্থা অর্জন করতে চাইছে। এটা খুবই সত্যি কথা, বড় বড় ব্যাংক ও কর্পোরেশনগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর নয়। দেশে দেশে সীমান্ত তুলে দেয়া হলে এসব অর্থনৈতিক দৈত্য স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যগুলো গ্রাস করবে এবং তারা স্থানীয় স্বার্থ উপেক্ষা করবে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে শুধু মুনাফা অর্জন। তবে কখনও তারা যদি কোনও দেশ থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনে পুঁজি প্রত্যাহার করে তাহলে তারা তা করবে মর্মযাতনা থেকে নয়। পুঁজি প্রত্যাহার কালে তারা এ চিন্তা করবে না যে, তাদের এ পদক্ষেপে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, চরম বেকারত্ব কিংবা দেউলিয়াত্ব দেখা দেবে কি-না।

বিশ্বায়ন হলো এমন এক ধারণা যেখানে বড় হওয়াই সকল যোগ্যতা। তা-ই একমাত্র গুরুত্বের চাবিকাঠি। এটি সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয়। বৃহৎ অর্থনৈতিক স্বার্থ নিশ্চিত করে, বৃহত্তর গবেষণা, উন্নয়ন ও সস্তায় পণ্য প্রাপ্তির পথ সুগম করে। তবে আমরা এও দেখেছি, বড় হলে সব সময় সব হয় তা সঠিক নয়। মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানী এক ধরনের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া হচ্ছে তার প্রমান। প্রকৃত পক্ষে তারা যত বড় হবে তাদের পতনও তত দ্রুত হবে এবং সব কিছু নিয়ে তারা পতনের দিকে ধাবিত হবে। পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলো বিশ্বায়নের ধারণা উদ্ভাবন করেছে। তবে তারা এশিয়াকে বোঝাতে পারেনি, এ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সামাধান কিংবা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ভিটামিন। বিশ্বায়নের জন্য পুঁজির প্রবাহ অবাধ হওয়ার প্রয়োজন নেই। নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন এখনো অবাধ বিশ্বায়নের ধারণা অথবা আদর্শের সঙ্গে মানানসই হতে পারে।

বিশ্বায়নের বর্তমান ধারণা কিভাবে মোকাবেলা করা যায় এশিয়ার চ্যালেঞ্জ তা নয়, বরং সমস্যা হচ্ছে কিভাবে তাকে কার্যক্ষম করা যায় এবং তা থেকে লাভবান হওয়া যায় সেটি। এশিয়ার জন্য আরো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বিশ্বায়নকে নতুন রূপ দান, এর ব্যর্থ হওয়ার আশংকা হ্রাস এবং অর্থনীতি ও দেশসমুহকে ধ্বংস করতে না দিয়ে এটিকে প্রভাবিত করা।

বর্তমান বিশ্বায়ন ধারণায় এমন কিছু নেই যা পরিবর্তন করা যাবে না। বিশ্বায়নকে যারা গ্রহণ করেছে তাদের কাছে এটিকে কম বিপজ্জনক হিসেবে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। অবাধ বাণিজ্য বিশ্বায়নের সমর্থক নয়। বিশ্বায়ন থেকে লাভবান হতে হলে আমাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

যারা গলফ খেলেন তারা জানেন, এমন সময় কখনো আসবে না যখন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি। সমান সমান শক্তিসম্পন্ন সত্ত্বার মধ্যে প্রতিযোগীদের হতে হবে সমান। আমরা যদি ধনী দেশগুলোর সঙ্গে কুলাতে না পারি তাহলে এটা সুষম প্রতিযোগিতা বলে গণ্য হতে পারে না।

১৯৯৭ সালের আগে এশীয় দেশগুলো বিশ্বয়করভাবে উন্নতি করেছিল। পরপর মালয়েশিয়ায় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৮ শতাংশ। কিন্তু পরে এসব সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক শক্তি তাদের অবস্থানে ফিরে গেছে। বিশ্বায়নের ফলে পুঁজির অবাধ প্রবাহের পরিনাম হয়েছে বিপর্যয়কর। বিগত বছরগুলোতে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বিশ্বায়নের বর্তমান ব্যাখ্যা এশীয় দেশগুলোর ওপর জোর করে চাপিয়ে দিলে তার সুফল কখনও শুভ হতে পারে না এবং তা একটি স্থায়ী অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার পর তথাকথিত আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাদবাকী দেশগুলোর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রতি আলোকপাত করার পরিবর্তে বিশ্বায়নের বর্তমান ধারণাকে বরং চাপিয়ে দিতে চাইছে। ফলে বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। (অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)

# বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের
# অভিমত

ইসলামী শিক্ষার ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকার সম্মানিত প্রিন্সিপ্যাল ও বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলিফা

## হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সালমান সাহেবের মূল্যবান অভিমত

ইসলাম একটি সার্বজনীন, বিশ্বজনীন মতাদর্শ, কালজয়ী আদর্শ। ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য। ইসলাম ছিল শান্তিকামী মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ। ইসলামের বিপ্লবী আবির্ভাব গোটা বিশ্বকে আলোকিত করে তোলে। অবসান ঘটনায় সকল ঘোর অমানিশার। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলামের অনুসারীরা একটি উম্মাহর রূপ ধারন করে। এ উম্মাহ গোটা বিশ্বকে শান্তির পয়গাম শোনায়। মানবতার সবক দেয়। ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর নবতর কাফেলার অপ্রতিরোধ্য উত্থানে তদানীন্তন কুফরী শক্তি শংকিত হয়ে পড়ে। তারা ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই দুনিয়ার বুকে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশাতেই বহুমুখী ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করে। কিন্তু ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর অপ্রতিরোধ্য স্রোত তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে খড়কুটার ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ইসলামের অপ্রতিরোধ্য বিজয়ের সাথে সাথে তাদের ষড়যন্ত্রের নেটওয়ার্কও বিস্তৃত হতে থাকে। খেলাফতে রাশেদার শেষের দিকে ইসলামী উম্মাহর অভ্যন্তরীণ গোলযোগকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে তাগুতী শক্তি ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে একটি ভয়ংকর ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটায়। এই ষড়যন্ত্রের জনক ছিল কট্টর ইহুদী আব্দুল্লাহ বিন সাবা। ইতিহাসে এই ষড়যন্ত্র সাবায়ী আন্দোলন নামে খ্যাত। সাবায়ী আন্দোলন এত ভয়ংকর ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে, যুগে যুগে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর বিরুদ্ধে যত আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দিয়েছে, সব ষড়যন্ত্রের উৎসই এই সাবায়ী আন্দোলন। এই সাবায়ী গোষ্ঠীরাই তাতারীদের আকৃতিতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদে স্মরণকালের ধ্বংসলীলা চালায় এবং ইসলামী উম্মাহর একক শক্তি ও প্লাটফরম উসমানী খেলাফতকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে। সাবার মানসপুত্ররাই ক্রুসেড যুদ্ধে ইসলামী উম্মাহর মুখোমুখি হয়। এ ধরনের আরও ছোট বড় যত ষড়যন্ত্র যুগে যুগে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য মাথা চাঁড়া দিয়েছে সব কিছুর উৎসমূল সাবায়ী আন্দোলন। এসব ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর প্রচুর ক্ষতি সাধন করলেও ইসলামী উম্মাহকে নির্মূল করতে পারেনি। পারেনি ইসলামের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে। সর্ব যুগেই ইসলাম আপন মহিমায় টিকে ছিল টিকে থাকবে।

ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর বিরুদ্ধে যুগে যুগে যত আঘাত এসেছে তা যদি অন্য কোন ধর্মের ওপর আসত তাহলে সে ধর্ম আজ দুনিয়ার বুক হতে সম্পূর্ণ মুছে

যেত। কিন্তু ইসলাম তার আভ্যন্তরীন সৌন্দর্য ও শক্তির কারণে আজো পৃথিবীর বুকে আপন মহিমা ছড়াচ্ছে। আব্দুল্লাহ বিন সাবার মানসপুত্র পাশ্চাত্য শক্তি ইসলামের উষালগ্নে থেকে একের পর এক ষড়যন্ত্রে ব্যর্থতা ও ক্রুসেড যুদ্ধে লজ্জাকনক পরাজয়ের পর ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহকে নির্মূল করার জন্য অন্য রোড ম্যাপ তৈরী করে। এটাকে তারা নাম দেয়, **"ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে গবেষনা"**। এই ওরিয়েন্টালিজমের মাধ্যমে তারা কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ক্ষত-বিক্ষত করার অপপ্রয়াস চালায়। কিন্তু এবারও ইসলামের বীর সেনানীরা বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখনী ও গবেষনার শানিত অস্ত্র নিয়ে প্রাচ্যবিদদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানে। নস্যাৎ করে দেয় তাদের সকল ষড়যন্ত্র। ওরিয়েন্টালিজমের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিমা শক্তি আরেকটি ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করে, তারা যার নাম দেয় "বিশ্বায়ন বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা" এবারের ষড়যন্ত্র এত ভয়ানক ও সর্বগ্রাসী যে, এর লক্ষ্য শুধু ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহ-ই নয়, বরং গোটা মানবতাই এর টার্গেট। মানবতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা এবং বিশ্বের তাবৎ সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নির্মূল করে একক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থাকে বিশ্ববাসীর উপর চাপিয়ে দেয়াই এর মূল লক্ষ্য। এই সর্বগ্রাসী থাবা প্রথমে বিশ্ব অর্থনীতির একটি আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও এখন তা আর অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং তা এখন রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, পরিবেশ-পরিস্থিতি, চিকিৎসা তথা গোটা জীবনকে গ্রাস করে ফেলেছে। কিন্তু দু:খের বিষয় আমাদের উলামা চিন্তাবিদ, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে চরম উদাসীন।

যা-ই হোক, বিশ্বায়ন কি, কী এর স্বরূপ, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি, কি এর উপাদান এবং কোন কোন ক্ষেত্র ও ময়দানে সে তার থাবা বিস্তার করে চলেছে বক্ষ্যমান গ্রন্থ "বিশ্বায়নঃ সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি" এর মধ্যে আমার অতি আপন ও স্নেহভাজন মাদরাসা দারুর রাশাদের তরুন শিক্ষক মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী অনুদিত গ্রন্থে এসব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমি বইটির বিভিন্ন জায়গা হতে দেখেছি। আমার জানামতে বিশ্বায়নের ওপর এত বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশিত হয়নি। আশা করি ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় বিশ্বায়নের ওপর যা কিছু লেখা হবে তার জন্য বক্ষমান গ্রন্থটি একটি 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে বিবেচিত হবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদক নবীন হলেও পূর্ণাঙ্গ সফলতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তার যোগ্যতা ও প্রতিভার ব্যাপারে আমি পরিপূর্ণ আস্থাশীল। আমি তার জন্য দু'আ করি এবং বইটি সর্বস্তরের জনগণকে পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই।

**মুহাম্মাদ সালমান**
প্রিন্সিপ্যাল, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা

## বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, সমাজসেবক ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক

## জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান সাহেবের অভিমত–

বিশ্বায়ন কাল পর্যন্ত একটি মতবাদ ছিল, কিন্তু আজ একটি বাস্তবতা, বরং তিক্ত সত্যতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এটাও বাস্তবতা যে, এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে বিশ্বায়ন বাস্তবায়িত হয়নি। আর সামগ্রিকভাবে এটি এখনো অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং মতামত ও সমালোচনার কাল অতিক্রম করছে। কিন্তু আমাদের সচেতন থাকতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ কয়েক দশকের নিরবতার পর বিশ্বায়নের আকৃতিতে আবার লুণ্ঠন শুরু করেছে এবং তারা ক্ষেত্র তৈরি ও রাস্তা পরিস্কার করার জন্য সকল উপায়-উপকরণ কাজে লাগাচ্ছে। পাশ্চাত্য জগত পুনরায় গোটা দুনিয়ার ওপর শাসন ও কর্তৃত্ব চালানোর নেশায় অন্ধ হয়ে পড়েছে। বিশ শতকের শেষ দশকে ক্রুসেডের পতাকাবাহক এবং জায়নবাদের মুখপাত্র ইউরোপ ও আমেরিকা জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, জবরদখল, সাম্রাজ্যবাদ ও অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে মূলনীতি বিশ্ববাসী ও মানবতার সামনে পেশ করেছে তা হলো, 'বিশ্বায়ন ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা'। এটি আন্তর্জাতিক জায়নবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের এমন এক হাতিয়ার, যার মাধ্যমে তারা বিশ্বায়নের নামে গোটা দুনিয়াকে গোলাম বানাতে চায়। আবদ্ধ করতে চায় মানবতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে এবং বিশ্বের তাবৎ সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নির্মূল করে বিশ্ববাসীর ওপর একক জীবনব্যবস্থা হিসেবে পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিতে চায়। বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বিশেষভাবে এবং গোটা নির্যাতিত মানবতার বিরুদ্ধে সাধারণভাবে একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, যার উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক লুণ্ঠন এবং রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা। বিশ্বায়ন সূচনাপর্বে অর্থনীতির একটি আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও তা আজ অর্থনীতির গণ্ডি থেকে বের হয়ে রাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজ, পরিবার, নৈতিকতা এবং ভাষা ও সাহিত্যের ময়দানেও তার থাবা বিস্তার করেছে। মানব জীবনের এমন কোন দিক বাকী নেই, যেখানে বিশ্বায়ন তার ভয়াল থাবা বিস্তার করেনি। বিশ্বায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোটা দুনিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী তথা জায়নবাদী রঙে রঙিন করা এবং সমগ্র বিশ্বে ইহুদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং যেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুনিয়ার মানচিত্র পাল্টানো প্রয়োজন এবং রাজনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অসহায় ও নিঃস্ব বানানো অবশ্যকীয়, তদ্রূপ এই উদ্দেশ্য

অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পরাজিত করা এবং এই রাস্তা দিয়ে দরিদ্র দেশগুলোর ওপর ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করাও জরুরী। এমনিভাবে এই ইজারাদারীকে স্থায়িত্বকরণের জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়াও অত্যাবশ্যকীয়, যাতে উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণ যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিবে, তখন পশ্চিম থেকে আসা যে কোন বাতাসে তারা আত্ম প্রশান্তি অনুভব করবে। সেখানকার জীবন ব্যবস্থাকেই উন্নত ও মাপকাঠি মনে করবে এবং সেখানে অবস্থান ও বসবাসকেই স্বীয় আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু মনে করবে। পশ্চিম হতে আসা প্রতিটি বস্তুকে বুকে লাগাবে এবং তার ব্যবহারকেই ফ্যাশন ও উন্নত জীবন পদ্ধতির আলামত মনে করবে। সভ্যতা-সংস্কৃতির রাস্তা ধরেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্ব বিশেষকরে পাশ্চাত্যের আধিপত্য অত্যন্ত সহজতর হতে পারে। যাইহোক এসব বিষয় নিয়েই অত্যন্ত বিস্তারিত ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে অত্র গ্রন্থে। গ্রন্থটির মূল লেখক ভারতের উদীয়মান আলেমেদীন ও লেখক মাওলানা ইয়াসির নাদীম। এর বাংলা অনুবাদ করেছেন তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখক ও গবেষক মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী। 'গ্লোবালাইজেশন আওর ইসলাম' মূল বইটির উর্দূ থেকে অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করে প্রতিভাবা ন অনুবাদক এক দু:সাহসী কাজ সম্পাদন করেছেন। তিনি সমকালীন বিষয়ের ওপর আরও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই অনুবাদ ও রচনা করেছেন। নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে তার এ কাজ খুবই আশাব্যঞ্জক এবং সম্ভাবনাময়। যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা এবং আনুকুল্য পেলে আশা করা যায় তিনি লেখালেখি ও গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। সর্বোত্তম জাতি হিসেবে মুসলিম উম্মাহকে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত এবং সতর্ক করার জন্য এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও গবেষণামূলক কাজ আরও বেশি বেশি হওয়া উচিত। আমি আমার একান্ত স্নেহভাজন শহীদুল ইসলাম ফারুকী এবং তার মতো তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখক গবেষকদের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। তাছাড়া মানব জাতির কল্যাণার্থে উক্ত গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার কামনা করি।

**মুহাম্মদ কামারুজ্জামান**
সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা

পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কলামিষ্ট, পাকিস্তান শরীয়া কাউন্সিলের জেনালের সেক্রেটারী, আশ-শরীয়া একাডেমীর ডাইরেক্টর ও মাদরাসা নুসরাতুল উলুম গুজরানাওয়ালার শাইখুল হাদীস

## হযরত মাওলানা যাহেদ রাশেদী সাহেবের অভিমত

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তায়ালার। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী (স.), তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর পুন্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁর সকল অনুসারীর ওপর।

কোন ব্যক্তি যদি কোন বিল্ডিং দখল করার পর সেটাকে সে স্বীয় পরিকল্পনা ও নক্শা অনুযায়ী নতুনভাবে নির্মাণ করতে চায় তাহলে প্রথমে সে বিল্ডিংকে ভেঙে চুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে পুনরায় স্বীয় নক্শা অনুযায়ী সেটাকে সে পুনঃনির্মাণ করে। ঠিক পাশ্চাত্য জাতি মুসলমানদের সাথে এই আচরণ করেছে। যখন তারা মুসলমানদের বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর আধিপত্য অর্জন করল প্রথমে তারা খেলাফতে উসমানিয়াকে ভেঙে ফেলার টার্গেট বানাল এবং ন্যাশনালিজমের মতবাদ দাঁড় করিয়ে মুসলিম বিশ্বকে ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত করে দিল। যখন ইসলামী বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তখন তারা ইসলামী বিশ্বের ওপর ন্যাশনালিজমের নামে পশ্চিমের তৈরীকৃত মতবাদ চাপিয়ে দিতে লাগল। আসলে পাশ্চাত্যের নিকট ন্যাশনালিজম বা ইন্টারন্যাশনালিজম কোন বিষয় নয় এবং না এগুলো তাদের নিকট কোন মতবাদ বা দর্শনের মর্যাদা রাখে না, বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা। এজন্য ইসলামী বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য এক শতাব্দী পূর্বে ন্যাশনালিজম তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল। আর এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইন্টারন্যাশনালিজম এখন তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

পশ্চাত্যের দাবী হলো, তারা মানব প্রজন্মকে ইন্টারন্যাশনালিজম বা আন্ত র্জাতিকতা ও বিশ্বায়নের সবক পড়িয়েছে। তারাই মানব সোসাইটিকে বিশ্বায়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই দাবী সম্পূর্ণ ধোঁকা ও প্রতারণা। কারণ বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য যদি জাতীয়তার উর্ধ্বে মানব সোসাইটির সামাজিকতা ও ব্যষ্টিক গন্ডিকে কোন দর্শন ও মতবাদ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং দাওয়াত ও আহ্বানের ওপর ভিত্তি বানানো হয়, তাহলে এই কাজ সর্বপ্রথম ইসলামের পয়গাম্বার হযরত মুহাম্মদ (স.)-ই সে সময় করেছিলেন, যখন তিনি সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মক্কাবাসীদের সম্বোধন করেছিলেন। তার সামনে মক্কার লোক ছিল, কুরাইশ ছিল এবং আরব ছিল। কিন্তু তিনি গোত্র, দেশ ও জাতীয়তার এই তিন গন্ডি ভেঙ্গে চুরমার করে "হে মানব" বলে সম্বোধন করেছিলেন। অত:পর মাত্র সিকি শতাব্দী পরই আবার সেই সাফা পাহাড় থেকে মাত্র ১২ মাইল দূরে আরাফাতের ময়দানে প্রায় দেড় লাখ মানুষের সামনে বক্তব্য দিতে গিয়ে মানবতার জন্য জাতীয়তার ও আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে একটি দর্শন ও

মতবাদের মূলনীতি পেশ করেছিলেন। মানবেতিহাসে গোটা মানবতার সামনে সম্মিলিত বক্তব্যের শিরোনামে বিশ্বায়ন ও গ্লোবালইজেশনের এটাই ছিল প্রথম ঘোষণা।

এমনিভাবে পাশ্চাত্যচিন্তাবিদদের দাবী হলো, তারা মানব সোসাইটিকে আসমানী শিক্ষা হতে মুখ ফিরিয়ে যে দর্শন, মতবাদ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করেছে এবং তার পরিনতিতে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তা মানবেতিহাসের চূড়ান্ত যুগ। এখন এর থেকে উত্তম ও সুন্দর আর কোন দর্শন ও মতবাদ মানব সোসাইটির সামনে আসতে পারে না। এজন্য মানব সোসাইটি আজ তার চূড়ান্ত উত্থান পর্বে পৌঁছে গেছে। এরপর হবে কিয়ামত বা বিদায়ের যুগ। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের এটিও একটি ভুল ধারণা। এটাকে তারা "এন্ড দি হিষ্ট্রি" নামে বিশ্বায়নের সামনে পেশ করেছে। কারণ ইতিহাসে এর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (স.) "আমি ও কিয়ামত মিলিত দুই অঙ্গুলীর মত" একথা বলে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি ও তাঁর উম্মত "এন্ড দি হিষ্ট্রি।" এ কথারও বিস্তারিত আলোচনা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, তার সারসংক্ষেপ হলো- এর দু'টি পর্ব হবে। একটি অতিবাহিত হয়ে গেছে যার পর দুনিয়ার ওপর অনিষ্ট ও অকল্যাণ প্রবল হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় পর্ব হলো হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাব। এরপর পুনরায় মানবতার ওপর আসমানী শিক্ষার নেতৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর কিয়ামত সংঘটিত হবে।

কিন্তু পাশ্চাত্য তার বিজয়ের এই পর্বকে শেষ যুগ আখ্যা দিয়ে পরবর্তী যুগকে প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছে এবং তা প্রতিহত করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করছে। কিন্তু আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, পাশ্চাত্যের এই অভিযান ব্যর্থ হবে। ইসলামের আকৃতিতে মানবতার উপর আবার অহির শিক্ষার আলোকে একটি শাসন ব্যবস্থার পুনরায় অভ্যূদয় ঘটবে।

বিশ্বায়ন ও গ্লোবালাইজেশন পাশ্চাত্যের কোন দর্শন নয়, বরং মানবতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা এবং ইসলামী রেনেসাঁ ও নবজাগরণকে প্রতিহত করার একটি হাতিয়ার। যাকে প্রোপাগাণ্ডা ও প্রতারণার মাধ্যমে একটি দর্শন ও আইন হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করা হয়েছে।

মাওলানা ইয়াসির নাদিম তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ "গ্লোবালাইজেশন আওর ইসলাম"- এ পাশ্চাত্যের সে ষড়যন্ত্রের মুখোশ উম্মোচন করেছেন। বাংলাতে যার অনুবাদ করেছেন মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকার শিক্ষক তরুণ-উদীয়মান প্রতিশ্রুতিশীল আলেমেদ্বীন, লেখক মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী, ফাযেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত। আল্লাহ্ পাক তার সংকল্পগুলোকে বরকতময় করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।।

১০/০১/২০০৪ইং অবস্থানরত
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী পাঠাগার
মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর, ঢাকা।

**আবু আম্মার যাহেদ রাশেদী**
সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান শরীয়া কাউন্সিল

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলুম দেওবন্দের আরবী বিভাগের অধ্যাপক মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ

## হযরত মাওলানা নূর আলম খলীল আমিনী সাহেবের অভিমত

যখন থেকে মুসলিম উম্মাহ দুনিয়ার প্রতি এ পরিমান আসক্ত ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যার ফলে মৃত্যু তার নিকট অপছন্দনীয় হয়ে গেছে এবং দুর্ভাগ্যবশত সে দুর্বলতা ও কাপুরুষতার শিকার হয়ে গেছে, যাকে হুযুর (স.) 'ওয়াহনুন' শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন। তখন থেকে মুসলিম উম্মাহ হুযুর (স.) এর ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে দুনিয়ার অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সামনে তুচ্ছ ও মর্যাদাহীন হয়ে গেছে। অন্য জাতির হৃদয় হতে তাদের শক্তিকে সহীহ করার মনোভাব খতম হয়ে গেছে এবং তারা "স্রোতের বুদবুদে'র মত হয়ে পড়েছে। পরিনামে শত্রুরা তাদেরকে নিজেদের গ্রাসে পরিণত করেছে। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, চতুর্দিক হতে তাদের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে। শত্রুরা সবাই মিলে তাদেরকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলার চিন্তা করে নিয়েছে। এর জন্য স্কীম বানানো হয়েছে, পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং তাতে আরো রং বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এসব কিছু আমাদের দীনি দুরাবস্থা, নীতিচ্যুত হওয়া, আকীদার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা, আল্লাহ পাকের আহ্কামের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা ও প্রিয় নবীর শিক্ষা হতে ঘাড় ফিরিয়ে নেওয়ার কারণেই হয়েছে।" আমাদের বর্তমান লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা সম্পর্কে হুযুর (স.) বহু পূর্বেই ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। নবী করীম (স.) বলেছিলেন:

"খুব সন্নিকটে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে তোমাদের উপর পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়বে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারীরা সবাই মিলে বড় পাত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স.) সে সময় আমরা সংখ্যায় নগণ্য হওয়ার কারণে কি এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে? হুযুর (স.) বললেন, না, সে সময় তোমাদের সংখ্যা প্রচুর হবে। কিন্তু তোমরা সয়লাবের বুদবুদের মত (তুচ্ছ) হয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদের শত্রুর হৃদয় হতে তোমাদের ভীতি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে (ওহান) দুর্বলতা ও কাপুরুষতা ঢেলে দেবেন। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'ওহান' কি? হুযুর (স.) বললেন, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্টি।"

আমরা জীবনের সকল বিভাগে দু:খজনক পরিস্থিতির শিকার। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক তথা প্রতিটি পর্যায়ে অধ:পতন, লাঞ্ছনা ও

অনৈক্য আমাদের ভাগ্যলিপিতে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমরা আমাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি ও গুরুত্ব অবশিষ্ট নেই। আমরা জীবনের প্রান্তে অবস্থান করছি। তাগুতের প্রতারণা আর ধোঁকাবাজির উত্তাল তরঙ্গ অবিরত আঘাত হানছে আমাদের ওপর। শত্রু শিবিরে পরস্পরের মধ্যে প্রচুর অনৈক্য ও মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও আমাদের হত্যার জন্য শত্রু শিবিরের ঐক্য ও আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ধরণ অত্যন্ত মজবুত ও সুসংহত।

উসমানী খেলাফতের পতনের পর শত্রুরা তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা মোতাবিক আমাদের মুসলিম বিশ্বকে তারা এমনভাবে ধ্বংস করেছে যেন মুসলিম বিশ্ব সর্বদা প্রাণহীন লাশ হয়ে পড়ে থাকে। সুতরাং বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব শুধু প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের দন্তনখরে ক্ষতবিক্ষতই নয়, বরং উপনিবেশ যুগের চেয়েও আরো জঘন্যতম গোলামে পরিণত হয়েছে। আমাদের তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্রগুলো পাশ্চাত্যের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ। আমাদের শাসকবর্গ তাদেরই তাবেদার ও তল্পিবাহক। পাশ্চাত্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ, তাদের নীতি-পলিসি ও নির্দেশের বাস্তবায়ন এবং আমাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের পরিকল্পনার বাস্তবায়নই মূলত তাদের আসল কাজ।

আমাদের ইসলামী এবং আরব রাষ্ট্রগুলো যত দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার, তা প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্ট। কিন্তু আফসোস! আমাদের শাসকবর্গ মীর তকীর (১১৩৬-১২২৫ হিঃ মোতাবিক ১৭২৩-১৮১০ খৃষ্টাব্দ) ভাষায়, তারা সে ডাক্তারের কাছ থেকেই ঔষধ নেয় যার কারণে তাদের এই দুরারোগ্য ব্যাধি তাদেরকে ও তাদের দেশসমূহকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে গোলাম বানানোর সাথে সাথে পাশ্চাত্য ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বস্তুগত দিক দিয়েও দেওলিয়া বানানোর জন্য আমাদেরকে কখনো "লীগ অফ নেশনস" কখনো জাতিসংঘ, কখনো বিশ্ব ব্যাংক, কখনো আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ইত্যাদির মত তামাশায় অংশ গ্রহণের জন্য শুধু উস্কানি ও উৎসাহই প্রদান করেনি, বরং শক্তি ও চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের পাতানো ফাঁদে পা দেওয়ার জন্য আমাদেরকে বাধ্য করেছে। এর সাথে সাথে আমাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আরো উসকে দিয়েছে। আমাদেরকে একে অপরের সাথে লড়তে বাধ্য করেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা হত্যাকারী ও কসাইয়ের কাছ থেকেই সাহায্য নিয়েছি। তার কাছ থেকেই সমরাস্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করতে

বাধ্য হয়েছি। আমরা তাদেরকেই আমাদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াত দিই। তারা আমাদের কাছ থেকে এসব কিছুর বিনিময়ে বিরাট মূল্য আদায় করে। আমাদেরকে ঋনের পর ঋণের অতল গভীরে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের বিপুল পরিমান বস্তুগত উপকরণ ও পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও আমরা দাসত্ব ও গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে চলেছি, এমন কি শত্রুরা তাদের শিল্প-পণ্যের জন্য আমাদের দেশকে আসল মার্কেট ও সবচে বড় বাজারে পরিণত করেছে। এখন আমরা তাদের শিল্প ও অস্ত্রের সবচে বড় ক্রেতায় পরিণত হয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমরা সব কিছু নিঃশেষ করে দিয়েছি। কিন্তু দূর্ভাগ্য এই যে, আত্মতৃপ্তির সাথে আমরা বুঝে বসে আছি, আমরা সব কিছু পাচ্ছি। আমরা সে স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছি যার পর জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকুও শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আত্মপ্রতারণা ও আত্মবিস্মৃতির কারণে আমরা এই ধারণা করছি, আমাদের যিন্দেগীর সকল কিস্তি আদায় হচ্ছে। কখনো আবার আমাদের এই অনুভূতি হচ্ছে, আমরা পতনের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছি। কিন্তু পতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য যে ওষুধ ও প্রতিকারের আশ্রয় আমরা নিয়েছি তা আমাদের ইসলামী জীবনের জন্য মরণ ও বিষতুল্য প্রমানিত হয়েছে।

সুতরাং জাতীয়তা, দেশাত্মবোধক সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের সেই জোরালো শ্লোগান যা দ্বারা আমাদের খাদ্যনালীতে ক্ষত হয়ে গেছে, তা আমাদের জন্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা শক্তিবর্গ, বর্তমানে যার সবচেয়ে বড় ও একক মুখপাত্র আমেরিকা তার সার্বক্ষনিক প্রচেষ্টা হলো আমরা মুসলিম জাতি যেন সর্বদা তাদের দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকতে থাকি। আমাদের সঠিক প্রতিকার আমরা বুঝতে না পারি, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট ও ফিরিঙ্গিদের কাছেই নিজেদের জীবন কামনা করি এবং জেনেভা ও লন্ডনের কাছে ভিক্ষা করতে থাকি, যাতে ক্রমেই আমরা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমানের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হই। কারণ শত্রুদের ভালভাবেই জানা ছিল, যদি এই উম্মাহ তার আসল রাজপথ ফিরে পায় তাহলে তাদের ষড়যন্ত্রের সকল পরিকল্পনা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। পশ্চিমা শক্তি যার নেতৃত্ব দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসলামী বিশ্ব ও আরববিশ্বকে বর্তমান অবস্থায় বাধ্য ও পরাজিত করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা মুসলিম উম্মাহকে শুধু তার বস্তুগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আরবীয় ও ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও জীবনাচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন, সর্বব্যাপী প্রভাব সৃষ্টিকারী, পূর্ব

হতে বেশী অত্যাচার, স্বৈরাচার ও বর্বরতামূলক পরিকল্পনা ও খসড়া তৈরি করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করেছে। এর জন্য তারা তাদের পুরাতন ষড়যন্ত্রপূর্ণ দূরদর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তারা আমাদের তেল সম্পদ ও সকল প্রাকৃতিক উপকরণ দখল করে নিয়েছে। অত:পর আমাদের সামরিক শক্তিকে ইরান-ইরাক যুদ্ধ, ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ, কুয়েতের তথাকথিত যুদ্ধ, আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধকে উস্কে দিয়ে অত:পর আফগানিস্তানে আগ্রাসন ও দখল এবং ইরাকে আগ্রাসন ও দখলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বরবাদ ও নির্মূল করে দিয়েছে যাতে আমরা তাদের পুঁজিবাদী অর্থনীতি, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন কোনভাবেই প্রতিরোধ না করতে পারি। সাম্রাজ্যবাদের এই নব্য ষড়যন্ত্রকে তারা বিশ্বায়নের নাম দিয়ে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালিয়েছে। এটাকে তারা তাদের ভাষায় GLOBALIZATION (গ্লোবালাইজেশন) নাম দিয়েছে। এই পরিকল্পনা মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যায়নবাদ, ক্রুসেড, পাশ্চাত্য ও সর্বব্যাপী পরিকল্পনা, যার উদ্দেশ্য গোটা বিশ্ব, বিশেষ করে ইসলামী বিশ্ব আরো বিশেষভাবে আরব বিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে যায়নবাদ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বলয়ে নিয়ে আসা। সাবেক সামরিক সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য ছিল কোন দেশকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের বলয়ে নিয়ে আসা। কিন্তু এই নব্য সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য আরো বেশী সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী ও ভয়াবহ। যার উদ্দেশ্য গোটা ইসলামী বিশ্ব, বিশেষ করে আরববিশ্বকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে গোলাম বানানোর সাথে সাথে তার ওপর মার্কিন কালচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীবন-পদ্ধতি ও অর্থনীতি এমনভাবে চাপিয়ে দেওয়া যে, তারা যেন এটা অনুভবও না করতে পারে বাইরের কোন জিনিস আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিংবা আমাদেরকে কোন অপরিচিত ও বিপরীতমুখী কোন স্রোত গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে তো মুসলিম উম্মাহকে এই ধারণা দেওয়া হয়েছিল, এই নব্য মার্কিন যায়নবাদী পরিকল্পনা ও নকশা একটি সুন্দর, মনোরম, ইতিবাচক, আবশ্যকীয়, সৌভাগ্যশালী ও সার্বজনীন স্বচ্ছলতার গ্যারান্টি, যা মানুষকে স্টেট বা রাষ্ট্রের জালেম ও স্বৈরাচারী শাসকদের জুলুম-অত্যাচার থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রোজী-রুটির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত্বশাসন দান করবে। এটাও ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে, এই 'বিশ্বায়ন' মানবের এমন প্রাকৃতিক

প্রয়োজন যা থেকে তাদের পলায়নের কোন রাস্তা নেই, নেই কোন সুযোগ। সুতরাং তার প্রতিরোধ ও রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার প্রয়াস শুধু শিশুসুলভ আচরণের মতই হবে না, বরং মানব জাতির একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ও ইতিহাসের একটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয়ের সাথে টক্কর দেওয়ার নামান্তর হবে। 'বিশ্বায়ন' কিংবা গ্লোবালাইজেশনের প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য এ কথা মস্তিস্কে রাখতে হবে, দীর্ঘদিন পরে যায়নবাদী ও ক্রুসেডরা যারা শুধু একে অপরের বন্ধুই হয়ে যায়নি, বরং উভয়ে একে অপরের সম্পূরক হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পুনর্বাসনের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টানদের ধর্ম। গবেষকরা (যার মধ্যে পাশ্চাত্যের লেখক ও গবেষকরাও রয়েছেন) প্রমাণ করে দিয়েছেন, খৃষ্ট যায়নবাদই ইহুদী যায়নবাদের পথপ্রদর্শক এবং খৃষ্ট যায়নবাদই ইহুদী যায়নবাদ এবং ইস্রাইলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। সাম্প্রতিক এ বিষয়ে একজন মার্কিন মহিলা চিন্তাবিদ গ্রেস হলস (Grace Halsec) তার মূল্যবান গ্রন্থ 'নবুওত ও রাজনীতি'র (Prophecy and Politics) মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। উক্ত মহিলা নিজে একজন দ্বীনদার খৃষ্টান মহিলা, তিনি স্বীয় গবেষণায় অকাট্য প্রমাণের আলোকে স্পষ্ট করেছেন যে, খৃষ্টীয় যায়নবাদের শিকড় ১৬ শতাব্দী পর্যন্ত পৌঁছে, যখন খৃষ্টানরা বাইবেল অর্থাৎ প্রাচীন যুগ ও নতুন যুগের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অপব্যাখ্যার সূচনা করেছিল এবং প্রতিটি শব্দকে মুসলমানদের বাতেনী দলের মত রূপক অর্থের পোশাক পরাতে শুরু করেছিল। এটাও জানা কথা, ফিলিস্তিনে ইস্রাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঞ্জিনিয়ার কোন ইহুদী ছিল না, বরং খৃষ্টদেশ বৃটিশ ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশই এ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তব রূপ দান করেছিল। এটাও সুস্পষ্ট যে, দীর্ঘদিন যাবত মার্কিন অর্থনীতির মেরুদন্ডতূল্য সুদখোর যুক্তরাষ্টের ইহুদী গোষ্ঠীই মার্কিন রাজনীতিতে জেঁকে বসে আছে, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলত তারাই শাসনকার্য পরিচালনা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রেসিডেন্ট ইহুদী স্বার্থের সংরক্ষণ না করবেন তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আমেরিকার হোয়াইট হাউস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়, বরং তাকে হত্যা করা হয়। এমনিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'খৃষ্ট যায়নবাদ' রাজনৈতিকভাবেও ইহুদী যায়নবাদের গোলামে পরিণত হয়েছে। সেখানে আন্তর্জাতিক ইহুদী যায়নবাদই যা কিছু চাইবে তাই হবে, তাদের মর্জি ছাড়া কোন কাজ হবে না।

আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জুনিয়র জর্জ বুশ, যিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জর্জ বুশের সন্তান, তিনি তার পিতার দাম্ভিকতা ও গোড়ামি পূর্ণাঙ্গভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছেন, বরং পিতার চেয়ে আরো দু'কদম আগে রয়েছেন। এই জুনিয়র বুশ সম্পর্কে বারবার মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমে এসেছে যে, তিনি কট্টর খৃষ্টান এবং খৃষ্ট জায়নবাদের গোড়া সমর্থক। তিনি একথা বিশ্বাস করেন যে, ফিলিস্তিনের সুবিশাল ও বিস্তৃত ইস্রাঈলী রাষ্ট্রই বিশ্বের আণবিক ধ্বংসের কারণ হবে, ফলে হযরত ঈসা (আ:) এর আবির্ভাবের রাস্তা সুগম হবে এবং খৃষ্টানদের চিন্তা ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবতা লাভ করবে। এজন্য এই জুনিয়র বুশ মার্কিন যায়নবাদী বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের সবচে বড় সমর্থক এবং এ সম্পর্ক আরো জোরদার করার জন্য রাত দিন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি চান সমগ্র বিশ্বের বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বের ওপর মার্কিন যায়নবাদী ও ক্রুসেডারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবেরূপ লাভ করুক। বিশ্বায়নের এই পরিকল্পনা যুদ্ধংদেহী ও সন্ত্রাসী বুশ গোটা বিশ্বের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চান। তারই পিতা সিনিয়র বুশ কুয়েতের স্বাধীনতার অজুহাতে উপসাগরীয় দেশগুলোতে নিয়মতান্ত্রিক সামরিক দখলদারিত্বের জন্যে উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সৈন্য প্রেরণের সময় ১৯৯০-এর আগষ্টে 'নতুন যুগ নতুন স্বাধীনতা' গোটা বিশ্বের জন্য শান্তির যুগ' এমনিভাবে তার এক মাস পর ১৯৯০-এর সেপ্টেম্বরে 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা' কিংবা 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' নামে বিশ্বাবাসীর সামনে বোতল থেকে বের করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থার নিয়মতান্ত্রিক সূচনার সাথে সাথে বিশ্বায়ন কিংবা 'গ্লোবালাইজেশন- এর নিয়মতান্ত্রিক প্রয়োগ বা ব্যবহার ১৯৯৫-এর এপ্রিলে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের গর্ভ হতে সৃষ্ট সংগঠন আন্ত র্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা ও এর প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়। সে সময় থেকে এ শব্দের নিয়মতান্ত্রিক প্রয়োগ ও ব্যবহার ব্যাপক হারে হতে থাকে।

মোট কথা, এই পকিল্পনার প্রতিষ্ঠাতা ও তা প্রচার প্রসার ও ব্যাপকতাদানকারী, সময়ের সবচে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হলো যায়নবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র তার ক্রমবর্ধমান শক্তি, বিজ্ঞানের উন্নতি, টেকনোলজির উৎকর্ষ, সামরিক প্রাগ্রসরতা, বিশেষ করে ইনফরমেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি তাকে অহংকারী, দাম্ভিক, উন্মাদ এবং সকল অন্যায়, অপরাধ, জুলুম ও অবিচারের জনকে পরিণত করেছে। সে তার অসংখ্য অগণিত বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইসলামী বিশ্ব, বিশেষ করে আরববিশ্বের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়েছে এবং তা তছনছ করে দিচ্ছে। আর অবশিষ্ট শূণ্যতাগুলো ইহুদী লবী পূরণ করে দিচ্ছে। এ লবী ইসলাম ও ক্রুসেডার কিংবা ইসলাম ও যায়নবাদের মাঝে আন্তর্জাতিক রক্তাক্ত সংঘর্ষের জন্য নিরলস প্রয়াস, প্রচেষ্টা, উদ্বুদ্ধ ও পরিকল্পনা তৈরিতে লেগে আছে!

## বিশ্বায়নের আসল টার্গেট যেহেতু মুসলিম উম্মাহ[২]

এজন্য ইসলামী বিশ্ব ও আরববিশ্বের উলামায়ে উম্মত এই যায়নবাদী মার্কিনী বিশ্বায়নের প্রতি সুধারণা পোষণ করাকে "কুফর ও ধর্মান্তর" আখ্যা দিয়েছেন। কারণ এর উদ্দেশ্য হলো আকীদা-বিশ্বাস, দীন-ধর্ম, তাহযীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আখলাক-চরিত্র ও জীবনাচার-মূল্যবোধ ইত্যাদি সব কিছুকে পরিবর্তন করে তা মার্কিনী রঙ্গে রঙ্গীন করা। আল্লাহর তাওহীদ, রাসূলের আদর্শ ও ইসলামের মূলনীতি হতে দূরে সরানোই বিশ্বায়নের রূপরেখা ও কাঠামোর একটি অংশ। অতএব, বিশ্বায়নের এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী এবং ইসলামের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। যখন থেকে এই পরিকল্পনা জনসম্মুখে এসেছে তার ভয়াবহতা, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে এবং ইসলাম ও মুসিলম উম্মাহর ব্যাপারে তার ভায়নক ও কুৎসিত চেহারার আবরণ উন্মোচিত হয়েছে তখন থেকে ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকরা সীমাহীন চিন্তায় পড়ে গেছেন এই ভেবে যে, এই চ্যালেঞ্জের কিংবা সাম্রাজ্যবাদের এই নব পদ্ধতির কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়। এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার জন্য অসংখ্য সম্মেলন, কনফারেন্স ও সেমিনার হয়েছে। তন্মেধ্যে দু'টি সেমিনার খুব জাকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি কনফারেন্স কুয়েত ইউনিভার্সিটির ইসলামী শরীয়া ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এবং ধর্ম ও ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ১২-১৬ই শাবান

---

২। কারণ প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্বে কেন্দ্রীয় ও বড় শক্তিমাত্র তিনটিই রয়েছে যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির সীমারেখা বিস্তৃতির ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান রয়েছে:

(১) আমেরিকার রূপে পুঁজিবাদী শক্তি, যে শক্তি মার্কিন আধিপত্য ও পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন বাস্তবায়নের পথে ধাবমান।

(২) যায়নবাদী শক্তি, যে ইহুদীদের শক্তিশালী লবীর আকৃতিতে বিশাল ইস্রাঈলী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং যায়নবাদী বিশ্বায়ন বাস্তবায়নের পথে ধাবমান।

(৩) ইসলামী শক্তি যে ইসলামী বিশ্ব বিশেষ করে ইসলামী কার্যসীমা ও কর্মক্ষেত্রের আকৃতিতে ইসলামের আওয়াজ উচ্চে তুলে ধরার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এমনিভাবে দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে সকল বাতিল চিন্তাধারা, আন্দোলন ও ধ্যান-ধারণার সাথে আপোস করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যায় এবং 'বাঁচো বাঁচতে দাও" পলিসির ওপর আমল করে। পরিশেষে ধর্ম বাতিল চিন্তাধারা ও মতবাদের অংশ ও তার গুণগ্রাহী হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্ববাসীর পছন্দনীয় ও মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম কোন বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারার সাথে আপোস করতে প্রস্তুত নয়।

সুতরাং দুনিয়ার অন্যান্য মতবাদ ও চিন্তাধারার সাথে কেবল ইসলামেরই মোকাবেলা হতে পারে। আর সকল বাতিলের ধারক-বাহকরা এই ইসলামের সাথেই সংঘর্ষে লিপ্ত।

১৪২০ হিজরী মুতাবিক ২০-২৪ শে নভেম্বর ১৯৯৯ সালে কুয়েতে 'বিশ্বায়নের প্রতিরোধ' শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয়। আর দ্বিতীয় সম্মেলনটি মক্কাতে রাবেতা আলমে ইসলামীর উদ্যোগে ২৩-২৭ শে মুহাররম ১৪২৩ হিঃ মুতাবিক ৬-১০ এপ্রিল ২০০২ সনে মুসলিম উম্মাহ ও বিশ্বায়ন শিরোনামে অনুষ্ঠিত হয়।

এ সম্মেলনে ভারত থেকেও অনেক উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের দায়িত্বশীল, বিশেষ করে রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল ড. আব্দুল্লাহ আবুল মুহসিন তুর্কীর দাওয়াতে দারুল উলুম দেওবন্দের স্বনামধন্য চ্যান্সেলার মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেবও উক্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। উল্লিখিত দু'টি সম্মেলনের প্রস্তাব ও সুপারিশমালায় যা কিছু বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হলো; বিশ্বায়নের মোকাবেলার জন্য তিন ধরনের মনোভাব গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১. বিশ্বায়নকে সর্বোতভাবে মেনে নেয়া হবে এবং আমেরিকা ও যায়নবাদীদের দাবী অনুযায়ী একে মানবতার জন্য কল্যাণের উৎস মেনে নেয়া হবে। প্রকাশ থাকে, বাস্তবতার আলোকে এটা সম্পূর্ণ ভুল আর মুসলমানদের এ ধরনের বিশ্বাস রাখা কুফর ও ধর্মান্তরের শামিল।

২. বিশ্বায়নকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করত প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নিুবর্ণিত কারণসমূহের আলোকে তা সম্ভব নয়ঃ

(ক) বিশ্বায়নের প্লাবন গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলেছে কিংবা গ্রাসের পথে। পুরো বিশ্ব এক পল্লী, বরং এক অঙ্গনে পরিণত হয়েছে। সুতরাং কোন কামরায় বন্ধ থাকা সম্ভব নয় বা সবার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একাকিত্ব অবলম্বন করা সম্ভব নয়।

(খ) বিশ্বায়ন অসংখ্য চ্যানেলের মাধ্যমে লোকদের শিকার করে চলেছে, কেউ চাক বা না চাক। এসব চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করা ব্যক্তি তো দূরে থাক, বরং সরকারের পক্ষেও সম্ভব নয়।

(গ) সমকালীন বিশ্ব ব্যবস্থার গঠন ও রূপরেখাই হলো পারস্পরিক লেনদেন, মত বিনিময় ও যৌথ সাহায্য-সহযোগিতা। অতএব, কোন জাতি বা দল বা গ্রুপের পক্ষে নিজেকে সমকালীন বিশ্ব হতে পৃথক রাখা সম্ভব নয়।

(ঘ) তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ সাবেক ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের অবসান হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রাচীন প্রভুদের সাথে এ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট যেমন প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে হয়ে থাকে। সুতরাং এসব দেশের পক্ষে

তাদের কবল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। এ ধরনের আরো অনেক বিষয়ের কারণে সর্বক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

৩. তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বিশ্বায়নের ইতিবাচক দিকগুলো হতে ফায়দা ওঠানো হবে। আর তার নেতিবাচক দিকগুলো থেকে সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। এর কারণ হলো 'হিকমত' মুমিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাওয়া যাবে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো নির্বাচন করা মোটেই সহজ কাজ নয়। এর জন্য বড় বুদ্ধিমত্তা, হুশিয়ারী, অভিজ্ঞতা ও শ্রমের প্রয়োজন। এই বাছ-বিচার বা নির্বাচন দুভাবে আঞ্জাম দেয়া যেতে পারেঃ (ক) ব্যক্তিগত পর্যায়ে। তার ধরন বা পদ্ধতি হবে, ইলমের উদ্দেশ্য ও তার সার্বজনীনতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল হতে হবে, যার মধ্যে বিশ্বায়ন ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, তার ধ্বংসকারিতা ও ক্ষতিকর দিক এবং তার প্রতিরোধ ও মোকাবেলার মাধ্যম ও উপকরণের জ্ঞানও অন্তর্ভূক্ত। এর জন্য উলামা, গবেষক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি ও তালিবে ইলমদের এগিয়ে আসতে হবে। সাধারণ মুসলমানের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামবিরোধী ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও ষড়যন্ত্র থেকে নিজস্ব দীন-ধর্ম ও ঈমানকে রক্ষার পথ বের করার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে। ইসলামী চেতনা ও দীনী জাগরণ বিশ্বায়নের নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

(২) সামষ্টিক পর্যায়ে অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে সম্মিলিতভাবে সকল ক্ষেত্রে কুরআন- সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ মজবুত ও শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে সকল শক্তি ও প্রাকৃতিক উপকরণ দ্বারা ফায়দা লাভ করা যায়। এরপর বিশ্বায়নের সে সব ইতিবাচক দিক থেকে ফায়দা গ্রহণ করা যেতে পারে, যা আমাদের দীনের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হবে না এবং যা আমাদের পার্থিব জগতের জন্য ফলপ্রসূ হবে।

বিশ্বায়নের প্রতিরোধ শুধু সরকারী প্রস্তাব ও রাষ্ট্রীয় সুপারিশমালার মাধ্যমে সম্ভব নয়, বরং তা প্রতিরোধের একমাত্র পদ্ধতি হলো, প্রথমে আমরা তা মোকাবেলার পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে সাথে সাথে ইসলামের আলোকে তার বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে এবং তা বিশ্ববাসী, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সামনে নিয়ে আসতে হবে। ইতিহাস বলে, বিশ্ববাসী আমাদের উপকারী ও ভাল কথাগুলো অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

সেই হিসেবে উলামায়ে কিরাম ও চিন্তাবিদরা বিশ্বায়ন সম্পর্কে লেখালেখি করছেন এবং ক্রমেই বিশ্ববাসীর সামনে এর স্বরূপ উন্মোচিত হচ্ছে, বিশেষ করে আরবী ও ইংরেজী ভাষায় এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। কিন্তু আমার জানা মতে উর্দূতে এ পর্যন্ত বিশ্বায়নের ওপর নিয়মতান্ত্রিক কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। মনে হয় এ বিষয়ে এটাই প্রথম গ্রন্থ। স্নেহভাজন মাওলানা ইয়াসির নাদীম খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করে এ রকম একটি নতুন বিষয়ে কলম ধরে মুসলিম উম্মাহর বিরাট উপকার সাধন করেছেন। আল্লাহ তাকে ও তার শ্রমকে কবুল করুন। আমীন!

২৩/৬/১৪২৪ হিজরী

**নূর আলম খলীল আমিনী**
শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
দারুল উলম দেওবন্দ।

# বিশ্বায়নঃ
# সাম্রাজ্যবাদের নতুন
# স্ট্র্যাটেজি

প্রথম অধ্যায়

# বিশ্বায়ন কী?

## বর্তমান যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

বিগত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে 'বার্লিন প্রাচীর' ভেঙ্গে যাওয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে আজ পর্যন্ত সর্বস্তরে একটি প্রশ্ন সামনে আসছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই এর উত্তর অনুসন্ধান করছে। প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষ এর স্বরূপ জানতে চাচ্ছে। প্রত্যেক সচেতন মানুষ জানতে চাচ্ছে, আমরা যে দুনিয়ায় অবস্থান করছি তা কোন দিকে চলছে এবং তা কোন পথে ধাবমান? এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে বারবার যে প্রশ্নটি সামনে আসছে তা বিশ্বায়ন সম্পর্কে। বিশ্বায়নের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'গ্লোবালাইজেশন' এবং আরবী প্রতিশব্দ 'আল-আওলামাহ'। যখন থেকে মানুষ এই পরিভাষার সাথে পরিচিত হয়েছে, তখন থেকে এর তত্ত্ব ও স্বরূপ, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো জানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকে নিয়ে মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যম পর্যন্ত সর্বস্তরে এই বিশ্বায়ন একটি 'ইন্টারেষ্টিং' আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়ন বা গ্লোবাইজেশনের শিরোনামে বিভিন্ন স্থানে কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা হচ্ছে, বক্তৃতা করা হচ্ছে এবং এই নতুন পরিভাষার সকল দিক নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা-পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এই আলোচনায় আরব, অনারব, পূর্ব-পশ্চিম তথা গোটা বিশ্বের সকল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ অংশ নিচ্ছে, উদারপন্থী গণতন্ত্রপ্রিয়, সেক্যুলার, ধর্মনিরপেক্ষ, মার্কসবাদের গুণগ্রাহী, ইসলামপন্থী, খৃষ্টান, বামপন্থী, ডানপন্থী, মধ্যপন্থী সবাই অংশ নিচ্ছে। এমনিভাবে অর্থনীতিবিদ, মনস্তত্ত্ববিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, মানববিদ্যা, ভাষাবিদ, রাজনীতিবিদরাও কেউ কারো থেকে পিছিয়ে নেই। সবাই বিশ্বায়নের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল এবং এর কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ নিজ নিজ আঙ্গিকে করছেন। শুধু পার্থক্য এতটুকু, কোথাও আলোচনার মাঝে নেতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে আর কোথাও ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে।

এজন্য নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকায় বিশ্বায়ন সম্পর্কে যত কিছু লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে সম্ভবত অন্য কোন বিষয়ে এত অধিক পরিমাণে লেখা হয়নি।

## একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা

বিশ্বায়নের স্বরূপ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র নির্ধারণের ব্যাপারে পশ্চিমা লেখকদের সাথে সাথে ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, উলামা ও কলম সৈনিকরাও অংশ নিচ্ছেন। বিশ্বায়ন সম্পর্কে লিখিত কোন না কোন গ্রন্থ একের পর এক জনসম্মুক্ষে এসেই যাচ্ছে। আরবী ও ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় তাঁদের গবেষণাধর্মী ও বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েই চলেছে। এটি একটি উজ্জ্বল দিক ও সম্ভাবনা। যখন থেকে পশ্চিমা জগৎ প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্বায়নের প্রচার-প্রসার শুরু করেছে, তখন থেকে এর অশুভ উদ্দেশ্য দুনিয়াবাসীর সামনে উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে এবং এর অন্তরালে রচিত সকল ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে চলেছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ এই পরিভাষার গবেষণা ও বিশ্লেষণের মধ্যে মগ্ন হয়ে লেগে আছেন এবং এর স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য তারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানদেরই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হলো, যখনই এমন কোন বাতিল আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যার উদ্দেশ্য দ্বীন ইসলামের মধ্যে অনপ্রবেশ করা অথবা ইসলামকে চিরনির্মূল করা, তখনই মুসলমানগণ ভাষা ও কমলমের মাধ্যমে দলিল-প্রমাণ হাজির এ ধরনের প্রতিটি আন্দোলন পরাজিত করেছেন এবং তাদের পক্ষ হতে রচিত সকল ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামের প্রাথমিক ও মধ্যযুগে বিভিন্ন মতবাদ ও আন্দোলন জন্ম নেয়। এগুলোর উদ্দেশ্য ইসলামকে চিরতরে নির্মূল করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু উলামায়ে উম্মত এ ধরনের সকল মতবাদ ও আন্দোলনকে অংকুরেই মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। ফলে সে সমস্ত আন্দোলন ও মতবাদ দুনিয়ার ইতিহাস থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, কেবল ইতিহাস ও আকায়েদ গ্রন্থেরই কিছু কিছু অধ্যায়ে যৎকিঞ্চিত মাত্র তাদের আলোচনা পাওয়া যায়। এছাড়া তাদের কোন প্রচারক বা প্রবক্তা ভূপৃষ্ঠের কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। নি:সন্দেহে ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াসহ (র.) অন্য উলামা, ফুকাহা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিসীনের কাঁধে যুগ চাহিদা পুরণে যে দায়িত্ব ও যিম্মাদারী ছিল,

আজকের গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের যুগে সেই একই দায়িত্ব ও যিম্মাদারী বর্তমান যুগের উলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের উপর অর্পিত হয়েছে। অতীতের উলামায়ে কেরাম যেভাবে বাতিলের প্রতিরোধ করেছেন এবং তাঁরা যে যুগ সচেতনতা ও দূরদর্শিতার সাথে তাদের মোকাবলো করেছেন, সেই একই সচেতনতা ও দূরদর্শিতার সাথে বর্তমান যুগের আলেমদেরকে নতুন যুগের সবচেয়ে বড় ফিতনা ও চ্যালেঞ্জ 'গ্লোবালাইজেশন' তথা বিশ্বায়নের মোকাবেলা করতে হবে।

## নতুন ফিতনা নয়

পশ্চিমা জগৎ তথা আমেরিকার মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দেয়া মতবাদ 'বিশ্বায়ন'-এর শিকড় অত্যন্ত গভীরে। আজ পশ্চিমা জগৎ মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে দিতে সচেষ্ট। তারা মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়াবলী সন্দেহযুক্ত করে নিজেদের চারিত্রিক প্রবণতা মুসলিম উম্মাহর ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক তথা প্রতিটি দিক দিয়ে আধিপত্য বিস্তার করা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং মুসলিম উম্মাহকে তাদের বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা পশ্চিমাদের মূল টার্গেট। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে যে কঠিন ও নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন তা হঠাৎ করেই হয়নি, বরং তা বছরের পর বছরের ষড়যন্ত্রের সার-নির্যাস এবং মুসলমানদের অলসতা ও গাফলতির ফল। আজ পশ্চিমা দুনিয়া প্রাচ্যের ওপর বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর ওপর বিজয় অর্জন করেছে ঠিকই কিন্তু ইতিহাসের পাতা ওল্টালে জানা যায়, প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের মাঝে সংঘটিত দ্বন্দ্ব কোন নতুন বিষয় নয়, বরং এর সূত্র পরম্পরা অনেক প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজান্ডার দি গ্রেট প্রাচ্য বিজয় করে নিয়েছিলেন এবং তিনি তার সকল পন্ডিত ও চিন্তাবিদকে এই দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন যে, তারা প্রাচ্য নিয়ে গবেষণা করবে এবং তার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করবে, যাতে তাদের গবেষণার আলোকে প্রাচ্যকে গোলাম বানানো যায়। এভাবেই সে যুগের খৃষ্টীয় গীর্জাগুলো প্রাচ্যের বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করে। কিন্তু ইসলাম যখন জাযিরাতুল আরবের সীমারেখা অতিক্রম করে চলল এবং তার দাওয়াত সমগ্র দুনিয়ায় প্রসারিত হতে লাগল, তখন পশ্চিমা দুনিয়ার গীর্জার পক্ষ হতে ইসলাম (যা তাদের দৃষ্টিতে প্রাচ্যের ধর্ম ছিল)-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পেল। ইসলামকে পরাজিত করা এবং তাকে ফোকলা করার জন্য নানান

পরিকল্পনা রচিত হতে লাগল। পরিশেষে তাদের অন্তরে লুক্কায়িত হিংসা-দ্বেষ, অন্তরে লুকানো শত্রুতা ও দুশমনী, মস্তিস্কে চেপে থাকা অহংকার-অহমিকার উত্তাল ঢেউ ক্রুসেড যুদ্ধরূপে উপচে পড়ে। কিন্তু যুদ্ধে তাদের শোচনীয় পরাজয়ের পর পশ্চিমা জগৎ যুদ্ধের ধরন ও কৌশল পাল্টে দেয় এবং নতুন কর্মকৌশল (Road Map) তৈরি করে। পশ্চিমা দুনিয়া যার নাম দেয় এস্তেশরাক[৩] বা প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ রিচার্ড সোজান 'মধ্যযুগে ইউরোপে ইসলামের ছবি' নামক স্বীয় গ্রন্থে এবং অন্য একজন প্রাচ্যবিদ নরম্যান দানিয়াল মধ্যযুগে ইউরোপ ও আরব' নামক গ্রন্থে পশ্চিমাদের সেই কুটিল ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করলে জানা যায়, প্রাচ্যবিদরা কি ধরণের অমানবিক ও অনৈতিক গুণাবলীকে ইসলাম ও ইসলামের নবীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছে। এগুলো তারা এজন্য করেছে, যাতে ইসলামের রূপ বিকৃত হয়ে যায় এবং লোকজন ঈমানের রাস্তা হতে দূরে ছিটকে পড়ে। চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদেরকে ইসলামের মত মহামূল্যবান সম্পদ হতে বঞ্চিত করা যায়। কিন্তু বছরের পর বছর নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদদের কুটিল ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইসলাম প্রাচ্যের বুক চিরে পশ্চিমের হৃৎপিন্ডে গিয়ে পৌঁছে যায়। তাদের লাখো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইসলামের প্রদীপ্ত সূর্য অস্তমিত হয়নি, বরং দুনিয়ার আকাশে আজো দীপ্যমান হয়ে আছে। উলামায়ে উম্মত বরাবরের মত এবারও যুক্তি-প্রমাণের শক্তি দিয়ে 'প্রাচ্যবিদদের' দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন। পরিশেষে বিংশ শতাব্দী আসতে না আসতেই প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা ওরিয়েন্টালিজম-এর ষড়যন্ত্র অন্য রোড় ম্যাপ তৈরি করে।[৪] ইসলামী বিশ্বের প্রখ্যাত গবেষক ড. এডওয়ার্ড সাঈদ ও ড. আনোয়ার আব্দুল মালেকের মতে ১৯৭৩ সালে ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ শহর প্যারিসে প্রাচ্যবিদদের উনিশতম বিশ্ব কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কনফারেন্সে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ইহুদী প্রাচ্যবিদ বার্নার্ড লুঈস বলেন, এখন আমাদেরকে ওরিয়েন্টালিজম তথা প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার পরিভাষা ইতিহাসের গর্বে বিলীন করে দেওয়া উচিত। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত কনফারেন্সে এই পরিভাষার প্রয়োগ বাদ দেয়া হয় এবং এক নতুন পরিভাষা

---

৩। এস্তেশরাক তথা ওরিয়েন্টালিজম হলো পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী প্রাচ্যের ধর্ম, কৃষ্টি-কালচার নিয়ে অধ্যায়ন করে বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানোই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৪। লিমা নাখশাল আওলামাহ (প্রবন্ধ) সাহিলা যায়নুল আবেদীন হাম্মাদ। মাসিক আল আলম আল ইসলামী সংখ্যা, ১৭৩৮-২২ মুহররম, ১৪২২ হি.।

ব্যবহারের ওপর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর ওরিয়েন্টালিজম তথা প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্যার নতুন রোড ম্যাপ তৈরির দায়িত্ব আমেরিকাকে অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে আমেরিকা এই নতুন পরিভাষা গ্লোবালাইজেশন তথা বিশ্বায়নের নামে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করে।[৫] শুধু পার্থক্য এতটুকু, আগে প্রাচ্যবিদদের টার্গেট ছিল শুধু ইসলাম, আর এখন গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের টার্গেট হলো দুনিয়ার সকল ধর্ম। অবশ্য ইসলাম বিশ্বায়নের সামনে এই দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ইসলামের মধ্যে বিশ্বায়ন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ও শক্তি পূর্ণ মাত্রায় আছে। অন্যান্য ধর্ম এই শক্তি হতে বঞ্চিত। পূর্বে প্রাচ্যবিদদের কর্মক্ষেত্র ছিল শুধু ধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। আর এবার বিশ্বায়নের কর্মক্ষেত্র হলো ধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সাথে অর্থনীতি ও রাজনীতিও। কেমন যেন গ্লোবালাইজেশনের পরিভাষা ওরিয়েন্টালিজম ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়কে এক করে দিয়েছে। অতীতে যদিও উভয়ের লক্ষ্য এক ছিল, কিন্তু পথ ছিল আলাদা আলাদা। আর আজকের গ্লোবালাইজেশনের লক্ষ্যও এক এবং ঐ লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছার পথও এক।

## সাম্রাজ্যবাদের নতুন সংস্করণ

গ্লোবালাইজেশন যেমন ওরিয়েন্টালিজমের নতুন রূপ, তেমনি সাম্রাজ্যবাদেরও নয়া সংস্করণ। অন্য ভাষায় নতুন পাত্রে পুরাতন মদ। কারণ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে তার ওপর স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে স্বীয় তাহযীব-তামাদ্দুনের রঙ্গে রঙ্গীন করা এবং তার ওপর নিজের প্রথা-প্রচলন, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ জবরদস্তিমূলক চাপিয়ে দেওয়া। এমন কি শক্তির বলে তার দ্বীন ও ধর্মকেও পরিবর্তন করার নিন্দনীয় প্রচেষ্টা করা। যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি স্বীয় প্রতিপক্ষের ওপর পূর্ণ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

মানবেতিহাস দীর্ঘ সময় ধরে সাম্রাজ্যবাদ ও তার আনীত ধ্বংসকারী পরিনতির সাথে পরিচিত। কিন্তু এ কথা নির্দিষ্ট করে বলা খুবই দুরূহ যে, ধরাপৃষ্ঠে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা কখন থেকে হয়েছে? দুনিয়া কখন থেকে অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে, সবলকে দুর্বলের ইজ্জত লুণ্ঠন করতে এবং মজলুমকে জুলুমের যাঁতাকলে পিষতে দেখেছে? মোট কথা, জুলুম ও অত্যাচারের এই কাহিনী ও

---

[৫]। প্রাগুক্ত।

সাম্রাজ্যবাদের অজ্ঞাত ইতিহাস সত্ত্বেও এতটুকু সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদ তা যে কোন পরিমন্ডলে হোক এবং যে কোন আকৃতিতে হোক, জুলুম ও অত্যাচারের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। ভিন্ন জাতিকে গোলাম বানানোর পরিকল্পনা, দুনিয়াকে অধীন করার উচ্চাভিলাষ ও অন্যের ওপর স্বীয় তাহযীব-তামাদ্দুন চাপিয়ে দেওয়ার কামনা-বাসনা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আলেকজান্ডার দি গ্রেট প্রাচীন দুনিয়াকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত গ্রীস বানানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। তার স্বপ্ন ছিল, বিশ্বের কোণে কোণে গ্রীক সভ্যতার রাজত্ব চলবে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তিনি একটি কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার নাম ছিল আলেকজান্দিয়া। আলেকজান্ডার দি গ্রেটের পর রোমকরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিবর্তে সামরিক শক্তি মাধ্যমে গোটা দুনিয়াতে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি চালু করেছিল। রোম ও পারস্যের মাঝে দীর্ঘ যুদ্ধের মূল কারণ ছিল সিরিয়ার ঐ অঞ্চল, যা কখনো পারস্যের কলোনী হতো আবার কখনো রোমের কলোনী হতো। ঐ অঞ্চলের ওপর স্বীয় আধিপত্য, ক্ষমতা ও নিজের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন বিশ্বের এই দুই পরাশক্তি পরস্পরে লড়াইরত ছিল। কিন্তু ইসলামের বৈপ্লবিক আবির্ভাব তদানীন্তন সেই পরাশক্তির অহমিকা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। তাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রদীপ্ত প্রদীপকে চিরতরে নির্বাপিত করে দিয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের এই জোয়ার ও প্লাবনে সে সকল জাতির পতনে থেমে থাকেনি, বরং সেই প্লাবন এ যুগে এসেও প্রবেশ করেছে, যাকে পশ্চিমা দুনিয়া নতুন যুগ নাম দিয়েছে। সুতরাং বর্তমান যুগেও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন অব্যাহত আছে। সভ্যতার দাবীদার জাতিগোষ্ঠী অপসংস্কৃতির নতুন নতুন ধরন পেশ করে যাচ্ছে।

পশ্চিমা দুনিয়া সমুদ্রপথে ইসলামী বিশ্বের দিকে অগ্রসর হয়ে ভারতের মোঘল শাসনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। আফ্রিকা মহাদেশের ১৪ মিলিয়ন জনগণকে গোলাম বা দাস বানিয়ে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে ফরাসী, ওলন্দাজ, বেলজীয়, ইটালীয়, জার্মানী, স্পেনীয় ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদেরও সূচনা হয়ে যায়। তারা সমগ্র দুনিয়াকে গ্রাস করা ও তার কোণায় কোণায় নিজেদের কলোনী বানানোর প্রয়াস শুরু করে। এমন কি পরাজিত জাতির ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেয়। ফলে গোটা আফ্রিকাবাসী ফরাসী ও ইংরেজী সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উত্তর-পশ্চিমে ইংরেজী ভাষার প্রচলন শুরু হয়ে যায়। মধ্য-পশ্চিমে ইংরেজী ভাষার প্রচলন, অথচ দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেনিশ ও পর্তুগীজ ভাষার

প্রচলন হয়ে যায়। হল্যান্ড, স্পেন ও পর্তুগীজ ভাষাসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়।[৬] মোটকথা, সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ, মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থানের কাল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পা ফেলতে ফেলতেই সাম্রাজ্যবাদের সূর্য অর্ধ দিবস পর্যন্ত পৌঁছার পরই আবার পতনের কোলে ঢলে পড়ে। অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত উদয়-অস্তের পর শেষ পর্যন্ত একেবারে অস্তমিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র দুনিয়ায় স্বাধীনতার উত্তাল তরঙ্গ উপচে পড়ে। দেশে দেশে গণবিপ্লব সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে খন্ড খন্ড আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। প্রতিটি দেশই অত্যাচার ও নির্যাতনের হিংস্র থাবা হতে মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার জন্য রণসাজে সজ্জিত হচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল জুলুল-অত্যাচারের হয়তো বা এবারই সমাপ্তি হয়ে যাবে। সাম্রাজ্যবাদের ধারাবাহিকতা শেষ প্রহর গুণছিল। জুলুম-অত্যাচারের কাহিনী শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তিমিরাচ্ছন্ন রাতের পর উজ্জ্বল প্রভাতের সোনালী সূর্যের কিরণ উঁকি মারছিল। শেষ পর্যন্ত তা উদিত হলো।

দেশ তো স্বাধীন হলো! দখলদার শক্তিও বিদায় নিয়ে গেল। কিন্তু আরেক সাম্রাজ্যবাদের জন্য তারা ময়দান ও ক্ষেত্র তৈরি করে গেল। এক নতুন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাস্বরূপ তারা প্রাচ্য দেশগুলোর মাঝে বংশ, ভাষা ও ধর্মীয় বিভেদের আগুন জ্বালিয়ে গেল। যে দেশকেই তারা ছেড়েছে, তা এমনভাবে বিভক্ত করে গেছে, যাতে সেখানকার বাসিন্দারা চিরস্থায়ীভাবে একে অপরের আজন্ম শত্রু হয়ে থাকে। সে দেশে যেন কোনোভাবেই শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। ফলাফল হয়েছে, সে সকল দেশ আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে মজবুত ও সুসংহত হতে পারেনি। যেমন ইরাকে শিয়া-সুন্নী, আরব-কুর্দী, মরক্কোয় আরব-বার্বার, মিসরে মুসলমান-কিবতী, সুইডেনে মুসলমান-খৃষ্টান, মালীতে আরব-আফ্রিকা, স্বয়ং ভারত উপমহাদেশে হিন্দুস্তানী-পাকিস্তানী ও পাকিস্তানী-বাংলাদেশী নামে দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। কোথাও সর্বসাধারণের পর্যায়ে, কোথাও বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। প্রতিটি শিবির স্বীয় প্রতিপক্ষের মুখোমুখি। রুয়ান্ডা ও কংগোতে

---

৬। মাসিক আল হজ্জ ওয়াল উমরাহ পত্রিকা (প্রবন্ধ)-হাসান-হানাফী রবিউস সানী ১৪২৩ হি. মুতাবিক জুন-জুলাই ২০০২ খৃ. সংখ্যা।

ধর্মীয় মতানৈক্য ও ভাষাগত বিভেদের ভিত্তিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং লাখো মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়।[৭] আরব দেশেও চরম মতভেদ ও মতবিরোধ দেখা দেয়। মিসর ও সুইডেনের মাঝে হালাবীব ও শালাতীন অঞ্চলকে ঘিরে বিরাট গোলযোগ সৃষ্টি হয়। আলজেরিয়া ও মরক্কোর মাঝে তুনফুট মরুভূমি বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সৌদি আরব ও ইয়ামেনের মাঝে আসীর ও নাজরান অঞ্চলের কারণে বিভেদের সৃষ্টি হয়। সংযুক্ত আরব আমিরাত বুরেমী মরুভূমির কারণে পরস্পর মুখোমুখি হয়। সিরিয়া ও জর্দান হাম্মাহ উপত্যকার কারণে একে অপরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। আরব দেশে যেখানে ভৌগোলিক সীমারেখা বিভেদের কারণ ছিল, সেখানে বংশ ও গোত্রীয় বুনিয়াদের ওপর বিরাজমান মতবিরোধও আরব রাষ্ট্রের অভ্যন্তর কুরে কুরে খাচ্ছিল। লেবাননে তো অনৈক্যের কারণে গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ এই গৃহযুদ্ধের শিকারে পরিণত হয়েছিল। জর্দানে শহরবাসী গ্রামবাসীদের মাঝে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল।[৮]

ইসলামী বিশ্ব যে অনৈক্য ও অস্থিরতার শিকার হয়েছে তাও মূলত পশ্চিমাদের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার ফলাফল। পশ্চিমা দুনিয়া ইসলামী বিশ্বের পারস্পরিক অনৈক্য উসকে দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেনি, বরং আরব জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে ইসলামী বিশ্বের দ্বীনী, ধর্মীয়, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ওপরও আঘাত হেনেছে, অথচ বিশ্বায়নের সফলতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের উপাদান ও শেকড় খতম করে দেওয়া। কিন্তু উল্টো আরব বিশ্বের মাঝে শুধু অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদের স্লোগান উঠানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত অনৈক্য ও মতবিরোধের কারণে ইসলামী বিশ্ব কোন স্বতন্ত্র ব্লক সৃষ্টি করা বা পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি প্রদর্শন করার যোগ্য থাকেনি।

সুতরাং নিকট অতীতে যদি পশ্চিমা জগতের কোন প্রতিপক্ষ থেকে থাকে তাহলে তা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, যাকে বিশ্বায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ও প্রতিবন্ধক মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেই সাম্রাজ্যবাদ যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তা একই শতাব্দীর শেষ দশকে এসে পুনরায় জীবন্ত হয়ে যায়। এবারে সাম্রাজ্যবাদের কার্যসীমা পূর্বের চেয়ে আরো বেশী বিস্তৃত ও ব্যাপক। এবারের

---

[৭] । মা-ল আওলামাহ: হাসান হানাফীকৃত পৃ: ২০ দারুল ফিকর, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০ ইং।
[৮] । প্রাগুক্ত

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা জৈবিক তাড়নার বিপথগামিতা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা, পরিকল্পিত অন্যায়-অপরাধ ও কট্টর পন্থা সাথে করে নিয়ে এসেছে। এই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্বের সাথে সাথেই আন্তর্জাতিজ পরিমন্ডলে খুব দ্রুত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথেই পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মূল হয়ে যায়, বিশ্ব অর্থনীতিকে দখল করার জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে' উন্নতশীল দেশগুলোর একটি সংগঠন তৈরি হয়। এই সংগঠন জি-৮ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আমেরিকার নেতৃত্বে গোটা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ওপর ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ, বিশেষ করে জাতিসংঘকে স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার খাতিরে অপহরণ করা হয়।[৯]

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, সাম্রাজ্যবাদ যে কোনো পরিমন্ডলে ও যে কোনো আকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে তার বুনিয়াদ হঠকারিতা ও দেশান্ধতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। গ্লোবালাইজেশনও (যা সাম্রাজ্যবাদের নতুন সংস্করণ) এই দুই মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য দুনিয়ায় তাবৎ সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মূল করে একক সভ্যতা-সংস্কৃতি গোটা দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যা দেশান্ধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

অত:পর গোটা দুনিয়ার ওপর শুধু পশ্চিমা তাহযীব-তামাদ্দুনকে চাপিয়ে দেওয়া ও তার প্রচার-প্রসার করা হঠকারিতার চরমতম নির্দশন। এজন্য বলা হয়, সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়াকে লুণ্ঠন করেছে। যে সকল দেশ স্বাধীনতার মুক্ত পরিবেশে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে সেগুলো যেন শেষ নি:শ্বাস নিচ্ছে। একটি অমানিশার রাত, যার দীর্ঘতার কোন সীমারেখা নেই; তা আবার শুরু হতে যাচ্ছে। স্বাধীনতার নামে গোলামী যুগের আবার সূচনা হতে যাচ্ছে। এই যুগ হয়তো বা শারীরিক গোলামীর যুগ হবে না কিন্তু চিন্তাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মস্তিস্কগতভাবে গোলামীর জিঞ্জিরে গোটা দুনিয়া আবদ্ধ হয়ে যাবে। আরবী খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিক হাসান যিয়াত-এর ভাষায় "শারীরিক গোলামীর জিঞ্জির হতে মুক্ত হওয়া তো সহজ কিন্তু চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক গোলামী এমনই এক রোগ, যার ঔষুধ কোন ডাক্তারের কাছে নেই, বরং তা জাতির মৃত্যু দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়।[১০]

---

[৯]। মা-আল-আওলামাহ-হাসানা হানাফী প্রণীত, পৃঃ-১১৮।
[১০]। তারীখুল-আদম-হাসান যিয়াত প্রণীত, পৃঃ ৪।

## ইসলাম হঠকারিতা, দেশান্ধতা ও গোড়ামি হতে পবিত্র

ইসলামের ওপর সর্বদা অপবাদ আরোপ করা হয়, ইসলাম শক্তির বলে ও জোরপূর্বক তার সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাহযীব-তামাদ্দুন দুনিয়াবাসীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। অন্য ভাষায় 'ইসলাম তলোয়ারের বলে প্রসার লাভ করেছে', অথচ ইসলামী শিক্ষা ও ইতিহাস নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়নকারীরা ভাল করেই জানেন ইসলাম হঠকারিতা ও গোড়ামির মত অনৈতিক মূল্যবোধ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। ইসলামই একমাত্র জীবনবিধান যা "অনারবদের ওপর আরবদের কোন নেতৃত্ব ও প্রাধান্য নেই"-এর মত শ্লোগান তুলে উক্ত নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য চিরতরে নির্মূল করে দিয়েছে। আরববাসী যারা ইসলামের সর্বপ্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি, তারা উল্লিখিত গুণাবলী দ্বারা বিরাট প্রভাবিত ছিল। বংশ ও গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য তাদের শিরা-উপশিরায় মিশে গিয়েছিল। খান্দানী মর্যাদাবোধ, ধর্ম ও গোত্রীয় মর্যাদাবোধ তাদের ধর্ম ছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর সেই আরববাসী যারা জাহেলী গোড়ামির শিকার ছিল তারা ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের জীবন্ত উদাহরণে পরিণত হলো। সেই বিলাল হাবশী যিনি গতকাল পর্যন্ত আরবদের ক্রীতদাস ছিলেন, ইসলাম গ্রহণের পর আরবদের সম্মানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। এজন্য নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ইসলাম হঠকারিতা, দেশান্ধতা ও গোড়ামি হতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। অতএব, পৃথিবীর বুকে ইসলামের প্রসারকে সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বলা আদৌ উচিত নয়। এতো ছিল ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য্য যা দ্বারা ইসলাম লোকদেরকে প্রভাবিত করেছে। মুসলমানদের কাছে ছিল উন্নত চরিত্র যা লোকদেরকে আকর্ষণ করেছে। ছিল তাদের কাছে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যের সেই শিক্ষা, যা সমাজের অবহেলিত ও লাঞ্ছিত মানুষের জন্য হেদায়েতের প্রদীপ হলো। আর এমনিভাবেই ইসলাম আরব ভূখন্ড অতিক্রম করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ইসলাম বিস্তারে ও প্রসারে তলোয়ার, তীর, গোড়ামি সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার কোনই প্রভাব ও ভূমিকা নেই। ইতিহাস পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলমানরা সর্বদা গোড়ামি, হঠকারিতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা হতে মুক্ত হয়ে প্রশস্ত হৃদয় ও মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তারা অন্যদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছে এবং অন্যদের জ্ঞান ও শিক্ষার মর্যাদা দিয়েছে। শুধু এতটুকু মেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে, মুসলমানরাই একমাত্র গ্রীক দর্শনকে মর্যাদা ও সম্মান দান করেছে, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য দান করেছে এবং তাদেরকে বিশাল বিশাল উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছে।

সক্রেটিসকে আহকামুল বাশার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, প্লেটোকে ছাহেবুল আয়দী ওয়াননূর শক্তি ও আলোর আধার, এরিস্টটলকে মুআল্লিমে আওয়াল বা প্রথম শিক্ষক, ফারাবীকে মুআল্লিমে ছানী বা দ্বিতীয় শিক্ষক, টলেমীকে ছাহেবুল কিতাবিল মুছাল্লাছ (তৃতীয় গ্রন্থ প্রণেতা), হাসান বিন হুসাইনকে দ্বিতীয় টলেমী ও জালিনুসকে' কাবেলুল মাতাকাদ্দিমীন ওয়াল মুতাআখখিরীন'- এর মত বিশাল বিশাল লকব ও উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছে। শুধু তাই নয়, মুসলমানরা গ্রীক শিক্ষার মধ্যে বিদ্যমান ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করেছে এবং সেসব বিদ্যা ও জ্ঞান আরবীতে অনুবাদ করেছে। ঠিক এরূপ আচরণ রোমকদের সাথেও মুসলমানরা করেছে। যখন তাদের নিকট হোর্সেস-এর গ্রন্থ তারিখুল আলম সম্পন্ন হলো তখন তাতে মুসলমানরা বনী আব্বাসীয় খলীফাদের ইতিহাস নামক (বিশ্ব ইতিহাস) একটি অধ্যায় সংযোজন ও বৃদ্ধি করল। এ রকমই ছিল ভিন্ন জাতির প্রতি মুসলমানদের সৌজন্য ও সম্মানের চেতনা। তারা আবু রায়হান আলবিরুনীকে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর একটি দীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করার জন্য উৎসাহিত করেছে। তার এই গ্রন্থ জ্ঞানের ভান্ডার ও ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের ওপর লিখিত গ্রন্থসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ। অতএব, এ কথা বলা ভিত্তিহীন অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।[১১]

## বিশ্বায়ন একটি তিক্ত সত্য

মোটকথা, আমাদের এখন স্বীকার করতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ কয়েক দশকের নীরবতার পর বিশ্বায়নের আকৃতিতে আবার লুণ্ঠন শুরু করেছে এবং তার ক্ষেত্র তৈরি ও রাস্তা পরিস্কার করার জন্য সকল উপায়-উপকরণ কাজে লাগাচ্ছে। আজ আমরা বিশ্ব প্রেক্ষাপটে যা কিছু দেখছি, তা একটি বিরাট পরিবর্তন। উন্নতি তার শীর্ষ চূড়ায় পোঁছে গেছে। মানুষ ও টেকনোলজি একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। তথ্যের ময়দানে বিপ্লব ও পরিবর্তনের কারণে গোটা দুনিয়া এক পল্লীতে পরিণত হয়ে গেছে। পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব আজ অর্থহীন হয়ে গেছে। হাজার মাইল দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তি এখন শুধু দেখা আর শ্রবণের ওপরই শক্তি রাখে না বরং স্পর্শ ও অনুভব করার ওপরও শক্তি এসে গেছে। এই বিস্ময়কর উন্নতি-অগ্রগতি ভৌগোলিক সীমারেখা খতম করে দিয়েছে, যা বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

---

[১১]। মাসিক আল উমরাহ পত্রিকা (প্রবন্ধ), হাসান হানাফী সংখ্যা-রবিউস সানী ১৪২৩ হি.

অতএব, একথা বলা নিশ্চয় ঠিক হবে, বর্তমান যুগের সেই উন্নতি, অগ্রগতি যা তথ্যের ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্ক রাখে তা গ্লোবালাইজেশনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং এটাই বিশ্বায়নের জন্য ক্ষেত্র ও ময়দান তৈরি করছে। এজন্য গ্লোবালাইজেশন কাল পর্যন্ত একটি মতবাদ ছিল কিন্তু আজ একটি বাস্তবতা, বরং তিক্ত সত্যতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে গ্লোবালাইজেশন বাস্তবায়িত হয়নি, বরং এই ব্যবস্থার মাত্র চল্লিশ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। আর সামগ্রিকভাবে এটি এখানে অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং মতামত ও সমালোচনার কাল অতিক্রম করছে। কিন্তু আমাদের সচেতন থাকতে হবে, পাশ্চাত্য জগত পুনরায় গোটা দুনিয়ার ওপর শাসন ও কর্তৃত্ব চালানোর নেশায় অন্ধ হয়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের চাদর পরে এবং সাম্রাজ্যবাদের পতাকা হাতে নিয়ে পশ্চিমা জগত প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের অগ্রসরতার ক্ষিপ্রতা দেখে মনে হচ্ছে সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন জল-স্থল তথা তাবৎ দুনিয়ার প্রতিটি কণা পশ্চিমা রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে যাবে। কিন্তু বিরাট একটি গোষ্ঠী এমনও আছে যাদের মস্তিষ্কে এ জিজ্ঞাসা অবশ্যই উঁকি মারবে, যদি বিশ্বায়ন এতই ভয়াবহ হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত তা কি জিনিস? বিশ্বায়ন কাকে বলে? এবং কিভাবে তা গোটা প্রাচ্যকে পশ্চিমা রঙ্গে রঙ্গিন করে দেবে?

গ্লোবালাইজেশন বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত, এই পরিভাষা যদিও নতুন কিন্তু এই পরিভাষার অর্থ অনেক পুরাতন। বিশ্বায়নকে আরবীতে 'আল-আওলামা' বলে। কেউ কেউ প্রাথমিক পর্যায়ে 'আল-কাওনিয়া' ও 'আল-কাওকাবাহ' শব্দ ব্যবহারেরও প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু কায়রোর 'মাজমাউল লুগাহ আল আরাবিয়াহ' বিশ্বায়নের আরবী আল আওলামা ব্যবহারেরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে।[১২] ইংরেজীতে এটিকে গ্লোবালাইজেশন বলা হয়, অর্থ কোন বিষয়কে ব্যাপক করা এবং তার সীমারেখা বিস্তৃত করা। এই শব্দের ব্যবহার সর্বপ্রথম আমেরিকায় শুরু হয়। Webster- এর নিউ কলেজিয়েট ডিকশনারীতে (New Collegiate Dictionary) গ্লোবালাইজেশনের অর্থ এভাবে দেওয়া আছে-কোন বিষয়কে আন্তর্জাতিকতার পোশাক পরানো, কোন বস্তুর সীমারেখা আন্তর্জাতিক বানানো।[১৩] ফরাসী ভাষায় এটিকে মোন্ডিয়ালাইজেশন বলে, যার অর্থ কোন বস্তুকে আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে বানানো। কিছু চিন্তাবিদ গ্লোবালাইজেশনকে নতুন বিশ্ব

[১২]। মাসিক আল-হেলাল (প্রবন্ধ), ড. মাহমুদ ফাহমী হিজাযী (কায়রো), সংখ্যা-মার্চ ২০০১, ড. সালেহ রাকাব প্রণীত-আল-আওলামাহ (পৃ. ৩)-এর সৌজন্যে।

[১৩]। New Collegiate Dictionary (1991). P. 521.

ব্যবস্থা নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জর্জ বুশ তার ভাষণে সর্বপ্রথম এই পরিভাষার ব্যবহার করেন।

উপসাগরীয় যুদ্ধ পরিসমাপ্তির এক মাস পর ১৯৯০-এর আগস্টে উপসাগরে অবস্থিত মার্কিন সামরিক বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে এক বক্তৃতাকালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জর্জ বুশ এমন এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা কায়েম করার কথা বলেছিলেন, যা সন্ত্রাসমুক্ত হবে, বিশ্ব মানবতাকে শান্তি নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীকে শান্তি ও সচ্ছলতার সাথে জীবন যাপন করার সুযোগ প্রদান করবে।[১৪] নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার পরিভাষা দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এই বিশ্ব ব্যবস্থার শুরু রাজনীতির সাথে, অথচ এই আন্দোলন শুধু রাজনীতির সাথেই নয়, বরং অর্থনীতি, সমাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষার সাথেও সম্পর্কিত। এ পরিভাষা ব্যাপক অর্থে গোটা দুনিয়ার ওপর সকল দিক দিয়ে আধিপত্য কায়েম করার ইঙ্গিত বহন করে। সূচনাপর্বে গ্লোবালাইজেশন বিশ্ব অর্থনীতির একটি আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু এখন অর্থনীতির গন্ডি হতে বের হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেছে, এমন কি পরিস্থিতি এখন এ পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, বিশ্ববাজারে পণ্যসামগ্রীর বাণিজ্যের সাথে সাথে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগসমূহের ওপরও গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব প্রতীয়মান হচ্ছে।[১৫]

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের ভাষায় 'বিশ্বায়ন শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, বরং তা পরিবেশ-পরিস্থিতি, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য চিকিৎসার মত বিষয়ের সাথেও সম্পর্ক রাখে।"[১৬] এই বিশ্ব ব্যবস্থা পাশ্চাত্যে, বিশেষ করে জায়নবাদী শক্তির মাধ্যমে মানব সমাজের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করার একটি মাধ্যম ও উপায়। বিভিন্ন মানব সভ্যতাকে নির্মূল করার একটি আন্দোলন। তাবৎ দুনিয়ার নানা সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পশ্চিমা তথা আমেরিকার সভ্যতা-সংস্কৃতির রঙ্গে রঙ্গিন করার অন্যতম বিশেষ হাতিয়ার এবং গোটা বিশ্বের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করার এক ইহুদীবাদী স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

---

[১৪]। মুখাতিরুল আওলামাহ আলাল মুজতামাআতুল আরাবিয়াহ (প্রবন্ধ), ড. মোস্তাফা রজব, মাসিক আল বায়ান, ২০০০।

[১৫]। আনহিয়ারু মাযায়মিল আওলামাহ, ড. ইজ্জত আস-সায়্যিদ আহমদ প্রণীত, পৃ.৫।

[১৬]। আল-আওলামাহ ড. সালেহ আর-রাকাব প্রণীত, পৃ. ৪।

## গ্লোবালাইজেশনের ইতিবাচক সংজ্ঞা

গ্লোবালাইজেশনের অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু ইতিবাচক আর কিছু নেতিবাচক। বিশ্বায়নের মধ্যে যেমনিভাবে প্রাচ্য জাতি তথা মুসলমানদের ব্যাপারে কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে। পশ্চিমা চিন্তাবিদ যারা গ্লোবালাইজেশনের জোরালো প্রবক্তা এবং কিছু আরব চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী যারা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ করেন, তাদের পূর্ণ চেষ্টা এই যে, কিভাবে এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকে দুনিয়াবাসীর সামনে সুন্দর, চিত্তাকর্ষক, আকর্ষনীয় ও লোকদের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে উদাসীন।

অপরদিকে অধিকাংশ চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী গ্লোবালাইজেশনের নেতিবাচক দিকসমূহ সামনে রেখে এর সংজ্ঞা প্রদান করেন। আমরা নিম্নে গ্লোবালাইজেশনের কিছু ইতিবাচক সংজ্ঞা পেশ করছিঃ

১. বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন' তথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিশ্বায়নের সংজ্ঞা অনেকটা এভাবে করে "বিশ্বায়ন বিশ্বের সকল দেশের মাঝে সেই অর্থনৈতিক সহযোগিতার নাম, যা প্রোডাক্ট ও সার্ভিসেস (পণ্য ও সেবা)-এর বিনিময় বৃদ্ধির কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এর ফলে সে সকল দেশের পুঁজি ও মূলধনেও প্রবৃদ্ধি হয়। সেই সাথে বিশ্বের প্রতিটি কোণে অতিদ্রুত টেকনোলজির বিকাশ হয়। এটি এমনই এক আন্দোলন যার উদ্দেশ্য কাস্টম ও ভৌগোলিক সীমারেখা তুলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে এক ও অভিন্ন বাজারে পরিণত করা।"[১৭]

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে কাস্টম আইন চালু আছে, যা সাধারণত বাণিজ্যসামগ্রীর ওপর প্রযোজ্য। এই আইনের কারণে এক দেশ হতে অন্য দেশে ব্যবসার পণ্য-সামগ্রী স্থানান্তরিত করতে সেই দেশকে ট্যাক্স দিতে হয়, যে দেশে বাণিজ্যের জন্য উক্ত পণ্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই ট্যাক্স পণ্যের আসল দামের কয়েক শ' গুণ হয়ে থাকে। অনেক দেশে তো কাস্টমের এই ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সে দেশের মেরুদন্ড সমতুল্য। আজ যখন গ্লোবালাইজেশনের উদ্দেশ্য এই যে, এক দেশের পণ্যসামগ্রী সব স্থানে পাওয়া যাবে, তখন আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানী যারা নিজেদের পণ্যসামগ্রী সকল দেশে বিপণন করতে চায় তাদের জন্য ট্যাক্স সিস্টেম সবচেয়ে বড় বাধা ও প্রতিবন্ধকতা। এই সিস্টেমের

---

[১৭]। পাক্ষিক আর-রায়েদ, লক্ষ্নৌ সংখ্যা যিলহজ্জ-১৪১৯ হি. (প্রবন্ধ) আল-আওলামাহ ওয়া তাছীরুহা-আলাল আলম-আল-ইসলামী। প্রবন্ধকার মানে' হাম্মাদ আল-জুহানী।

কারণে তারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে অক্ষম। কেননা তাদের স্বীয় পণ্যসামগ্রী অন্য দেশে এক্সপোর্ট বা রফতানী করার জন্য বিরাট অংকের ট্যাক্স পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা এ ধরনের দেশের নিকট এই দাবী করে যে, তারা কাস্টম ডিউটির এই সিস্টেমকে খতম করে দেবে (এখন তো অনেক দেশে এই সিস্টেম খতম করে দেওয়া হয়েছে অথবা ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া হয়েছে) যাতে বিদেশী, বিশেষ করে আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান কোম্পানী স্বাধীনভাবে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে।

যদি গ্লোবালাইজেশনের উদ্দেশ্য এই হয়, তাহলে বাহ্যিকভাবে এতে কোন ক্ষতি দৃষ্টিগোচর হয় না, বরং এ দ্বারা আরো অনুমিত হয়, গ্লোবালাইজেশনের উদ্দেশ্য হলো এক দেশের কোম্পানীর পণ্যসামগ্রী দ্বারা অন্য দেশের জনগণকে উপকৃত করা, যাতে যে কোন ধরণের সুযোগ-সুবিধা এক দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং প্রত্যেক ভোক্তা যাতে সর্বনিু মূল্যের মাধ্যমে হলেও তা পেতে পারে। কিন্তু যদি চিন্তা করা হয়, ইউরোপীয় ও আমেরিকান কোম্পানীর মালামাল এশিয়া ও অনুন্নয়নশীল বাজারগুলো ছেয়ে ফেলবে তখন স্থানীয় ও আঞ্চলিক কোম্পানী তাদের সামনে টিকতে পারবে না এবং বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় তারা পেছনে পড়ে যাবে। তখন আমাদের সামনে ভিন্ন একটি চিত্র ভেসে উঠে। সুতরাং সে সকল দেশ কোন ধরনের ট্যাক্স না পাওয়ার ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানীর দয়ার পাত্রে পরিণত হবে এবং রাষ্ট্রসমূহ স্বীয় দেশ পরিচালনার জন্য হয়তো বহুজাতিক কোম্পানীগুলো হতে ঋণ গ্রহণ করবে কিংবা বিশ্বব্যাংকের সামনে হস্ত প্রসারিত করবে। উভয় অবস্থায় সে দেশ পশ্চিমা তথা ইহুদীদের আয়ত্তাধীনে এসে যাবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাদের অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত হবে। এভাবেই সে সকল দেশ পশ্চিমা তথা যায়নবাদী শক্তির সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। সাথে সাথে সে সকল দেশের বাজারে যেহেতু বিদেশী কোম্পানীর ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হবে সেহেতু জনসাধারণের কষ্টের উপার্জন অন্য দেশে বসে থাকা কোম্পানীর মালিকদের পকেটে চলে যাবে। সে দেশের সম্পদ তার উন্নতি-অগ্রগতির কাজে ব্যয় হওয়ার পরিবর্তে তার ধ্বংসের কারণ হবে।

২। আমেরিকার রাজনীতিবিদ জেমস রাওযানো গ্লোবালাইজেশনের সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করেন– গ্লোবালাইজেশন অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও আইডিওলজি তথা মতাদর্শ পরিবর্তনের একটি পন্থা, যে পন্থায় চলার পর শিল্প ও

পণ্যদ্রব্য এক দেশে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হতে পারে এবং মানুষের ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে অভিন্নতা আসতে পারে।[১৮]

৩। প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক উইলিয়াম গ্রেডার ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত 'একক বিশ্ব: মানতে প্রস্তুত আছে কি না' শীর্ষক স্বীয় গ্রন্থে গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে লেখেন, এই গ্লোবালাইজেশন আন্তর্জাতিক শিল্প ও বিশ্ব বাণিজ্যে সৃষ্ট বিপ্লবের ফলে বাস্তব রূপ লাভ করা একটি কর্মপদ্ধতি। এই কর্মপদ্ধতি উন্নয়ন ও ধ্বংস দু'টির ওপরই একই ধরনের শক্তি ও সামর্থ্য রাখে এবং আন্তর্জাতিক সীমানা উপেক্ষা করে স্বীয় লক্ষ্য ও পথে ধাবমান হয়ে থাকে। এটি যত বড় উন্নতির কারণ তত বড় ভয়ংকরও।[১৯]

৪। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও টেকনোলজির ক্ষেত্রে হওয়া বিস্ময়কর আবিস্কার। এই আন্দোলন বিশ্বের কোন ব্যবস্থা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমারেখার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।[২০]

৫। গ্লোবালাইজেশন আন্ত:দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রোডাক্ট ও সার্ভিসেস তথ্য পণ্য ও সেবার কাজকর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ভান্ডার প্রসারের নাম।[২১]

৬। বিশ্বায়ন দাবী করে, দেশ ও জাতি গোষ্ঠীর সাথে বিদ্যমান অনৈক্য ও বিরোধ বিদূরিত হোক। মানব সমাজ অনৈক্য ও মতানৈক্যের শিকার না হোক, বরং নানা রাস্তায় চলার পরিবর্তে একই রাস্তায় ধাবিত হোক। স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্নতারপরিবর্তে সমাঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করুক এবং গোটা বিশ্ব একই মূল্যবোধ গ্রহণ করুক।[২২]

৭। বিশ্ববাণিজ্য ইনসাইক্লোপিডিয়া (The International Encyclopdia of Business and Management) গ্লোবালাইজেশনের সংজ্ঞা লিখেছে, বিশ্বসভ্যতার প্রসার এবং তা ব্যাপকতা দান করার একটি পথ নির্দেশক বা রোড ম্যাপ।[২৩]

৮। "আলী হারব" বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দেন এভাবে "বিশ্বায়ন একটি সাংস্কৃতিক উৎসবের নাম, যার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় সংগঠিত

---

[১৮]। আল-আওলামাহ, ড. সালেহ আর-রাকাব প্রণীত পৃ: ৫, নাঈমা শোমান প্রণীত আল -আউলামাহ বাইনান নাযমিত তেকনোলোজিয়া আল হাদীসাহ এর সৌজন্যে।

[১৯]। প্রাগুক্ত।

[২০]। প্রাগুক্ত।

[২১]। প্রাগুক্ত।

[২২]। আল মুস্তাকবিলুল আরাবী ড. আহমদ মোস্তফা ওমর প্রণীত, পৃ. ৭২ মাসিক আল ইসলাম ওয়াল ওয়াতেন সংখ্যা-১৩৮-এর সৌজন্যে।

[২৩]। (The International Encyclopdia of Business and Management- 1996. P 1649.

হয় এবং খুব সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধ্যান-ধারনা, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ও ধন-সম্পদ স্থানান্তরিত হয়ে যায়।"[২৪]

উল্লিখিত সকল সংজ্ঞার সার কথা এই যে, গ্লোবালাইজেশন এমন একটি আন্দোলন যা অর্থনৈতিক ময়দানে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবক্তা এবং ভৌগোলিক সীমারেখার স্বীকৃতি না দিয়ে যে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বের যে কোন দেশে ব্যবসা করার অনুমতি দেয়। রাজনৈতিক ময়দানে গ্লোবালাইজেশন যে কোন দেশে সেখানকার আঞ্চলিক শাসন এবং সে দেশের সীমান্ত স্বীকার করে না, বরং তাকে এক প্রত্যাশিত ও সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ও শাসনের অধীন বলে স্বীকার করে। সভ্যতা, সংস্কৃতির ময়দানে গ্লোবালাইজেশন গোটা বিশ্বে একই সভ্যতা সংস্কৃতি এবং একই তাহযীব-তামাদ্দুন বাস্তবায়ন করতে চায়। গ্লোবালাইজেশন শ্রেণী নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি মিশন। গোটা মানবতাকে এক ও অভিন্ন সুতায় গ্রথিত করার এক প্রয়াস এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মানুষের মাঝে বিদ্যমান যে কোন স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য নির্মূল করার একটি পদক্ষেপ। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ইনফরমেশন টেকনোলজির ময়দানে ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রগতি। যেমন ইন্টারনেট, টিভি, রেডিও ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্যপূজারী চিন্তাবিদদের পক্ষ হতে দেওয়া এ সকল সংজ্ঞায় কেউই স্পষ্ট করে স্বীকার করে না যে, অর্থনৈতিক ময়দানে যাদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার অর্জিত হবে তারা কোথাকার বাসিন্দা হবে? যে বিশ্বরাষ্ট্রের রঙ্গীন স্বপ্ন দেখা হচ্ছে তার সুপ্রিম বা প্রধান ব্যক্তি কে হবেন? গণতন্ত্রকে দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ধারণাকারীরা এই বিশ্বরাষ্ট্রের মধ্যে কিভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে? যে সভ্যতা-সংস্কৃতি গোটা দুনিয়ায় বাস্তবায়ন করা হবে, তা কোন অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতি হবে? কিসের ভিত্তিতে এই তাহযীব-তামাদ্দুনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে। যে সভ্যতাকে বিশ্বজনীনতা দান করা হবে কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তার এই অধিকার অর্জিত হবে যে, সেটি আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন সভ্যতায় পরিণত হবে। তা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না বস্তুবাদী ও জড়বাদী মস্তিস্কের ভাষ্যকার হবে। গ্লোবালাইজেশনকে জোরপূর্বক বাস্তবায়ন করা হবে না এতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইচ্ছা ও সন্তোষের অবস্থান থাকবে। পাশ্চাত্যের ঠিকাদাররা যে বিশ্বায়নকে সাম্য প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম ও উপায় মনে করে তা বাস্তবিকই সাম্য প্রতিষ্ঠিত করবে, না শ্রেণী বৈষম্যকে আরো বেশী গভীর ও গাঢ় করবে। বিভিন্ন

---

২৪ । সাদমাতুল আওলামাহ ফী খিত্তাবিন নুখবাহ (প্রবন্ধ) আলী হরব। মাসিক আস সাফীর সংখ্যা ৮০১২- ১৯৯৮ ইং।

শ্রেণীর মাঝে তারা যে সেতু নির্মাণ করতে চায়, বিশ্বায়ন কি এই সেতু নির্মাণ করবে, না নির্মিত সেতুকে আরো ধ্বংস ও নি:শ্চিহ্ন করে দেবে।

এগুলো এমন কিছু প্রশ্ন, যার উত্তর দান করা থেকে পশ্চিমা চিন্তাবিদরা বিরত থাকেন। কারণ তারা সময়ের পূর্বে বিশ্বায়নের স্বরূপ ও বাস্তব অবস্থা উন্মোচন করতে চান না। কিন্তু ইসলামী বিশ্বের সচেতন চিন্তাবিদ কলম সৈনিকগণ ও বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীর সঠিক চিন্তাধারার অধিকারী বুদ্ধিজীবিগণ গ্লোবালাইজেশনের সংজ্ঞায় এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছেন এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বিশ্বায়নের স্বরূপ ও বাস্তব অবস্থা স্পষ্ট করেছেন।

## গ্লোবালাইজেশনের নেতিবাচক সংজ্ঞা

১। ড. তুর্কী আল হামদ বলেন, গ্লোবালাইজেশন পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার শুধু উন্নতি ও অগ্রগতির কর্ম পদ্ধতিই নয়, বরং তা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও মেনে নেওয়ার একটি সার্বজনীন দাওয়াতের নাম। এটি গোটা দুনিয়ার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাকে পরোক্ষভাবে অস্তিত্ব দানের একটি মাধ্যম বা উপায়। সংক্ষেপে ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং প্রতিটি ভাল ও উপকারী বস্তুকে নির্মূল করার নাম বিশ্বায়ন।[২৫]

২। ড. তুর্কী সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নকে আলাদাভাবে উল্লেখ করে লিখেছেন, "আর সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারে, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন হলো, বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাহযীব-তামাদ্দুনকে লুণ্ঠন ও নির্মূল করে পশ্চিমা তাহযীব-তামাদ্দুনকে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার নাম।[২৬]

৩। ড. মোস্তফা আন নাশশার বলেন, বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য কখনই বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে একে অপরের নিকটবর্তী করা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য সকল আঞ্চলিক ও জাতীয় তাহযীব-তামাদ্দুনকে বিলুপ্ত করে তাবৎ দুনিয়াকে আমেরিকার রঙ্গে রঙ্গিন করা।[২৭]

৪। ড. আব্দুল ওয়াহাব আল মুসীরী বলেন, বিশ্বায়ন পাশ্চাত্যের উজ্জ্বল চিন্তা ধারার দাওয়াত ও আন্দোলনের নাম, যার উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক ও মানবীয় বৈশিষ্ট্য চিরনির্মূল করা।[২৮]

---

[২৫]। দৈনিক আল খালীজ (আরবী)।

[২৬]। প্রাগুক্ত।

[২৭]। মাসিক আল-মুনতাদা সংখ্যা সংখ্যা-১৯৩ আগস্ট ১৯৯৯।

[২৮]। মাসিক আল মুস্তাকবিল সংখ্যা-১৩০ মে-২০০২ইং।

৫। ড. মোস্তাফা মাহমুদ বলেন, গ্লোবালাইজেশন কোন দেশের দেশাত্মবোধ ও কোন কোন জাতির জাতীয়তাবোধ খতম করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। বিশ্বায়ন যে কোন জাতির ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্মূল করার প্রবক্তা, যাতে সে জাতি বড় শক্তির নগণ্য খাদেমে পরিণত হয়।[২৯]

৬। গ্লোবালাইজেশন এমন কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং জীবনের চাল-চলন, রীতিনীতি ও আচার-আনুষ্ঠানের অবকাঠামোর নাম যাকে গোটা দুনিয়ার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং লোকদেরকে তার চিত্রিত সীমারেখার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হবে।[৩০]

৭। গ্লোবালাইজেশন আমেরিকান সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সেখানকার জীবন পদ্ধতি গোটা দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াসের নাম। এটি এমনই এক মতবাদ যা সমগ্র বিশ্বের ওপর পরোক্ষভাবে ক্ষমতা ও আধিপত্যের অবিকল প্রতিচ্ছবি।[৩১]

৮। বিশ্বায়ন বস্তুবাদী দর্শন ও তৎসংশ্লিষ্ট নীতি-মূল্যবোধ, আইন-কানুন, নীতিমালা ও চিন্তা-ভাবনাকে তাবৎ দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার নাম।[৩২]

৯। গ্লোবালাইজেশন এমন একটি আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য বিভিন্ন অর্থনীতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, প্রথা-প্রচলন এবং ধর্মীয়, জাতীয় ও দেশীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে নির্মূল করে গোটা দুনিয়াকে আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ অনুযায়ী আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার গন্ডির মধ্যে নিয়ে আসে।[৩৩]

১০। ড.সাদেক জালালুল আযম গ্লোবালাইজেশনের সংজ্ঞা এভাবে করেন, গ্লোবালাইজেশন বিশ্বকে একটি কেন্দ্রীয় দেশ তথা আমেরিকার রঙ্গে রঙ্গিন করার নাম।[৩৪]

১১। অনেক চিন্তাবিদ খুব সংক্ষেপে বিশ্বায়নের সংজ্ঞা এভাবে করেছেন, গ্লোবালাইজেশনের অর্থ হলো দেশের সীমারেখা খতম করা। এই সর্বব্যাপী সংজ্ঞা সুপার শক্তিগুলোর পরিকল্পনার প্রতিনিধিত্ব এভাবে করে যে, ভবিষ্যতে প্রতিটি ধরনের সীমাবদ্ধতা ও সীমিতকরণকে চায় তার সম্পর্ক অর্থনীতির সাথে হোক

---

[২৯]। মাসিক আল-ইসলাম ওয়াল ওয়াতন সংখ্যা-১৩৮, ১৯৯৮ইং।

[৩০]। আল-আরব ওয়াল আওলামাহ ড.মুহাম্মদ আবেদন আল-জাবেরী প্রণীত, পৃঃ ১৩৭।

[৩১]। প্রাগুক্ত।

[৩২]। আল-আওলামা ওয়াল ইসলাম, মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল-মাবরুক প্রণীত, পৃঃ ১০১,কায়রো-১৯৯৯।

[৩৩]। আল-আওলামা, ড. সালেহ আর রাকাব পৃ. ৬।

[৩৪]। মা-ল আওলামাহ, হাসান হানাফী ও সাদেক জালালুল আযম প্রণীত, পৃঃ ১৩৬।

কিংবা রাজনীতির সাথে হোক, সভ্যতার সাথে হোক কিংবা সংস্কৃতির সাথে হোক, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে হোক কিংবা জীবন পদ্ধতির সাথে হোক চিরনির্মূল করা হবে এবং দুনিয়া নানা মুখী চিন্তাধারার পরিবর্তে এক মুখী চিন্তাধারায় আবদ্ধ হবে।

উল্লেখিত সকল সংজ্ঞায় যদিও শব্দের বৈপরীত্য রয়েছে কিন্তু এই বিভিন্ন শব্দ প্রকৃতপক্ষে একই অর্থ ও একই মর্মকথা বর্ণনা করে। উল্লিখিত চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের কৃত ও সকল সংজ্ঞা গ্লোবালাইজেশনের স্বরূপ ও প্রকৃত চেহারা হতে পর্দা উন্মোচন করে দেয়। পশ্চিমা যায়নবাদী শক্তিসমূহ, বিশেষ করে মার্কিন ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপর পড়ে থাকা পর্দা উন্মোচন করে দেয় এবং যে সমস্ত লোক স্বীয় হৃদয়ে ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশ ও জাতীয়তা এবং ইজ্জত-সম্মান হেফাজতের বাসনা পোষণ করে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয় যে, তাদের ক্ষুদ্রতম ভুল ও সামান্য অসর্তকতাও ইতিহাসের মর্মান্তিক ট্রাজেডি বয়ে আনতে পারে। এমন এক ট্র্যাজেডি ও দুর্ঘটনা, যখন তা প্রকাশিত হবে তখন বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীর স্বীয় অতীতের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মানুষ ভবিষ্যতের ফলাফল হতে বেখবর হয়ে বর্তমানের মায়াবী প্রতারণার মধ্যে হারিয়ে যাবে। সম্ভবত সে ট্র্যাজেডি হতেই তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার অমানিশার যুগের সূচনা হবে।

আজ নিজস্ব তাহযীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধকারীরা আগামীকাল পশ্চিমা তাহযীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা মাতোয়ারা, বরং তাতে আর্দ্র হয়ে স্বীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করবে এবং নানা রঙ্গ ও আকৃতি দ্বারা সজ্জিত আজকের মানবতা আগামীকাল অপসংস্কৃতির অমানিশা ও কৃষ্ণবর্ণে ডুবে কুৎসিত হয়ে যাবে।

## ইতিহাসের দর্পণে গ্লোবালাইজেশন

গ্লোবালাইজেশন শব্দটি যেহেতু দুর্বলের ওপর সবলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অর্থ প্রকাশ করে, সেহেতু গ্লোবালাইজেশন-এর পরিভাষাটি নতুন হলেও এর অর্থ অনেক প্রাচীন, এমন কি বলা হয়ে থাকে, ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বেই এই শব্দের সাথে বিশ্ববাসী পরিচিত ছিল। এই অবস্থা শুধু গ্লোবালাইজেশন শব্দের সাথেই নির্দিষ্ট নয়, বরং এছাড়া আরো অনেক পরিভাষা রয়েছে, সেগুলো যদিও নতুন যুগের সৃষ্টি কিন্তু তার অর্থের সাথে বিশ্ববাসী বহু শতাব্দী পূর্ব হতেই পরিচিত।

যেমন Ideology (মতবাদ) পরিভাষাটি সর্বপ্রথম ফরাসী দার্শনিক দিসটুট দেট্রাসী গ্রন্থের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতা ও প্রসারতা লাভ

করে, অথচ প্রাচীন যুগ হতেই বিভিন্ন মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল। গ্লোবালাইজেশন শব্দটিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সৃষ্ট। কিন্তু এর অর্থের সাথে প্রাচীন যুগ হতেই বিশ্ববাসী পরিচিত। আলেকজান্ডার দি গ্রেটের গোটা বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন এই চিন্তাধারারই ইঙ্গিত বহন করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত গ্লোবালাইজেশনের বাহ্যিক অর্থ হলো, প্রতিটি দেশের আয় ও উপার্জন দ্বারা একটি বিশেষ শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে লাভবান করা। এই অর্থ হিসেবে গ্লোবালাইজেশনের অস্তিত্ব আমরা আব্বাসী যুগেও পাই। প্রসিদ্ধ আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদ মেঘের একটি টুকরোকে দেখে বলেছিলেন–"হে মেঘমালা! তুমি যেখানেই বর্ষিত হও, তোমার ট্যাক্স কিন্তু আমার কাছে আসবেই।"[৩৫]

তবে আব্বাসী যুগের গ্লোবালাইজেশন আর বর্তমান যুগের গ্লোবালাইজেশনের মধ্যে পার্থক্য হলো আব্বাসী খেলাফতের সময় বিভিন্ন দেশ হতে প্রাপ্ত ট্যাক্স জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হতো। আর আজ মেহনতী মানুষের উপার্জন দ্বারা নিউ ইয়র্কের আকাশচুম্বী সুরম্য অট্টালিকায় বসে থাকা কিছু সুদখোর ইহুদী নিজেদের পকেট ভরছে। কিন্তু গবেষকদের ধারণা, গ্লোবালাইজেশনের সূচনা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হতে হয়েছে, যখন ইউরোপ বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে তার উন্নতি অগ্রগতির ধারা শুরু করে। কারণ গ্লোবালাইজেশনের মৌলিক উপাদান হলো বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে বাণিজ্য-পণ্য, মূলধন ও চিন্তাধারার বিনিময় হওয়া। সুতরাং যখন থেকে ইউরোপে উন্নতি-অগ্রগতির সূচনা হয় তখন থেকে এই মৌলিক উপাদান অস্তিত্ব লাভ করে। যদিও গত ৩০ বছরে বিশ্বায়নের এই মৌলিক উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে, অতএব নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বিশ্বায়নের অস্তিত্ব বিগত পাঁচ শতাব্দী ধরে চলে আসছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে গ্লোবালাইজেশনের অর্থের বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু হয়। যদিও গ্লোবালাইজেশনের পরিভাষা তখনও অস্তিত্বেও আসেনি। ১৮৯৭-এর জুনে সুইজারল্যান্ডের প্রসিদ্ধ শহর ব্রাসেল্স-এ বিশ্বায়নবাদীদের বিশ্ব কনফারেন্সে যায়নবাদী নেতা তিওয়ার্দ হরতাযেল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ৫০টি আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদী সংগঠনের ৩০০ ইহুদী সদস্য অংশ গ্রহণ করে। উক্ত কনফারেন্সে তারা ৫০ বছরের ভেতরে বিশ্বে যায়নবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা ও গোটা বিশ্বকে গোলাম বানানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ

---

[৩৫]। আন-হিয়ারু মাযায়িমিল আওলমাহ, ড. ইযযত সাইয়্যেদ আহমদ প্রণীত, পৃ: ৭।

করে যাকে ইহুদীবাদী শাসকদের প্রটোকল বলে।[৩৬] এই প্রটোকলগুলো পরে একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় যা উনিশটি অধ্যায় সম্বলিত। এই গ্রন্থের এগার ও উনিশতম অধ্যায়ে বিশ্ব যায়নবাদী শাসনের রূপরেখা ও চিত্র পাওয়া যায়। বারতম অধ্যায়ে মিডিয়ার ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও ষোলতম অধ্যায়ে শিক্ষার মাধ্যমে মস্তিস্ক ধোলাই করার পরিকল্পনা পাওয়া যায়।[৩৭]

এ সমস্ত প্রটোকল ইহুদী চিন্তাবিদগণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই উপদেশ দিয়েছে যে, বিশাল ইসরাইলী শাসন অন্য ভাষায় বিশ্ব যায়নবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়ার সকল বস্তুগত উপকরণ দখল করে নিতে হবে। স্বর্ণের খনিগুলোকে নিজেদের মালিকানায় নিয়ে আসতে হবে, যাতে এসব মাধ্যম দ্বারা অর্জিত সম্পদ ভবিষ্যতের যায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেয়।

মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমগুলো নিজেদের দখলে আনতে হবে, যাতে জনমত গঠন সহজ হয়। গ্লোবালাইজেশন আজ অর্থনৈতিক ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের একশ' বছর পর আজ ইহুদী প্রজন্ম স্বীয় পিতৃপুরুষদের উপদেশ বাস্তবায়ন করছে।

১৮৯৭-এ বিশ্ব যায়নবাদী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সেই অনুষ্ঠানে পাসকৃত সিদ্ধান্তাবলী আস্তে আস্তে বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেক ইহুদী ব্যক্তিই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বসে বিশাল ইসরাইলের স্বপ্ন দেখে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জনের পর রাজনৈতিক ময়দানের প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। গোটা বিশ্বের ওপর শাসন কার্য পরিচালনার জন্য এমন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল যা বিভিন্ন রাষ্ট্র হতেও শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। এজন্য ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন-এর রাজনৈতিক উপদেষ্টা কর্নেল মান্ডিল হাউস তার সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় 'লীগ অব নেশনস'-এর রূপরেখা তৈরি করেন। এই পকিল্পনা মার্কিন জাতির সামনে পেশ করার জন্য তারা উইলসনকে প্রস্তুত করে ফেলেন।[৩৮] প্রাথমিক কিছু ব্যর্থতার পর 'লীগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

---

[৩৬]। পাক্ষিক আর-রায়েদ লাক্ষ্ণৌ, প্রবন্ধ-বুরোতূকোলাতু হুকামা-ই সাহয়ুন সফর, ১৪২৪ হি. আততারবিয়াতুল ইসলামিয়া সংখ্যা-১০ এর সৌজন্যে।

[৩৭]। মাগরিবী মিডিয়া আওর উসকে আছারাত মাওঃ নযরুল হাফীজ নদভী, প্রণীত, পৃঃ ৬৮।

[৩৮]। মাগরিবী মিডিয়া, পৃঃ ৬৮।

এটি সামনে অগ্রসর হতে থাকে। লীগ অব নেশনস দ্বারা ইহুদীরা তাদের হীন সংকল্প পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এটাকে ইতিহাসের গর্ভে বিলীন করে দেয়। এর পরিবর্তে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়, যা আজ ইহুদী স্বার্থ রক্ষার জন্য তার সকল শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করছে।

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও বৃটেন (যারা এই যুদ্ধে বিজয়ী ছিল) তাদের পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে চলল। আমেরিকা বিশ্ব মানচিত্রে একটি সুপার পাওয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপের নিকট যে নেতৃত্বের মুকুট ছিল তা আমেরিকার নিকট স্থানান্তরিত হল। যায়নবাদী গোষ্ঠী তাদের বিশ্ব কনফারেন্সে বিশাল ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছে তার ব্যাখ্যা ও বাস্তব রূপ তারা আমেরিকার ভূমিতে অনুসন্ধান করল। পরিস্থিতির আনুকূল্য দেখে ইহুদীরা আমেরিকাকে গ্লোবালাইজেশনের পথে ঠেলে দিল। টুর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর কানাডীয়ান সমাজবিদ মার্শাল ম্যাক-ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম গ্লোবালাইজেশনের পরিভাষা ব্যবহার করেন। আর রাজনৈতিক পরিমন্ডলে যিনি সর্বপ্রথম এই পরিভাষা প্রযোজনা করেন তিনি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের উপদেষ্টা জেরনেস্কি। তিনি এক বক্তৃতায় বলেন, আমেরিকা বিশ্বের ৬৫ শতাংশ মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমের মালিক। আধুনিক বিশ্বের মডেল হওয়া এবং মার্কিন মূল্যবোধ, স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রচার-প্রসারের সবচেয়ে' বেশী সে দাবীদার।[৩৯] পশ্চিমাদের পলিসি সর্বদাই এই যে, তারা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী আইন-কানুন ও মতবাদ বাস্তবায়নের আগে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। মিডিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তারা এ সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সংবাদ-সাক্ষাৎকার প্রকাশ করবে যাতে জনগণ এই মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করতে বাধ্য হয়। বিশ্বায়নের ক্ষেত্রেও তাদের এই পলিসি পূর্ণমাত্রায় কার্যকর ছিল। এই আন্দোলনকে গ্রহণযোগ্য ও তার ফলাফলকে উপকারীরূপে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধারার জন্য যায়নবাদী ধ্যান-ধারণার অধিকারীদের দ্বারা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আর্টিকেল লেখানো হয়, গ্রন্থাবলী রচনা করানো হয় এবং কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

---

[৩৯]। আল-আওলামাহ, ড. সালেহ আর-রাকাব প্রণীত, পৃঃ ১।

এ ধারার সর্বপ্রথম গ্রন্থ জাপানী বংশোদ্ভুত মার্কিন নাগরিক ফ্রান্সিস ফোকোয়ামা ১৯৮৯-সালে The End of the History (ইতিহাসের পরিসমাপ্তি) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে গ্লোবালাইজেশন-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপরেখা পূর্ণ শক্তির সাথে উপস্থাপন করা হয়। পুস্তকের উদ্দেশ্য ছিল মূলত গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে সাধারণ ও বিশেষ মহলের প্রতিক্রিয়া জানা। এজন্য পুস্তকের প্রচারও সেই আঙ্গিকে করা হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিছু প্রতিক্রিয়া আসে পুস্তকে পেশকৃত মতবাদের স্বপক্ষে আর কিছু আসে মতবাদের বিপক্ষে।[৪০]

১৯৯২ সালে ফ্রান্সিস ফোকোয়ামা বিশ্বায়নের ওপর দ্বিতীয় গ্রন্থ রচনা করেন যা The End of the History and the Last Man (ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ও শেষ মানব) নামে দি ফ্রি প্রেস নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যও ছিল আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানা, যাতে বিশ্বায়নকে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করানো যায়। অত:পর মিডিয়ার মাধ্যমে জনমত গঠন করা যায়। এই গ্রন্থে লেখক ফ্রান্সিস দাবী করেন, আজ আমরা মানবেতিহাসের সিদ্ধান্তকারী ও চূড়ান্ত স্তরে পা রেখেছি। এমন এক স্তরে যা অন্যান্য সকল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের মোকাবেলায় পশ্চিমা গণতন্ত্র, উদারপন্থী ও পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার বিজয় ও সাফল্যের জন্য অস্তিত্বশীল হয়েছে। দুনিয়া এক দীর্ঘ যুগ অতিক্রম করার পর জেনে গেছে যে, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাই সুন্দর ও সর্বোত্তম অর্থ ব্যবস্থা। পশ্চিমা উদারপন্থী ব্যবস্থাই গোটা মানবতার জন্য একমাত্র জীবন পদ্ধতি। আমেরিকা ও ইউরোপ তার মজবুত ও বিস্তৃত অর্থনীতির কারণে ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্বে নেতৃত্বের সবচেয়ে' বেশী দাবীদার এবং পাশ্চাত্যের মানুষই পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর মানুষ।

ফ্রান্সিস ফোকোয়ামা এই ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা তার গ্রন্থে এজন্য উপস্থাপন করেছেন যাতে পশ্চিমা জাতি গ্লোবালাইজেশনের সমর্থক ও অনুসারী হয়ে যায়। এই আন্দোলনে তাদের সমর্থন আদায় করা যায় এবং পশ্চিমা গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে গ্লোবালাইজেশনের মতবাদ গোটা দুনিয়ার ওপর জোরপূর্বক বাস্তবায়ন করা যায়। এই গ্রন্থখানা প্রকাশিত হওয়ার পরপরই ১৯৯৩ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপত্র ও বহুল প্রচারিত 'ফরেন এ্যাফেয়ার্স' (Foreign Affairs)-এ ইহুদী চিন্তাবিদ স্যামুয়েল হান্টিংটন-এর প্রবন্ধ (The Clash of

---

[৪০]। মা-হিয়াল আওলামাহ, ড. সাদেক জালালুল আযম, পৃঃ ৭৩, বৈরুত।

civilizations?) 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধকে পরবর্তীতে শ্যামুয়েল ১৯৯৬ সালে গ্রন্থের রূপ দেয় এবং তার নামকরণ করে। (The clash of civilizations and the remaking of the world order) (সভ্যতার দ্বন্দ্ব ও বিশ্ব ব্যবস্থার পুন:নির্মাণ)-যা নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সে রকমই জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে রকম জনপ্রিয়তা ফ্রান্সিসের উভয় গ্রন্থ অর্জন করেছিল। স্যামুয়েলের প্রবন্ধ ও গ্রন্থ উভয়টিই সর্বস্তরে একটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল এবং সকল স্থান হতে প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে। স্যামুয়েল স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন, ফরেন এ্যাফেয়ার্স পত্রিকার দায়িত্বশীলরা তাকে জানায়, তার প্রবন্ধ এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে, গত ৪০ বছরে পত্রিকার কোন প্রবন্ধ এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। তার প্রবন্ধ আলোচনা-পর্যালোচনার বাজার গরম করে দিয়েছে। ৫টি মহাদেশ হতেই বিপুল সংখ্যক প্রতিক্রিয়া ও মতামত অর্জিত হওয়াও প্রমাণ করে যে, তার প্রবন্ধ ভূ-পৃষ্ঠের সকল সভ্যতার অনুসারীদের হৃদয়ে কি পরিমান প্রভাব ফেলেছে।[৪১]

এক দিকে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করা হচ্ছিল আর অপরদিকে মার্কিন ও ইহুদী নীতি নির্ধারণী সংস্থাগুলো গ্লোবালাইজেশনের চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্য সক্রিয় ছিল।

গ্লোবালাইজেশনের ওপর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ফাখখুল আওলামাহ' (আরবী অনুবাদ)-এর লেখক হিনস পেটার মার্টিন ও হেরাল্ড শৌমিন লেখেন, বিশ্বায়নের বাস্তবায়ন সেদিনই হয়ে গিয়েছিল, ১৯৯৬ সালে যখন সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ মার্কিন শহর সানফ্রান্সিস-এর প্রসিদ্ধ পিরামিট হোটেলে পাঁচ শ' ব্যক্তিকে দাওয়াত দেন। এতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজবিদ, কম্পিউটার ও টেকনোলজি বিশেষজ্ঞ ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসরগণ অংশগ্রহণ করেন। রুদ্ধদ্বার এই মিটিং-এর উদ্দেশ্য ছিল একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার জন্য কি কর্মপন্থা ও রোডম্যাপ তৈরী করা যায় তা নির্ণয় করা। মিটিং-এ যে সমস্ত রাজনীতিবিদ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তন্মধ্যে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জর্জ বুশ, সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শোল্টাজ ও সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার উল্ল্যেখযোগ্য।[৪২]

---

[৪১]। মা-হিয়াল, আওলামাহ, ড. সাদেক জালালুল আযম, পৃ: ৭৪।
[৪২]। আল-আওলামাহ, ড. সালেহ আর-রাকাব, পৃ: ৮।

ধীরে ধীরে একদিকে যেমন বিশ্বায়নের পক্ষে জনমত তৈরি করা হচ্ছিল, তেমনি তার বাস্তবায়নও করা হচ্ছিল, এমন কি আজ যখন আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেছি তখন বিশ্বায়নের ৪০ শতাংশ ৭ বছরের এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বাস্তবায়ন হয়ে গেছে এবং যে দ্রুততার সাথে উপকরণের উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে তার চেয়ে আরো বেশী দ্রুত গ্লোবালাইজেশনের ভয়াল থাবা বিশ্বদিগন্ত ছেয়ে চলেছে।

## গ্লোবালাইজেশনের রাস্তা কে সুগম করেছে?

বিশ্বায়নের নীতি-নির্ধারণী সংস্থাগুলো নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য বানানোর জন্য যে সমস্ত উপায়-উপকরণের মাধ্যমে রাস্তা সুগম করেছে, তন্মধ্যে কিছু নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

### ১. মুক্ত ও স্বাধীন বিশ্ববাণিজ্য :

এই বাণিজ্য পদ্ধতির উদ্দেশ্য বিশ্ববাজারে উন্নত, সমৃদ্ধশালী ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ বাণিজ্য ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই বাজারের দরজা সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতি ও শক্তিসমূহের জন্য খোলা থাকবে, তারা স্বাধীন প্রতিযোগিতামূলক মূলনীতির অধীন হবে।[৪৩] এমতাবস্থায় উন্নতদেশের কোম্পানীগুলোর বিজয়ী হওয়া সুনিশ্চিত। যাদের নিকট নিজেদের শিল্পের বিজ্ঞাপন এবং তা উন্নত থেকে উন্নততর করণের জন্য এ পরিমান পুঁজি বা মূলধন রয়েছে যা অনেক দেশের বার্ষিক বাজেটের চেয়েও উর্ধ্বে। এ ধরণের পশ্চিমা কোম্পানীগুলোর সামনে উন্নয়নশীল দেশের কোম্পানীগুলো প্রতিযোগিতায় কিভাবে টিকবে? তাদের কাছে না বিজ্ঞাপনের পর্যাপ্ত পরিমান উপায়-উপকরণ কিম্বা নিজেদের শিল্পকে উন্নত ও মানসম্পন্নকরণের চাহিদা মাফিক পুঁজি নেই। সুতরাং এই মুক্তবাজার অর্থনৈতিক মায়দানে একক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কোম্পানীসমূহের ইজারাদারি এবং তা বিশ্বায়ন বাস্তবায়নের জন্য সোপানতুল্য।

### ২. সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ

কোন দেশে বিদেশী কোম্পানীর বাণিজ্য করা, নিজেদের কোম্পানী খুলে দেয়া এবং সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করাকে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ বলে। তাকে

[৪৩]। আল-আওলামাহ, ড. সালেহ আর-রাকাব, পৃ: ৮।

অর্থনৈতিক পরিভাষায় "ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (Foreign Direct Investment) বলে।[৪৪]

বিশ্ব শক্তিগুলো উন্নয়নশীল দেশের সাথে চুক্তি করে এবং কনফারেন্সে ইশতিহার জারী করে অন্য দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করাকে আইনগত মর্যাদা দিয়েছে। এখন যে কোন কোম্পানী যে কোন দেশে ব্যবসা করতে পারে। এ সুবর্ণ সুযোগ হাতে আসার পর পশ্চিমা কোম্পানীগুলো উন্নয়নশীল দেশে নোঙর ফেলেছে এবং সেখানকার অর্থনীতি গ্রাস করা শুরু করেছে। এই সমস্ত কোম্পানী নিজেদের পণ্য ও শিল্পায়নের সাথে সাথে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকেও সাথে করে নিয়ে আসে।

উপরন্তু এ সমস্ত কোম্পানী উন্নয়নশীল দেশে আসার উদ্দেশ্য এত বহুমুখী যে, সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ দ্বারা যেমনিভাবে তারা নিজেরা স্বয়ং ফায়েদা লুটে। তেমনিভাবে কিছু ইহুদী প্রভাবাধীন বিশ্বব্যাংকেরও প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয়। কারণ আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলো যা কিছুই বিনিয়োগ করে তা সেই বিশ্ব ব্যাংকের মাধ্যমেই বিনিয়োগ করে। এজন্য এসব বিশ্ব ব্যাংক এই বিনিয়োগ দ্বারা বিপুল পরিমান মুনাফা অর্জনের সাথে সাথে বাণিজ্যিক লেনদেনের উপরও খবরদারি করে এক্ষং নিজ দেশের অর্থনীতিকেও মজবুত ও সুসংহত করে।

## ৩. টেকনোলজির ময়দানে বিপ্লব

টেকনোলজির ময়দানে উন্নতি, অগ্রগতি ও বিপ্লব চলমান যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যে দেশই এই ময়দানে অগ্রগামী সে দেশই অর্থনীতির সকল বিভাগে পরিব্যাপ্ত। এই উন্নতি, অগ্রগতি ও বিপ্লবের ফলে গোটা দুনিয়া একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং দূরত্ব শব্দের আর কোন বাস্তবতা ও আবেদন অবশিষ্ট নেই। এই উন্নতির ফলে মাল, সম্পদ ও সার্ভিসেস (সেবা) একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করা মোটেও কোন কঠিন কাজ নয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি বোতাম টিপে প্রত্যাশিত বস্তুকে অর্জন করা একটি বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই টেকনোলজির ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতিটাও আবার শিল্পোন্নত দেশের ভাগ্যে এসেছে। তারা এই টেকনোলজির সাহায্যে নিজেদের শিল্পকে মজবুত ও সুসংহত করেছে এবং নিজেদের পণ্য ও শিল্প বিশ্বের কোণায় কোণায়

---

[৪৪]। প্রাগুক্ত।

পৌঁছে দিচ্ছে। টেকনোলজি, বিশেষ করে ইনফরমেশান টেকনোলজি বিশ্বায়নের পথের সকল বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিয়েছে।[৪৫]

**৪. বহুজাতিক কোম্পানীর সম্প্রসারণ**

যেমনিভাবে চলমান যুগকে বিশ্বায়নের যুগ বলা হয় তেমনিভাবে মাল্টিন্যাশনাল তথা বহুজাতিক কোম্পানীর যুগ নামেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কারণ এ সমস্ত কোম্পানী গ্লোবালাইজেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এবং বিশ্ব পরিমণ্ডলে তার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ ভৌগোলিক সীমারেখার বাধ্য-বাধকতা না থাকায় এ সমস্ত কোম্পানী বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করে এবং তাদের অর্থনীতিতে সর্প হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সেসব দেশের অর্থনীতিতে কোম্পানীগুলো যা বলে তাই হয়। আর উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের সামনে হয়ে পড়ে অসহায় এবং তাদের মালিকদের সামনে ভিক্ষুকের মত হস্ত প্রসারিত করতে দেখা যায়। কমপক্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মর্জি অনুযায়ী আইন-কানুন তৈরি ও বাতিল করতে হয়।[৪৬]

## বিশ্বায়নের ভূমিকা

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, গ্লোবালাইজেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে আমেরিকানাইজেশন বা মার্কিনাইজেশন (Americanization) কিংবা অন্য ভাষায় গোটা দুনিয়ায় মার্কিন আধিপত্যকে চাপিয়ে দেওয়া। এখানে এও লক্ষ্যণীয়, বিশ্বায়ন হঠাৎ করেই প্রকাশিত হয়নি। বরং পুঁজিবাদী শক্তির পক্ষ হতে এর জন্য পরিকল্পিত ও সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ময়দান পরিস্কার করা হয়েছে এবং রাস্তা সুগম করা হয়েছে। যদি আমরা বিগত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে অনুমান করা যাবে, অনেক এমন ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে যাকে বিশ্বায়নের ভূমিকা কিংবা পূর্বাভাস ছাড়া কিছুই বলা যেতে পারে না। সে মতে লীগ অব নেশনস, অত:পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। যার অঙ্গ সংস্থার মধ্যে বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফাণ্ড (আইএমএফ) উল্লেখযোগ্য এবং যার তত্বাবধানে বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক ময়দানে বিজয় অর্জন করেছে। অত:পর ১৯৪৭ সালে জেনেভায় ২৩টি শিল্পোন্নত দেশের মাঝে একটি চুক্তি হয় যাকে গ্যাট

---

[৪৫] । প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

[৪৬] । আল-আওলামাহ, পৃ.-৯, আবদে সাঈদ ও আবদে ইসমাঈল প্রণীত আল-আওলামাহ ওয়াল আলম আল-ইসলামী: আরকাম ওয়া হাকায়েক-এর সৌজন্যে।

(বাণিজ্য ও কাস্টম ডিউটি) চুক্তি বলে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন বাণিজ্যের বিকাশ সাধন করা এবং চুক্তিনামায় দস্তখতকারী দেশগুলো যেন নিজেদের বাজার একে অপরের জন্য খুলে দেয়। এই চুক্তি ১৯৪৭ সালে শুধু ২৩টি দেশের তত্ত্বাবধানে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৩ সালে এতে ১১৭টি দেশ অংশ নেয়। এ ধরনের আরেকটি চুক্তি "মাস্টার এ্যাক্ট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, যা ১৫টি শিল্পোন্নতদেশ নিয়ে গঠিত হয়।

অনেক রাজনৈতিক ঘটনাও বিশ্বায়নের জন্য "মুকাদ্দামাতুল জাইশ" প্রমানিত হয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াই তথা স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো। এর পূর্বে গোটা দুনিয়া দুই শিবিরে বিভক্ত ছিল। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তার প্রভাবাধীন দেশগুলোতেও মার্কিন ইজারাদারির সূচনা হয়। সাবেক রুশ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিতে ১৯৮৫ সালে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কারের ঘোষণা দেন, যাকে 'প্রেস্ত্রয়কা' নাম দেওয়া হয়। এই ঘোষণায় মূলত সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের ব্যর্থতা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ঘোষণা ছিল। আফগানিস্তানের সুউচ্চ পর্বতের সাথে আঘাত খাওয়ার পর কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্র সেখানেই দাফন হয়ে যায়। এভাবেই তদানীন্তন বিশ্বের দ্বিতীয় পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৮৭ সালে 'বার্লিন প্রাচীর' ভেঙ্গে যাওয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর ঐক্যের পর পূর্ব ইউরোপ থেকেও সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জানাযা হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সূচনা হয়, যার অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় অঞ্চলে সেনা ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ হয়ে যায়। এ সমস্ত ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার ও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার নেতৃত্ব দানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

১৯৯৫ সালের এপ্রিলে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যা মূলত 'গ্যাট' চুক্তির নবায়নের একটি সফল প্রচেষ্টা ছিল। এই সংস্থা গ্লোবালাইজেশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'বিশ্ব ব্যাংক' ও 'আন্তর্জাতিক মনিটরি ফান্ড'-এর সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা দ্বারা মূলত বিশ্বায়নের ইমারত পূর্ণতা লাভ করে। যখন সুইজারল্যান্ডের শহর 'জেনেভা'য় ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাইন বোর্ডে

ইনফরমেশন টেকনোলজির স্বাধীন ব্যবহার সম্পর্কে বিশ্ব চুক্তি হয়। তখন এর দ্বারা টেকনোলজি নিয়ন্ত্রণকারী উন্নত দেশগুলো, বিশেষ করে আমেরিকার পক্ষে উন্নয়নশীল দেশে স্বীয় মূল্যবোধ, চিন্তাধারা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তার ও প্রসারের সুযোগ মিলে যায়। পূর্ব ইউরোপ ন্যাটোভুক্ত হওয়া এবং অনেক আরব রাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বায়ন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রসারিত হওয়ার পথ সুগম হয়।

অতঃপর ইসরাইলের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও বিশ্বায়নের সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়। যার উদ্দেশ্য বিশাল ইসরাইল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা জায়নবাদীদের স্বার্থ অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যকে বিশ্বায়নের আওতায় নিয়ে আসা। নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তারা আরব রাষ্ট্রের সাথে সামরিক চুক্তি, অতঃপর অর্থনৈতিক চুক্তির আশ্রয় নেয়, যার পৃষ্ঠাপোষকতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা প্রস্তুত ছিল। এসব চুক্তি দ্বারা আমেরিকার সবচেয়ে' বড় মিত্র এবং বিশ্বায়নের আসল ভূমি 'ইসরাঈল' যেমনি রাজনৈতিকভাবে মজবুত ও সুসংহত হয় তেমনি অর্থনৈতিকভাবেও শক্তিশালী হয়ে যায়।

অত:পর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব 'স্টক এক্সচেঞ্জ' বিশ্বায়নের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বিশাল সাহায্য করেছে। কারণ ষ্টক মার্কেটের কারণে যে ব্যক্তি যেখানেই যতটুকুই পুঁজি বিনিয়োগ করবে তার এই পুঁজি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ফায়দা পৌঁছাবে। আর বিশ্বায়নের উদ্দেশ্যও এটাই যে, পুঁজি বিনিয়োগ কোন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকুক, বরং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে হোক, যাতে মুক্ত বিশ্ব বাণিজ্যের বিকাশ হতে পারে।[৪৭]

এই ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যা বিশ্বায়নের বিকাশদানের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে এবং এটাকে একটি মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাস্তবতার নিরিখে অনুমিত হয়, বিশ্বায়ন হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয়নি। নতুন বিশ্বব্যবস্থা এমনি এমনিই তৈরী হয়নি, বরং ইহুদী মস্তিষ্কপ্রসূত বছরের পর বছরের প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র দ্বারা গ্লোবালাইজেশনের রাস্তা সুগম হয়েছে। তারা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে, এ সমস্ত ঘটনা নতুন বিশ্বব্যবস্থার ভূমিকা ও পূর্বাভাসে পরিণত হয়েছে।

---

[৪৭]। আল-আওমালাহ, ড. সালেহ আর-রাকাব, পৃ- ৮-১০।

## নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় উপাদান

বিশ্বায়ন কিছু কেন্দ্রীয় উপাদানের সমন্বয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নে প্রদত্ত হলো:

### ১. পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার বিকাশ

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার পরাজয় ও নির্মূলের কারণে সকল সমাজের উপর পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার এমন মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যাকে আমেরিকা আরো বিকশিত করছে। জাতিসংঘের অধীন বিশ্ব সংস্থাসমূহ যেমন 'বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার বিকাশে সাহায্য করেছে। আর এ সংস্থাসমূহের তত্ত্বাবধানে হওয়া আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ আমেরিকার রাস্তা পরিস্কার করেছে।

### ২. এককেন্দ্রিক

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও তার আন্তর্জাতিক অবকাঠামো 'ভারসো' নির্মূলের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই বিশ্ব নেতৃত্ব হিসেবে অত্মপ্রকাশ করে। মানবেতিহাসে এটাই প্রথম ঘটনা যে, আজ শক্তির ভারসাম্য শেষ হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ পরিমান মজবুত ও সুসংহত হয়েছে যে, কোন দেশ কখনই এত মজবুত ও শক্তিশালী হয়নি। শক্তির ভারসাম্যহীনতার কারণে আজ আমেরিকা একটি মজবুত ও শক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রের রূপ ধারণ করেছে। তাই আজ অন্য সকল দেশকে তার তাওয়াফ করতে দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠার এ অবস্থানে পৌঁছার পরেই আমেরিকা 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা' দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সাহস করেছে, বিশ্ব এতে রাজী হোক বা না হোক।

### ৩. যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিপ্লব

মানবেতিহাসে বহু বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু অসাধারণ গুরুত্বের অধিকারী। আর কিছু সাময়িকভাবে ফলপ্রসূ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল। কিছু পরবর্তীতে ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। টেকনোলজির ক্ষেত্রে আসন্ন বিপ্লব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় বিপ্লবের মধ্যেগণ্য। এই বিপ্লব দুনিয়াকে বিস্ময় ও তাজ্জবের স্থানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে! কম্পিউটার সেই বিপ্লবেরই অবদান, যা বর্তমান যুগে এক সেকেন্ডের মধ্যে দুনিয়ার দুই বিলিয়ন কর্ম সম্পাদন করছে। যদি কম্পিউটার ছাড়া এই কাজ করা হয় তাহলে তা সম্পাদিত হতে এক হাজার বছর লেগে যাবে। এই বিপ্লবের দ্বিতীয় অবদান হলো, যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাধিত

উন্নতি-উৎকর্ষ যার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ একে অপরের সাথে জুড়ে আছে। যোগাযোগ উপকরণ, যেমন টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, রেডিও, ই-মেইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে অথবা এভাবে বলুন, পশ্চিম হতে পূর্বে তথা গোটা পৃথিবীতে সভ্যতা-সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও রূপান্তর হচ্ছে। ফলে আজ বিশ্বায়নকে বিদ্যুৎ গতিতে বিশ্বদিগন্তে প্রসার লাভ করতে দেখা যাচ্ছে।[৪৮]

## পর্দার অন্তরালের কিছু সংগঠন ও সংস্থা

এতটুকু তো 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার' স্বপ্নদ্রষ্টা ও গোড়াপত্তনকারীদেরও জানা ছিল যে, দুনিয়াকে এই নতুন ব্যবস্থার বলয়ে নিয়ে আসা কোন সহজ কাজ হবে না, বরং এর জন্য যেমনিভাবে অর্থনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে, তেমনিভাবে রাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রচার ও মিডিয়ার বিভিন্ন বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করে তার বাস্তবায়ন করাও পাহাড় খোদাই করে দুধের নদী প্রবাহিত করার চেয়ে কম নয়। এজন্য জায়নবাদী কুচক্রী ও কুটিল মস্তিষ্ক গ্লোবালাইজেশনের গন্তব্যে পৌঁছার সকল রাস্তা সুগম করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে। তারা তাদের সকল যিম্মাদারী কখনো পর্দার অন্তরালে এবং কখনো জনসমক্ষে আঞ্জাম দেয়। নিম্নে এ ধরনের কিছু সংস্থা ও সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিত তুলে ধরা হলো, যারা পর্দার অন্তরাল হতে বিশ্বায়নের ক্রমবিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

### ১. বিল্ডার ব্রিজ

এই সংগঠন বিশ্বের অত্যন্ত শক্তিশালী ও গোপন বিশ্ব সংগঠন। ১৯৪৫ সালে সুইডেনের অধিবাসী এক পুঁজিপতি জুসেফ রিটেংগার এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের অধিবেশন ১৯৪৫ সালে হল্যান্ডের প্রসিদ্ধ শহর উসটারবেক-এ বিল্ডার ব্রিজ নামক এক ফাইভ স্টার হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন হল্যান্ডের রাজপুত্র বার্নহার্ড। উক্ত অধিবেশনে এই গোপন বিশ্ব সংগঠনের নাম হোটেলের নামে 'বিল্ডার ব্রিজ' রাখা হয়। সাধারণত এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা থাকে ১১৫জন। তন্মধ্যে কিছু থাকে অন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তবে এদের সংখ্যা হয় সকল সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ। আর বাকী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও শিল্প বিভাগের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর সদস্য দুই প্রকারের হয়।

---

[৪৮] । প্রবন্ধ আল আওলামাতুল হাক্বিক্বিয়াহ্ ওয়াল আবআদ, দেখুন ওয়েব সাইড-http//:www.um-man.com

**ক) স্থায়ী সদস্যঃ** যেমন বিশ্ব কুখ্যাত মার্কিন ইহুদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার।

**খ) অস্থায়ী সদস্যঃ** এদেরকে সংগঠনের অধিবেশনে আমন্ত্রণ পত্রের মাধ্যমে আহবান করা হয়। ২০০০ সালে সংগঠনের নির্বাচন হয়। উক্ত নির্বাচনে সংগঠনের প্রধান নির্বাচিত হন ন্যাটোর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল লর্ড গিরেংটন। সংগঠনের অধিবেশনের জন্য সাধারণ জনগণের দৃষ্টির আড়ালে সুরম্য অট্টালিকা হোটেল বুক করা হয়। সেখানে এই অধিবেশন তিন দিন পর্যন্ত চলে। অধিবেশন চলার সময় কোন সদস্য হোটেল থেকে বাইরে আসতে পারবে না। সিকিউরিটি ব্যবস্থাপনা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এ. ছাড়াও ইউরোপীয় দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো করে থাকে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বিগত ২০ বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে রাজনৈতিক বিজয়ের জন্য এই গোপন সংস্থার সাথে সম্পর্ক রাখা একান্ত জরুরী ছিল। আমেরিকার অনেক প্রেসিডেন্ট এই সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করার পরই প্রেসিডেন্টের সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন যার মধ্যে রোনাল্ড রিগান, জিমি কার্টার, জর্জ বুশ ও বিল ক্লিনটন উল্লেখযোগ্য। বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ১৯৭৫ সালে এই সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অধিবেশনের ঠিক কয়েক বছর পর তিনি বৃটেনের প্রধান মন্ত্রিত্বের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এমনিভাবে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবী এক বৃটিশ নওজোয়ান রাজনীতিবিদ টনি ব্লেয়ার অপরিচিতির এক চরম নিুস্তরে পড়ে ছিলেন। বৃটেনের মত পুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করে রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া নিজেকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর।

কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই নওজোয়ান স্বীয় ধ্যান-ধারণা থেকে তওবা করে 'বিল্ডার ব্রিজের' বার্ষিক অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন এবং মুহূর্তেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে চার বছরের মাথায় বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান।

১৯৯৮ সালে এই সংগঠনের অধিবেশন স্কটল্যান্ডের 'টুর্নব্রি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশন চলাকালে কিছু পশ্চিমা সাংবাদিক অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু তথাপিও অধিবেশনের এজেন্ডা সম্পর্কে তাদের যা কিছু বুঝে আসে তা তারা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার ইন্টেলিজেন্স আপডেট নামে প্রকাশ করে। মিটরিক্স-এর ম্যানেজিং এডিটর চার্লস আরবেক লেখেন, অধিবেশনে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর অঞ্চলের ব্যাপারে সি.আই.এ'র সাবেক ডাইরেক্টর জন ডুট্যাচ মার্কিন রাজ্য নিউজার্সির গভর্ণর ক্রিসটান ট্রেডওয়েডকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, তাঁরা গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ

করে কিভাবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ছায়াতলে গোটা বিশ্বে পশ্চিমাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা চিহ্নিত করবেন।

আরবেক আরো লেখেন, এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী অনেক সদস্যের জাতীয়তা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু অধিবেশনে তার অনুমোদনকৃত প্রস্তাবাবলী বিশ্বের বিভিন্ন সরকার, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিশ্ব বাণিজ্য ও দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্পদ ভান্ডারের ওপর কার্যকরী হয়।[৪৯]

**২. রকফেলার ফাউন্ডেশন**

নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রথম দিন হতেই যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছে, তার মধ্যে রকফেলার ফাউন্ডেশন শীর্ষে। এই প্রতিষ্ঠান জনসেবার লেবেল লাগিয়ে ট্যাক্স হতে অব্যাহতি লাভ করেছে। মার্কিন সিনেটর ১৯৫২ সালে প্রস্তাব-১৬৫ এর মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করে; যার উদ্দেশ্য ছিল এ সংস্থার অর্থ কোথাও মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা।

পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে! উক্ত সংস্থা ইউরোপ আমেরিকায় ইহুদী স্বার্থের জন্য কর্মতৎপর। সংস্থার অনেক অঙ্গসংগঠনও রয়েছে, যেগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত মনে হয়। কিন্তু প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত।[৫০] 'বিল্ডার ব্রিজ' সংগনের বার্ষিক অধিবেশনের হিসাব ছাড়া খরচও এই সংস্থাই (যা মূলত আমেরিকার সবচেয়ে 'বড় বাণিজ্য কোম্পানী) বহন করে।[৫১]

**৩. মার্কিন গীর্জা মিশন**

১৯০৮ সালে হেনরী ফুয়াড ও রুসিংস এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে। রকফেলার ফাউন্ডেশন তার আর্থিক সাহায্য সরবরাহ করে। ১৯৪২ সালে এই সংগঠন এমন কিছু প্রস্তাব পেশ করে, যার মধ্যে এমন একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার চিত্র বা রূপরেখা ছিল যে ব্যবস্থার বীর সেনানীরা দুনিয়ার সকল দেশে কর্তৃত্ব চালাবে। এই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র এমন অর্থ ব্যবস্থা প্রণয়ন করবে যা বিশ্ব ব্যাংকের অধীন হবে। ১৯৪৮ সালের ২৩ আগষ্ট এই সংগঠনের নাম গীর্জা মিশন রাখা হয়।[৫২]

**৪. পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটি (CFR)**

১৯০৯ হতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মাঝে রাহুডস সেশল (ইহুদী) ও তার বন্ধু- বান্ধব মিলে এই সংগঠনের গোড়া পত্তন করে। সে সময় এর লক্ষ্য-

---

[৪৯]। মদিনা সে হোয়াইট হাউস তক-মোহাম্মদ আনিসুর রহমান প্রণীত, পৃ. ১৬৮-১৭৬।

[৫০]। মাগরিবী মিডিয়া, পৃঃ ৯৬।

[৫১]। মদিনা সে হোয়াইট হাউস তক, মোহাম্মাদ আনিসুর রহমান প্রণীত, পৃঃ ১৭৩।

[৫২]। মাগরিবী মিডিয়া, পৃঃ ৯৭।

উদ্দেশ্য গোপন রাখা হয়েছিল। ১৯২১ সালে রুটশিল্ড ব্যাংক-এর মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ জি. আরমোরগান, জন রকফেলার, বার্নার্ড বরুখ (যিনি একাধিক মার্কন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন), পল ওয়ারবার্গ, জ্যাক শেফ ও আটুকাহন প্রমুখ মিলে এই সংগঠনকে আর্থিক সহযোগিতা দান করে। CFR-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে কর্নেল এডওয়ার্ড মান্ডিল হাউস (মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা), ওয়ারল্যাম্পম্যান (মার্কিন সাংবাদিক), জন ফাস্টরডালস (মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী), এলিন ডালস (সিআইএ'র ডাইরেক্টর), ক্রিশ্চান হারটার (মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী) প্রমুখ অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

CFR-এর তত্ত্বাবধানে ফরেন এফেয়ার্স নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার এক সংখ্যায় 'গবেষণা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে।

এই সংগঠনের শক্তির অনুমান এভাবে করা যেতে পারে, মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সহকারী জন ম্যাকল বলেন, মার্কিন সরকারের বিভিন্ন দফতরে যখনই কোন কর্মচারীর প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই সর্বপ্রথম আমরা CFR- এর সদস্যদের তালিকা দেখি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিউ ইয়র্কে অবস্থিত তার কেন্দ্রীয় দফতরে যোগাযোগ করি।

মার্কিন প্রশাসন পরিচালনাকারী সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সম্পর্ক এই সংগঠনের সাথে যারা ইহুদী স্বার্থ বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বদা কর্মতৎপর। কিছু উদারহণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার বোঝা যাবে।

১) জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার জন্য মার্কিন প্রশাসন ৪৬৭ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছিল। সেই কমিটিতে জন ফাস্টার ডালেস, নেলসন রকফেলার ও এডলাই ইস্টিউনসনও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সবাই CFR- এর সদস্য ছিলেন।

২) মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত ৩ শত ১৩ জন দায়িত্বশীল এই সংস্থার সদস্য ছিলেন। একই অবস্থা জর্জ বুশের দফতরেও ছিল। বুশ প্রশাসনে ৩শ' ৮৭ জন অফিসার এই সংস্থা হতে নির্বাচিত হয়ে এসেছিল। ১৯২১ সন থেকে এ পর্যন্ত ১৮ জন অর্থমন্ত্রীর মধ্য হতে ১২ জনের সম্পর্কই এই CFR সংস্থার সাথে ছিল।

১৬ জন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্য হতে ১২ জন এবং ১৯৪৭ সাল হতে এ পর্যন্ত ১৫ জন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ৯ জনকেই এই সংস্থা হতে নেওয়া হয়েছিল।

৩) ১৯৫২ হতে এ পর্যন্ত (১৯৬৪ সাল ছাড়া) উভয় রাজনৈতিক পার্টি হতে যত প্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়িয়েছিলেন সবারই সর্ম্পক ছিল এই সংস্থার সাথে।[৫৩]

---

[৫৩]। মাগরিবী মিডিয়া, পৃঃ ৫৭-৯৯ বর্ধিত সংস্করণ।

## বিশ্বায়ন কী চায়?

গ্লোবালাইজেশনের পশ্চিমা প্রবক্তা ও তাদের প্রাচ্য অনুসারীরা এই ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে বিশাল বিশাল দাবী করে থাকে। যেমন বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক বিকাশের গ্যারান্টি। প্রতিটি জাতি তার ছায়ায় নিজের ভবিষ্যৎ সুন্দর করতে পারে। প্রত্যেক মানুষ তার মাধ্যমে উজ্জ্বল জীবন কাটাতে পারে। এটা আধুনিক টেকনোলজি প্রসারের মাধ্যম, যার ফলে ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। বিশ্বায়ন বিদেশী বাজারে ভাগ্য পরীক্ষার সুযোগ সরবরাহ করে। এ দ্বারা বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় এবং জাতীয় অর্থনীতি উন্নতি ও অগ্রগতির সিঁড়িসমূহ অতিক্রম করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বাস্তবতা হলো বিশ্বায়নের এই দাবী ফোকলা। বাস্তবের সাথে তার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। ড. মুহাম্মদ হাসান রসমীর (কায়রো ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার বিভাগের ডাইরেক্টর) ভাষায়, গ্লোবালাইজেশন একটি অন্ধ প্লাবন। এটি তার রাস্তার কোন বাধাকে বরদাশত করে না। তার সিস্টেম সবল ও শক্তিশালীদের জন্য সাহায্যকারী আর দূর্বলদের জন্য ধ্বংসাত্মক। এই ব্যবস্থা তার প্রতিষ্ঠাতাদেরকে ইজারাদারি ও আধিপত্য দান করে এবং আসমানী-মু'জেযার জন্য অপেক্ষমানদের ভবিষ্যৎ বাগডোর তার নীতি নির্ধারকদের হাতে তুলে দেয়।[৫৪]

এমন কিছু দেশও রয়েছে বিশ্বায়নের ভয়াবহতা ও তার ফলে সৃষ্ট হওয়া বহুজাতিক কোম্পানীর ইজারাদারি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রয়েছে। তারা জানে, এই ব্যবস্থার ফলে দরিদ্র দেশের দারিদ্র আরো বৃদ্ধি পাবে এবং দ্যারিদ্ররা পশ্চিমা পুঁজিবাদী নীতির বলয়ে চলে আসবে। সেসব সচেতন দেশের মধ্যে মালয়েশিয়ার নাম শীর্ষ তালিকায়। সে দেশের প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী জাগরণের সমর্থক এবং পশ্চিমা আধিপত্যকে প্রত্যাখ্যান করেন। আজ তার চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিমা পুঁজিবাদীদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি)-অধিবেশনে ইসলামী বিশ্বের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের উদ্দেশে এক বক্তৃতাকালে বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিশ্বায়নের তল্পীবাহক। এই সংস্থা উন্নতবিশ্বকে উন্নয়নশীল দেশসমূহ সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেওয়ার অনুমতি দেয়।[৫৫]

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ফ্রান্সের জাতীয় দিবস (১৪ জুলাই ২০০০) উপলক্ষে এক বক্তৃতায় বলেন, "গ্লোবালাইজেশনের ওপর অবরোধ আরোপ করা

---

[৫৪] । মাআল-আওলামাহ, মাসিক আল-আহরাম, ১৬/৯/২০০১।

[৫৫] । আল-আওলামাহ, ড. সালেহ আর-রাকাব, পৃঃ ১৪।

একান্ত প্রয়োজন। কারণ এটা সামাজিক অনৈক্যের কারণ। বিশ্বায়ন দ্বারা যদিও উন্নতির রাস্তা সুগম হয়, কিন্তু এর ভয়াবহতা মারাত্মক। তন্মধ্যে প্রথম ভয়াবহতা হলো- এই ব্যবস্থা সমাজের ওপর সরাসরি আগ্রাসন চালায়। দ্বিতীয় ভয়াবহতা হলো এর কারণে বিশ্বে অন্যায়-অপরাধ বৃদ্ধি পায়। আর তৃতীয় ভয়াবহতা হলো এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছাড়া প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী।"[৫৬]

প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক উইলিয়াম গ্রেডার ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত স্বীয় গ্রন্থ (One world ready or on)- বিশ্বায়ন সম্পর্কে লেখেন, "বিশ্বায়ন একটি আশ্চর্য ও অদ্ভুত পদ্ধতি, যা বিশ্ব শিল্প ও বাণিজ্য বিপ্লবের ফলে অস্তিত্ব লাভ করে। এই ব্যবস্থা যেমনিভাবে উন্নতির মাধ্যম তেমনিভাবে ধ্বংসেরও কারণ।"[৫৭]

এই ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে সামনে অগ্রসর হয়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন একজন মেধাবী ও শক্তিশালী মানুষ এবং একজন মেধাহীন ও দুর্বল ব্যক্তির মাঝে সংঘটিত ব্যাপার। যার এক পক্ষ তো সব কিছুর মালিক আর অপর পক্ষ মালিকানার অধিকার হতে বঞ্চিত। এক পক্ষে মুনিবের প্রভাব- প্রতিপত্তি আছে অপর পক্ষ গোলাম ও দাস। এক পক্ষ স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর গর্ববোধ করে এবং তা নিজের জন্য পুঁজি মনে করে। অপর পক্ষ স্বীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে বাধ্য হয়। এক পক্ষ স্বীয় বিশ্বাসের ওপর অটল আর অপর পক্ষের কাছে দাবী করা হয়, সে তার বিশ্বাস পশ্চাতে নিক্ষেপ করবে। মোটকথা, এই ব্যবস্থায় এক পক্ষ সব কিছু আর অপর পক্ষ কিছুই নয়।

## বিশ্বায়নের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র

বিশ্বায়নের নীতি নির্ধারকরা এই আন্দোলনকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে, যাতে মানব জীবনের কোন দিকই এমন না থাকে, যা জায়নবাদী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত না হয়। এজন্য বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তরালে ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক এই ব্যবস্থাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছে এবং প্রতিটি ময়দানের খেলোয়াড়দের আলাদা টিমও তৈরি করে দিয়েছে, যাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। মৌলিকভাবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

---

[৫৬]। মাসিক আল হাওয়াদেস (প্রবন্ধ) মুস্তাবিলুস সাহাফাতিল আরাবিয়া ফী যিললিল আওলামাহ, মুহাম্মদ-সংখ্যা স্মারক-২৩১০।

[৫৭]। আল-আওলামাহ, ড. সালেহ আর-রাকাব, পৃঃ ৫।

১। রাজনীতি
২। অর্থনীতি
৩। সভ্যতা-সংস্কৃতি
৪। সমাজ ও নৈতিকতা
৫। ভাষা ও সাহিত্য

এ সকল ময়দানে একে অপরের সাথে খুব গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। কারণ বিশ্বায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোটা দুনিয়াকে মার্কিন তথা জায়নবাদী রঙে রঙিন করা এবং সমগ্র বিশ্বে আমেরিকার মাধ্যমে ইহুদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং যেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুনিয়ার মানচিত্র পাল্টানো প্রয়োজন এবং রাজনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অসহায় ও নিঃস্ব বানানো আবশ্যক, তদ্রূপ এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পরাজিত করা এবং এই রাস্তা দিয়ে দরিদ্র দেশগুলোর ওপর ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত করাও জরুরী। এমনিভাবে এই ইজারাদারিকে স্থায়ীকরণের জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বে পশ্চিমা, বিশেষ করে মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়াও অত্যাবশ্যক। যাতে উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণ যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নেয় তখন পশ্চিম থেকে আসা যে কোন বাতাসে তার আত্মা প্রশান্তি অনুভব করবে। সেখানকার জীবন ব্যবস্থাকেই উন্নত ও মাপকাঠি মনে করবে এবং সেখানে অবস্থান ও বসবাসকেই স্বীয় অকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মনে করবে। পশ্চিম হতে আসা প্রতিটি বস্তুকে বুকে লাগাবে এবং তার ব্যবহারকেই ফ্যাশন ও উন্নত জীবন পদ্ধতির আলামত মনে করবে। সভ্যতা-সংস্কৃতির রাস্তা ধরেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকার আধিপত্য অত্যন্ত সহজ হতে পারে।

আসুন! সর্বপ্রথম আমরা বিশ্বায়নের রাজনৈতিক দিকটার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করি। তাহলে দেখব যে, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা রাজনৈতিক হিসাবে কোন্ পথে ধাবমান? স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সে কী মাধ্যম ব্যবহার করছে? আমেরিকা এই ময়দানে কি ভূমিকা পালন করতে পারে? এবং জায়নবাদী শয়তানী মস্তিষ্কগুলো মার্কিনীদের কাঁধে বন্দুক রেখে তাদের কিভাবে চালাচ্ছে?

## দ্বিতীয় অধ্যায়
# রাজনৈতিক বিশ্বায়ন

## রাজনৈতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য

জায়নবাদী লবি গোটা বিশ্বকে স্বীয় হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা এবং তার ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব চালানোর স্বপ্ন বহু বছর পূর্বেই দেখেছিল। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য সুইজারল্যান্ডের প্রসিদ্ধ শহর ব্রাসেলস-এ তাদের নীতি নির্ধারকদের এক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং-এ তারা তাদের ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ অতীত ইতিহাস থেকে সাহায্য নিয়ে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনা তৈরি করে, যাতে তারা তাদের পরিকল্পিত বিশাল ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে গোটা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে পারে, ভূগর্ভে লুক্কায়িত সম্পদ আহরণ করতে পারে এবং আল্লাহ তায়ালা বহু শতাব্দী পূর্বে তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমানের যে বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন তা যেন দূর করতে পারে। বিশ্বায়ন মূলত জায়নবাদী শয়তানী মস্তিষ্কের উদ্ভাবিত চিন্তাধারা। বিশ্বায়ন আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহুদীদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে ধাবমান। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি বিশ্বের প্রতিষ্ঠা করা যার নিয়ন্ত্রণ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ও অভ্যন্তরীণভাবে ইহুদীদের হাতে থাকবে। দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত করে দেওয়া হবে। তাদের শুধু 'ল এন্ড ওয়ার্ডার' আয়ত্তে রাখার অধিকার থাকবে। তাদের ক্ষমতা কোন কমিটি বা সংগঠন থেকে বেশী হবে না। আর প্রতিরক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করবে বিশ্বের এই ঠিকাদাররা।

যদিও তারা বিশ্বায়ন নিয়ে প্রোপাগান্ডার বাজার গরম করে চলেছে এবং দাবী করছে যে, এই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের প্রধান হবে জাতিসংঘ। কিন্তু বাস্তবতা হলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি উপহাস ও প্রবঞ্চনার পাত্র থেকে বেশী গুরুত্ব রাখে না। সমস্যার সমাধান তো নিরাপত্তা পরিষদে করা হয়। সকল রাষ্ট্রের ভাগ্যের ফয়সালা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের হাতে থাকবে। তারাই এই সিদ্ধান্ত নেয়, বিশ্ব ব্যবস্থা কোন্ পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হবে। এজন্য প্রস্তাবিত

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের প্রধান বা সুপ্রিম জাতিসংঘ হবে না, বরং নিরাপত্তা পরিষদ হবে, যার স্থায়ী সদস্যদের "ভেটো" পাওয়ারের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা ও বাস্তবায়ন করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। যদিও তাদের এর জন্য সকল নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে হবে।

জাতিসংঘের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক ব্যবস্থা থাকবে, যা ইতোমধ্যেই গঠন হয়ে গেছে। তার একটি শান্তিবাহিনীও থাকবে, যারা ইতোমধ্যেই 'নীল হেট' লাগিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে অনেক দেশে তার শয়তানি ও বর্বরতা প্রদর্শন করছে। কিন্তু একটি প্রকৃত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র তখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, যখন তার সামরিক শক্তির সামনে কারো মাথা তোলার সাহস হবে না এবং কেউই এই রাষ্ট্রের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী হতে সামান্যও মুখ ফেরাতে পারবে না। এজন্য জাতিসংঘের ব্যবস্থাকে অধিকতর মজবুত, শক্তিশালী ও সুসংহত করার জন্য অস্ত্র সংকোচনের ব্যাপারে চুক্তি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করা হয়েছে। সে সব আইন-কানুনের আলোকে এমন রাষ্ট্রসমূহ যাদের জুলুম, অত্যাচার ও বর্বরতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, তাদেরকে রাসায়নিক ও আণাবিক অস্ত্র রাখার খোলা ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আর অন্যান্য দেশকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য এ ধরনের অস্ত্র রাখার ওপর অবরোধ আরোপ করা হয়েছে। যদি কেউ নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত ও সুসংহত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তখন তাকে শিক্ষণীয় পরিণাম ভোগ করতে হয়। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার আড়ালে প্রচার মাধ্যম ও মিডিয়া দ্বারা প্রচার করা হচ্ছে যে, তথাকথিত দায়িত্বশীল ও মোড়লদের পারমাণবিক অস্ত্র রাখার অধিকার রয়েছে। আর দায়িত্বহীন ও অনিরাপদ হাতে পারমাণবিক অস্ত্র গেলে যে কোন সময় দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্ত্রাধারা মানুষের মস্তিষ্কে চাপিয়ে দিয়ে ধ্বংস ও বর্বরতার এমন পন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে যার লজ্জায় পশুরও মাথা নিচু হয়ে গেছে এবং মানবতার নিকট শোকসন্তপ্ত হওয়ার জন্য অশ্রুও অবশিষ্ট থাকেনি। এই হাতকড়া এজন্য গ্রহণ করা হয়েছে যাতে কোনো দেশ জাতিসংঘের ওপর চেপে থাকা দেশের প্রতি চ্যালেঞ্জ করতে না পারে। আর এ সকল দেশ জাতিসংঘকে এমন একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে দেবে যা সাতটি উন্নত দেশ ও তাদের লাগামদাতা ইহুদীগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। এমন একটি রাষ্ট্র হবে যার মধ্যে "জাতীয়তা ও দেশাত বোধের মত শব্দের কোন গুরুত্ব থাকবে না, যা "গণতন্ত্র ও সেক্যুলারিজম" এর আড়ালে রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের পতাকাবাহক হবে এবং যা

বিশ্ব জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হবে, কিন্তু বাস্তবে শুধু শ্বেতাঙ্গ প্রজন্মের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে এবং তার বলয়ভুক্ত হবে ।

## আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অগ্রসরমান পদক্ষেপ

বিশ্বায়নের মাধ্যমে ইহুদী লবি যে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে, তা শুধু একটি মতবাদ কিংবা কোন চিন্তাধারা হিসেবেই রয়ে যায়নি, বরং তার প্রতিষ্ঠার পথেই অগ্রসরমান পদক্ষেপ হিসেবে দ্রুত গতি সম্পন্ন হয়ে উঠছে। অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে এই পরিকল্পনাকে বাস্তাবতার পোষাক পরানো হচ্ছে। পশ্চিমা নেতৃবর্গ ও ইহুদী এজন্টদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রকে জনগণ ও সর্বসাধারণের পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য বানানোর জন্য জনমত গঠনের নিরলস প্রয়াস চালানো হচ্ছে, যাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে জনগণের প্রতিক্রিয়া জানা যায়। অত:পর সে প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপও নেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যের জন্য গ্লোবালাইজেশন-এর ধারক-বাহকরা তাদের বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রকে একটি বাস্তবতা ও অবশ্য গ্রহণীয় বস্তু বানিয়ে উপস্থাপন করে ।

(১) জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোসগালী স্বীয় গ্রন্থ "আন্ত র্জাতিক রাষ্ট্রে" (১৯৯৭ সালে প্রকাশিত) লেখেন, "জাতিসংঘ এক হিসেবে আন্ত র্জাতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম ইট ।"[৫৮]

(২) আমাদের সামনে বর্তমানে একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আমাদের জন্যেও এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও। বাস্ত বিকই আমাদের সামনে একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। এটা এমন ব্যবস্থা হবে যার মধ্যে জাতিসংঘ সবচেয়ে বেশী শক্তির অধিকারী হবে। (জর্জ বুশের বক্তৃতা হতে সংগৃহীত) ।[৫৯]

(৩) বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষমতা কি হবে? আমরা এমন একটি স্পর্শকাতর পরিস্থিতি অতিক্রম করছি যার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের স্তর হতে একটি বিশ্বরাষ্ট্রের ক্ষমতায় রূপান্তরিত হচ্ছে ।[৬০]

(৪) বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে তা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরিত করে দেওয়া উচিত ।[৬১]

---

[৫৮]. মাগরিবী মিডিয়া, পৃ. ৮৫ ।

[৫৯]. প্রাগুক্ত ।

[৬০]. প্রাগুক্ত

[৬১]. প্রাগুক্ত ।

(৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের দায়িত্বহীন ব্যয়ের ওপর অবরোধ আরোপ করা জরুরী আর এই কাজ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। যেমনিভাবে আন্তর্জাতিক আদালত বিভিন্ন রাষ্ট্রের হিসাব-নিকাশ নেয়, তেমনিভাবে আমরা সকল দেশকে একটি গন্ডির মধ্যে আনতে চাই।[৬২]

(৬) ২য় পর্যায়ে ধীরে ধীরে জাতিসংঘের একটি আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে খুব দ্রুত গতিতে সকল দেশকে রাসায়নিক ও আণবিক অস্ত্র হতে বঞ্চিত করে দেওয়া হবে। এভাবে জাতিসংঘের শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করা কোন দেশের জন্য সম্ভব হবে না।[৬৩]

## রাজনৈতিক বিশ্বায়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

রাজনৈতিক বিশ্বায়নের আসল উদ্দেশ্য গোটা বিশ্বের ওপর মার্কিন ও ইহুদী ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু এছাড়াও রাজনৈতিক বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে তাদের আরো কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এখন সেটাকে গ্লোবালাইজেশনের প্রতিক্রিয়াও নাম দেওয়া যেতে পারে, আবার তার উদ্দেশ্যও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। নিম্নে রাজনৈতিক বিশ্বায়নের কিছু প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হলোঃ

(১) আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বেলায় এটা নিশ্চিত যে, দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র ও জনগণের ওপর জোরপূর্বক পশ্চিমা পলিসি চাপিয়ে দেওয়া হবে। আমেরিকা ও তার রাজনৈতিক "কুন ফায়াকুন" (হও, সুতরাং হয়ে যাবে)- এর মত শক্তির অধিকারী ইহুদী শক্তির স্বার্থের খাতিরে সকল দেশের রাজনৈতিক পলিসি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ অধিকার এই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। চায় তা সে সমস্ত দেশের জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাদের ধর্ম বিশ্বাস আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের পলিসির সাথে সংঘর্ষপূর্ণই হোক না কেন? ইহুদী ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার প্রভাবেই পেনসেলভেনিয়া ব্যাংকের চেয়ারম্যান জোনবুটিং-এর একথা বলার দুঃসাহস হয়েছিল যে, বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে আমরাই সিদ্ধান্ত নেব, কার বেঁচে থাকার অধিকার আছে আর কার মরে যাওয়া উচিত।[৬৪]

---

৬২. NEW YORK TIMES, ৪/৮/১৯৯৯ সৌজন্যে, মাগরিবী মিডিয়া।

৬৩. মার্কিন পররাষ্ট্র বিষয়ে প্রকাশিত বুলেটিন ৭২৭৭ সেপ্টেম্বর- ১৯৬১ সৌজন্যে, মাগরিবী মিডিয়া।

৬৪. দিরাসাতু হাওলাল বু'দিস্তারীখিল মুআসির লিমাফহুমিল আওলামাহ, পৃ. ৮০, প্রকাশ-২০০ইং।

প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রে মার্কিন জায়নবাদী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বের যে কোন কোণায় চাইলে যুদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার থাকবে এবং যেখানে চাইবে নিজের সৈন্য প্রেরণ করতে পারবে। যে রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র তথা আমেরিকার বলয়ে আসবে না তার ভবিষ্যতের ফয়সালা এই মার্কিন জায়নবাদী প্রতিষ্ঠানই করবে। প্রথম কথা হচ্ছে আমেরিকার এই অমানবিক ও অনৈতিক কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্টতার জন্য কোন বৈধতা প্রমান করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে আমেরিকার নেতৃত্বে পরিচালিত সকল আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব আন্ত র্জাতিক রাষ্ট্রের আইনের অধীনে হবে। আর গোটা দুনিয়া এই দর্শনকে সঠিক মনে করে মজলুম দেশের সঙ্গ দেওয়ার পরিবর্তে অত্যাচারী ও নিপীড়নমূলক কর্মকান্ডের সমর্থন করবে, বরং আমেরিকার ইতিহাস ও তার বর্তমান বর্বরতা দেখে মনে হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেও মার্কিন সামরিক আগ্রাসন বন্ধ হবে না। কারণ হিংস্র জানোয়ার যখন কারো রক্তের স্বাদ আস্বাদন করে ফেলে তখন তাকে ছাড়া আর তার পেটের আগুন নির্বাপিত হয় না। এটা কোন অলৌকিক কল্পকাহিনী নয়, বরং একটি বাস্তবতা, যা প্রসিদ্ধ হার্বার্ড ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিভাগের ডাইরেক্টর ও মার্কিন নীতি-নির্ধারক স্যামুয়েল হান্টিং (ইহুদী)- এর প্রবন্ধ দ্বারা স্পষ্ট হয়। এই প্রবন্ধ পত্রিকা 'ফরেন এ্যাফেয়ার্সে' ১৯৯৩-এর জুন সংখ্যায় 'মার্কিন স্বার্থ ও শান্তি' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকার লেখেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পশ্চিমা জগতের এক নতুন শত্রুর প্রয়োজন ছিল। কারণ যুদ্ধ কখনো থেমে থাকবে না। চায় হাতিয়ার ও অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যাক কিংবা সকল দেশের মাঝে চুক্তি হয়ে যাক। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, সামরিক যুদ্ধ হবে না, কিন্তু পশ্চিমা যার নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা এবং অপরপক্ষ (সেটা ইসলামী বিশ্বও হতে পারে এবং চীনও হতে পারে) এর মধ্যে ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক যুদ্ধ চলতে থাকবে।"[৬৫]

২) আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বেলায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক পার্টি ও দলের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হ্রাস করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হবে এবং তাদেরকে বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় ও শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। নিম্নবর্ণিত সংগঠনগুলো বিশ্বায়নের নেতৃত্বের শীর্ষ তালিকায় রয়েছেঃ

---

৬৫. তাহাদ্দিয়াতুন- নিযামিল আলমি লাদীদ (প্রবন্ধ), ড. ইমাদুদ্দীন খলীল। ড. সালেহ আর-রাকাব প্রণীত আল-আওলামাহ-এর সৌজন্যে।

১) আমেরিকা মহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর সংগঠন ২। আফ্রিকী ঐক্য ৩। আরব লীগ ৪। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ইত্যাদি।

অথচ এই সংগঠনগুলো চলমান বিশ্ব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে এমন কোন অবস্থান গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে যা মার্কিন জায়নবাদী শক্তির পরিকল্পনার মুখে লাগাম কষতে পারে। তবে ভবিষ্যতে এই সংগঠনগুলো মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এজন্য আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র এই সংগঠনগুলো ও এ ধরনের আরো যত সংগঠন রয়েছে সবকটিকে বিশ্ব মানচিত্র হতে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে।[৬৬]

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র জর্জ বুশ ইহুদী-খৃস্ট ইউনিয়নের এক অধিবেশনে ২০০২ সালের জানুয়ারীতে এক বক্তৃতাকালে বলেন, যে সকল আন্তর্জাতিক সংগঠন মার্কিন ও ইসলাইলী স্বার্থের বিরোধিতা করবে, আমরা তাদের কোন পরওয়া করব না চায় তা জাতিসংঘ হোক, আফ্রিকান ইউনিয়ন হোক, আরব লীগ হোক (যার ব্যাপারে আমার মত হলো, এটাকে এখনই ভেঙ্গে ফেলা জরুরী) রেডক্রসের আন্ত র্জাতিক সংগঠন হোক কিংবা অন্যান্য ইসলামী সংগঠন হোক।[৬৭]

৩) ইসলামী বিশ্বের শক্তিশালী নেতৃত্বকে হটিয়ে দুর্বল ও অযোগ্য নেতৃত্বকে ক্ষমতার মসনদে বসানো এবং মার্কিন স্বার্থের পক্ষে কর্মরত সকল নেতৃত্বকে শক্তিশালী ও রক্ষা করাও রাজনৈতিক বিশ্বায়নের কর্মকৌশলের অন্তর্ভূক্ত। কারণ ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব যদি পাশ্চাত্যের গোলামী করে তাহলে সেখানকার জনগণ ও তাদের সকল সম্পদের ওপর আমেরিকারই দখল থাকবে এবং ইসলামী বিশ্বের হৃৎপিন্ড যা ইহুদী জাতির জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, খুব সহজেই মার্কিন পলিসি ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে পরিপূর্ণভাবে ইহুদীদের হাতে চলে আসবে।[৬৮]

৪) আঞ্চলিক ক্ষমতাকে দুর্বল করা, তার প্রভাব খর্ব করা কিংবা শিকড় থেকেই তাকে নির্মূল করে দেওয়া এবং জনগণের হৃদয় হতে জাতীয়তার চেতনা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেওয়াও বিশ্বায়নের এজেন্ডার অন্তর্ভূক্ত।

---

[৬৬]. নযামুন আলমিয়ূন আম সায়তারাতুন এস্তেমারিয়াতুন জাদীদাতুন, ড. জামাল ক্বন্নার- মাসিক- আল মুস্তাকবিলুল আরাবী, সংখ্যা-১৮০ ফেব্রা-১৯৯৪।

[৬৭]. আল- আওলামাহ, ড. সালেহ আর- রাকাব, পৃ. ২৩।

[৬৮]. প্রাগুক্ত।

গ্লোবালাইজেশন এমন একটি ব্যবস্থা যা রাষ্ট্র, সরকার, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার ওপর আক্রমণ করে এবং এগুলোর পরিবর্তে মানবতার স্লোগান দেয়। বিশ্বায়নের দৃষ্টিতে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা কোন জিনিস নয়, বরং এটা মানব সমাজের মাঝে অনৈক্য ও পার্থক্য করার একটি মাধ্যম। মানব হিসেবে সবাই বরাবর ও সমান। কারণ তার জীবন পদ্ধতি, চাল-চলনের ধরণ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি, এমন কি তার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার মধ্যেও সামঞ্জস্য হওয়া উচিত, এ জন্য বিশ্বায়ন বহুজাতিক কোম্পানী ও প্রচার মাধ্যমের সামনে সকল সীমান্ত খুলে দেওয়া এবং সকল প্রকারের বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূর করার সমর্থন করে। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুনিয়া শুধু ব্যবস্থাপনার দিক দিয়েই সীমান্তে ভাগ হয়ে থাকবে। এছাড়া অন্য কোন জিনিস এক দেশকে অন্য দেশ হতে পৃথক করতে পারবে না। এজন্য বহুজাতিক কোম্পানী ও প্রচার মাধ্যমের বিনা অনুমতিতে যে কোন স্থানে তার কারবার ও কর্মতৎপরতা চালানোর অনুমতি থাকবে।

## আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা যদিও ইহুদী মস্তিষ্কের উদ্ভাবন, যা সর্বপ্রথম ব্রাসেলস সম্মেলনের (১৮৯৭)পর জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। উক্ত সম্মেলনে জায়নবাদী চিন্তাবিদরা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কয়েকটি প্রস্তাব পাস করেছিল। কিন্তু জায়নবাদীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পূর্ণতা দানের জন্য মার্কিন ভূ-খন্ডকে সবচেয়ে বেশী উর্বর মনে করে। কারণ ইহুদীবাদী শক্তি যারা সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথে ধাবমান, কয়েক দশক ধরে আমেরিকা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। যাদেরকে আমেরিকার বিনির্মাতা ও প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়, তারা মূলত নিজেরাই সাম্রাজ্যবাদী মস্তিষ্কধারী ছিল। এজন্য ইহুদীরা তাদের সংকল্প ও পরিকল্পনা পূর্ণতা দানের জন্য মার্কিন রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে নির্বাচন করে। তারা আজ পর্যন্ত তাদের ক্রীড়নক হয়ে আছে। ইহুদীরা অত্যন্ত ধূর্ততা ও চতুরতার সাথে তাদের সংকল্প ও পরিকল্পনাকে আমেরিকার সংকল্প ও পরিকল্পনা বানিয়ে দিয়েছে যাতে আমেরিকান জাতি সে সকল পরিকল্পনা ও সংকল্পকে নিজেদের মনে করে হৃদয়-মন দিয়ে তা বাস্তবায়নের প্রয়াস চালায় এবং ভবিষ্যতে যেন তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে কেউ একথা বলে প্রত্যাখ্যান না করে যে, "এতো ইহুদীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য"। সুতরাং ইহুদীবাদী শক্তি দীর্ঘদিন ধরে যে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে আসছিল, আজ আমেরিকাও তা দেখতে শুরু করেছে। অপর

দিকে ইহুদীরা আমেরিকার অভ্যন্তরে এমন ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছে যে, কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাদের বিরোধিতা করে ক্ষমতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, ক্ষমতার মসনদ পর্যন্ত পৌঁছার স্বপ্ন দেখাও একটি "অন্যায়ে" পরিণত হয়। মার্কিন রাজনীতিতে ইহুদীদের এ ধরনের শক্তিশালী ও সক্রিয় হওয়ার কারণেই আমেরিকার কংগ্রেসে যে সব প্রস্তাব পাস হয়, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব, তা ইহুদীদের সন্তুষ্টির জন্য পাস হয়। কোন কংগ্রেসম্যানের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা কিংবা প্রতিবাদ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাহলে তার রাজনৈতিক জীবনের অপমৃত্যু নিশ্চিত।

এমনিভাবে বহি:রাজনীতিতেও ইহুদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চরমভাবে বেড়ে গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক সকল ফয়সালা ইহুদী ষড়যন্ত্র অনুসারেই করে থাকেন। ইরাককে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ধ্বংস করা হয়েছে। কারণ সে ইসরাইলের জন্য হুমকি হতে পারে। সিরিয়ার সাথে আমেরিকার মতানৈক্যের কারণ সিরিয়ার ইসরাইলবিরোধী মনোভাব এবং তা ইসরাইলের জন্য হুমকি, এমনিভাবে সিরিয়া ইসরাইলী বর্বরতাকেও প্রত্যাখ্যান করে। আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে নির্মূল করার জন্য ১১ সেপ্টেম্বরের নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। কারণ তালেবানরা মার্কিন আধিপত্য ও মোড়লীপনাকে অস্বীকার করে। এই ট্রাজেডি সৃষ্টির জন্যই গভীর ষড়যন্ত্র ও নানা পরিকল্পনা তৈরী করা হয়-যা পরবর্তীতে মার্কিন গবেষক ও চিন্তাবিদরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন।

পরবর্তীতে ইহুদী ইশারায় আফগানিস্তানের ওপর আগ্রাসন চালানোর বৈধতা প্রমান করার জন্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ওপর হামলা চালানো হয়। আর এর দায়-দায়িত্ব উসামা বিন লাদেন ও তার আল-কায়দা নেটওয়ার্কের ঘাড়ে চাপানো হয়। অত:পর এটাকে অজুহাত বানিয়ে তারা আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারের ওপর আগ্রাসন চালায়। এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিস্কার যে, ঐ দিন কোন ইহুদীই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কাজে যায়নি। তাহলে এঘটনা দ্বারা কি প্রমানিত হয়?

আমেরিকা ও তার জনগণের মধ্যে এই আগ্রাসী বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে জায়নবাদী গোষ্ঠী তাদের ঘৃণ্য সংকল্পকে বাস্তবতার লেবাস পরানোর জন্য মার্কিন ভূ-খন্ড নির্বাচন করে। সেখান থেকে তারা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাস্তা সুগম করার কাজে লেগে যায়। অল্প দিনের মাথায় তারা আমেরিকার রাজনীতি ও

অর্থনীতিতে এক মহাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, আমেরিকা তার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই সাম্রাজ্যবাদকে স্বীয় মুখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। মার্কিন ইতিহাস জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার, অধিকার হরণ ও মজলুম জাতির ওপর বর্বর আগ্রাসনের কিস্‌সা-কাহিনীও ঘটনায় ভরপুর। আমেরিকার এই কালো অধ্যায় লিখতে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে অনেকটা পশ্চিমা চিন্তাবিদ মাইকেল বিগনান মার্ডেন্ট পূরণ করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে মার্কিন ইতিহাসের এই কালো অধ্যায়কে উন্মোচিত করার সুন্দর ও সফল প্রচেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থ ড. হামেদ ফরযাত "স্বৈরাচারী আমেরিকা ও তার আগ্রাসী নেতৃত্ব" নামে আরবীতে অনুবাদ করেছেন। আমরা নিচে উক্ত গ্রন্থের আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে, আমেরিকা অতীতে কোথায় তার বর্বরতা প্রদর্শন করেছে এবং তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির ভিত্তিতে কোন্ কোন্ দেশকে তারা কলোনী বানিয়েছে?

## মার্কিন বর্বরতা ও আগ্রাসন

১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেখানকার শাসকরা এই রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা শুরু করে। মার্কিন ভূ-খন্ডের প্রকৃত নাগরিক (রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে অঞ্চল ছিনিয়ে নেওয়া, তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করা এবং স্বয়ং তাদের গণহত্যার পর মার্কিন রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে। এফ. হেনরী লেখেন, "মার্কিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরই "রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে তাদের অঞ্চল ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে তাদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। ১৯১০- এর জরিপ মতে, সে সময় তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার, অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সময় ১৭৭৬ সালে তাদের সংখ্যা ছিল ৬ লাখ। তাদের অধিকাংশ জনগণ দুর্ভিক্ষকবলিত এলাকা ও মরুভূমিতে জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল। কারণ তাদের সকল জিনিস ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

পরিশেষে ১৯২৪ সালে তাদেরকে এই শর্তের ভিত্তিতে মার্কিন নাগরিকত্ব দেওয়া হয় যে, তারা তাদের অতীতকে ভুলে যাবে এবং এমন সব আচার-অনুষ্ঠান থেকে হাত গুটিয়ে নেবে যা তাদের 'রেডইণ্ডিয়ান' হওয়ার নিদর্শন বহন করে।

ইউরোপীয়রা যে লাখ লাখ আফ্রিকান নাগরিককে গোলাম বানিয়ে সাথে করে নিয়ে এসেছিল তাদের ব্যাপারেও রয়েছে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক কাহিনী। বছরের পর বছর ধরে তারা গোলামীর জীবন যাপন করেছে। অত:পর স্বাধীনতা লাভের পরও তারা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার ছিল। এমন কি এখনো পর্যন্ত তারা সেই বৈষম্যের শিকার, যদিও অতীতের তুলনায় তা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

কিন্তু যেহেতু এ সমস্ত লোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসল নাগরিক নয়, এজন্য তাদের বিস্তারিত আলোচনাও এখানে করা হচ্ছে না।

মোটকথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত নাগরিকদের কাছ থেকে তাদের মাতৃভূমি ছিনিয়ে নিয়ে বর্তমান মার্কিন স্টেট ভার্জিনিয়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরই তাদের শাসকবর্গ স্বীয় সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের প্রকাশ্যনীতি প্রদর্শন শুরু করে। সর্বপ্রথম তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন সম্প্রসারিত করার দিকে মনোনিবেশ করে। তারা "ভার্জিনিয়া" স্টেটের আশপাশের আঞ্চল দখল করতে শুরু করে। মার্কিন শাসকদের স্বপ্ন ছিল তারা প্রাচ্যের আটলান্টিক মহাসাগর হতে বর্তমান আমেরিকার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত অঞ্চলকে নিজেদের বলয়ে নিয়ে আসবে, যাতে তারা একটি বিশাল আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

জ্যাক বোর্টস স্বীয় গ্রন্থে লেখেন, "ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে আমেরিকার সম্প্রসারণবাদী মনোভাব থাক বা না থাক কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব অবশ্যই ছিল। ১৮০৩ সালে তারা লোজিয়ানা অঞ্চলে সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উড্ডীন করে।

১৮১০ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার দখলদারিত্বের চাদর আরো সম্প্রসারণ করে এবং পশ্চিম ফ্লোরিডাকেও কব্জা করে নেয়।

## অধিকৃত মেক্সিকো

মেক্সিকো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তের সাথে মিলিত একটি দেশ। সেখানে ১৮২৩ সালে রাজতন্ত্র নির্মূল হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান মার্কিন রাজ্য টেক্সাস অঞ্চল যা সে সময় মেক্সিকোর একটি অংশ ছিল, সেটি মার্কিন সরকারের জন্য বড় গুরুত্বপূর্ণ ছিল, অথচ ১৮১৯ সালে "উন্স"

চুক্তির অধীনে এই অঞ্চলকে মেক্সিকোর একটি অটুট ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮২১ সালেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ স্টিফেনের এখানে আসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারা এখানে বসবাস করা শুরু করে এবং স্থানীয় লোকদের ওপর জয় লাভ করে। ফলে তারা সেখানে এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করার অনুপ্রেরণা পায়, যে রাষ্ট্র স্থানীয় বাসিন্দাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছিল, তাদের ওপর নানা রকমের জুলুম-অত্যাচার করেছিল। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা মেক্সিকোর সরকারের অধীনে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়।

জনগণের অস্থিরতা একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল। কিন্তু ১৮৩৬ সালে গণহত্যার মাধ্যমে সম্ভাব্য গণবিপ্লবকে দমিয়ে দেওয়া হয় এবং এ বছরই স্বাধীন গণতান্ত্রিক টেক্সাসের ঘোষণা দেওয়া হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন সাথে সাথে এই ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানান। নয় বছর পর টেক্সাসের শাসকগোষ্ঠীর অভিলাষ অনুযায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট টেলারের শাসনকালে এই অঞ্চলকে মার্কিন প্রদেশ ঘোষণা দেওয়া হয়। এভাবে মেক্সিকোর একটি বিশাল অঞ্চল চিরতরে তাদের হাত থেকে বের হয়ে মার্কিন বর্বরতার শিকার হয়। ১৮৪৮ সাল আসতে না আসতেই টেক্সাস ছাড়াও বর্তমান আমেরিকার অন্য রাজ্যগুলোও তদানীন্তন মেক্সিকোর অঞ্চল ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা ইত্যাদির ওপরও মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সীমিত অনুমান মতে, মেক্সিকো এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হয়ে গেছে। মার্কিন বর্বরতার ফলে প্রসিদ্ধ পশ্চিমা লেখক মেইল ভিল বলতে বাধ্য হন, "স্বাধীন আমেরিকা এমন একটি আত্মম্ভরিতা পূজারী দেশ যার কোন মূলনীতি নেই। তার ধরণ একটি চোর ও ডাকাতের মত, যার চাহিদা সীমাহীন। বাহ্যত আমেরিকা সভ্য হওয়ার দাবী করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা একটি জংলী বর্বর দেশ।

## দেশে দেশে মার্কিন আগ্রাসন

'রেড ইন্ডিয়ানস' ও মেক্সিকোর বিভিন্ন ভূখন্ড দখল করার পর মার্কিন ভৌগোলিক আয়তন অত্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। কিন্তু সম্প্রসারণবাদী অভিলাষের সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ তখনো অব্যাহতি ছিল, যা থামার কোন লক্ষণ ছিল না। ধারাবাহিক যুদ্ধ করতে থাকা মার্কিন শাসকদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ১৮৫৪ সালে আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুলবাস ব্রি'র নেতৃত্বে জাপান পৌঁছে। সেখানে তারা জাপানীদেরকে তাদের অঞ্চল 'আদূ' হতে বের হয়ে যেতে বাধ্য

করে। এই অঞ্চল থেকেই বহির্দেশে মার্কিন আগ্রাসনের সূত্রপাত ঘটে। সংক্ষেপেও যদি মার্কিন আগ্রাসনের বর্ণনা করা হয়, তবুও সে সকল অঞ্চলের এক লম্বা চওড়া ফিরিস্তি পাওয়া যাবে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নৃশংসভাবে সামরিক বর্বরতা প্রদর্শন করেছে এবং নিষ্পাপ প্রাণের রক্তপান করে মার্কিন শাসকরা স্বীয় পিপাসা নিবারণ করেছে। ১৮৯৮ সালে তারা ফিলিপাইন ও কিউবায় হামলা চালায়। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিলেন, এখন কিউবার আমেরিকার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া উচিত।

সে বছরই হাওয়াই, পোরটারিকা ও গাওয়াম উপদ্বীপের ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পানামার ক্ষমতা দখলের জন্য সেখানে হস্তক্ষেপ করে। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয়বার কিউবার ওপর আগ্রাসন চালায়। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে নিকারাগুয়া নামক অঞ্চল মার্কিন বর্বতার শিকার হয়। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে হাইতিতে আগ্রাসন চালায়। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে ইউরোপের যুদ্ধে আমেরিকা অংশ নেয়। এ বছরই মার্কিন সৈন্য নিজেদের তাবেদার সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কিউবাতে প্রবেশ করে। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে মধ্যআমেরিকান রাষ্ট্র সানডেমাঙ্গোর ওপর আক্রমণ করে। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে হাইতির ওপর দ্বিতীয়বার আগ্রাসন চালায়। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে আমেরিকা স্মরণকালের সবচেয়ে নৃশংস গণহত্যা চালায় এবং হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র প্রতিষ্ঠা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল নাশকতামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মার্কিনবিরোধী সরকারের পতন ঘটানো। ১৯৫০ খৃস্টাব্দে কোরিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে মার্কিন সৈন্য সিআইএ'র সহায়তায় গুয়েতেমালায় প্রবেশ করে। ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে লেবাননে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করা হয়। ১৯৬১ খৃস্টাব্দে কিউবার ওপর দ্বিতীবারেরমত আগ্রাসনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ বছরই ভিয়েতনাম যুদ্ধের (যা একাটানা ১৯৭১ পর্যন্ত চলে) ভূমিকাস্বরূপ মার্কিন সামরিক উপদেষ্টাদেরকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ১৯৬২ খৃস্টাব্দে জামাইকাকে টার্গেট বানায়। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে কম্বোডিয়ার পালা আসে। ১৯৮২ খৃস্টাব্দে লেবাননে মার্কিন সৈন্য প্রবেশ করে। ১৯৮৩ খৃস্টাব্দে গার্নাডা উপদ্বীপ মার্কিন বর্বরতার শিকার হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই দ্বীপ তারা কব্জা করে নেয়। ১৯৮৬ খৃস্টাব্দে লিবিয়ার পালা আসে। ১৯৮৯ খৃস্টাব্দে পানামার ওপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ চালায়। ১৯৯১ খৃস্টাব্দে

ইরাককে ধ্বংস করার জন্য সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করে। ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগনের ওপর হামলার অজুহাতে আফগানিস্তানের ওপর ইতিহাসের নৃশংস আগ্রাসন চালায় এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র জর্জ বুশ সুস্পষ্ট ভাষায় একে ক্রুসেড আখ্যা দেন। অত:পর ২০০৩- এর ১৯ মার্চ পুনরায় ইরাক মার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়। না জানি সন্ত্রাস ও জুলুম-অত্যাচারের এই ধারাবাহিকতা আর কতদিন চলবে এবং কোন্ কোন্ দেশ মার্কিন তাবেদারী ও গোলামী গ্রহণ না করার কারণে তার রক্তচক্ষুর শিকার হবে! এই আগ্রাসী দেশের কালো ইতিহাসে কোন্ দেশের নাম সংযোজন হবে? এখন কিছু বলা যায় না, বাহ্যত মনে হচ্ছে, আমেরিকার রক্তে হোলিখেলা এখনো বাকী আছে।[৬৯]

## আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী

জুলুম ও অত্যাচারের ইতিহাস নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন ফেরাউন ও নমরুদের নাম অবশ্যই আসে। সাথে সাথে তাদের অহংকার ও অহমিকার নিন্দাও করা হয়। এমনিভাবে যাকে পাশ্চাত্য বিশ্ব 'সভ্য যুগ' আখ্যা দিয়েছে, এ যুগও মার্কিন আগ্রাসন, বর্বরতা ও সন্ত্রাসের ঘটনা দ্বারা ভরপুর। স্বাভাবিকভাবেই এই সন্ত্রাসের সাথে অহংকার, অহমিকা, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যেরও সংমিশ্রণ রয়েছে। যা জালেম, অত্যাচারী এবং বিশ্বকে অধীনস্থ করার অভিলাষীদের বৈশিষ্ট্য। মার্কিন চিন্তাবিদ ও পন্ডিতদের কথা ও লেখনী দ্বারা এর অনুমান সহজেই করা যায়। মার্কিন ঐতিহাসিক দানিয়াল বোরেষ্টিন স্বীয় গ্রন্থে লেখেন, মানবেতিহাসে মার্কিন জাতিই একমাত্র জাতি, যাদের সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস যে, তারাই সঠিক পথের ওপর আছে এবং আল্লাহর সাহায্য তাদের পক্ষে আছে।

উইলিয়াম ইস্তোগাটন বলেন, মার্কিন জাতি একটি নির্বাচিত ও পছন্দনীয় জাতি। আল্লাহ পাক বিশেষ যত্নসহকারে তাদের সৃষ্টি করেছেন। তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন মানুষ গমের দানা চালনির মাধ্যমে পরিস্কার করে। ফলে ভাল বীজগুলো থেকে যায় আর খারাপ বীজগুলো নিচে পড়ে যায়। প্রকাশ থাকে, ভাল দানা মরুভূমিতেও উৎপন্ন হয়। ঠিক এই অবস্থা মার্কিন জাতির, যে জাতি পরিত্যক্ত

[৬৯]. আমেরিকা আল-মুস্তাবাদ্দাহ আল উলায়াতুল মুত্তাহেদাহ ওয়া সিয়াসাতুস- সায়তারাহ আলাল- আলম, পৃ. ২-৪০ ও১৬০। মাইকেল বিগনান প্রণীত, আরবী অনুবাদ ড. হামেদ করযাত দামেশ্ক।

ও অনুর্বর জমিকেও কৃষি উপযোগী বানিয়ে ফেলে। তারাই উত্তম জাতি আর বাকিগুলো অধম জাতি।

উইলিয়াম বের্ড তার ডায়েরীতে লেখেন, মার্কিন জাতির সৃষ্টিতে গোটা বিশ্বের ওপর আরোপিত একটি দায়িত্বের পূর্ণতা লাভ হয়েছে। মার্কিন জাতি একটি শরীরের মত। তারা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জাতি। একদিন এমন সময় আসবে যখন দুনিয়ার সকল মানুষ আমাদের দিকে দৌড়াবে এবং আমরাই এই দুনিয়ার কেবলা হবো।

জন ব্রেঞ্জিয়া লেখেন, মার্কিনীদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, তারা উন্নত জাতি, তারা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করেন এবং তাদের গোটা বিশ্বের আধিপত্যের ওপর তিনি সন্তুষ্ট।

ফ্রান্সিস হ্যাংসন স্বীয় গ্রন্থ New England's Planatation এর মধ্যে লেখেন, আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো আমরা লোকদেরকে দ্বীন শিখাবো। কারণ এতে কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। সুতারাং আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার হিম্মত কার হতে পারে? আমরা মনে করি আমাদের কোন ভুল হয়-ই না। কারণ আল্লাহ্ আমাদের সমর্থন করেন।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেফারসন কংগ্রেসে এক বক্তৃতাকালে বলেন, আল্লাহ্র সাহায্যেই আজ আমেরিকা একটি আইডিয়াল গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছে। এই সিংহাসন কেবল তারাই অর্জন করতে পারে যারা সেই রাস্তাকে চিহ্নিত করতে পারে, যা অন্যের জন্য অবশ্য করণীয়। আমেরিকাই গোটা বিশ্বের সকল জাতির নেতৃত্ব দেবে।[৭০]

উল্লেখিত কথা ও বাণী দ্বারা মার্কিন জাতির অহংকার, অহমিকা ও আত্মতুষ্টির অনুমান সহজেই করা যায়। এই অহংকার, অহমিকা ও আত্মতুষ্টির কারণেই তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে আগ্রাসন চালানো এবং মানব জাতিকে গোলাম ও দাস বানানোর হিম্মত করতে পারে। যে দেশের ভিত্তিই লুটপাট ও সন্ত্রাসের ওপর, তার কাছে সন্ত্রাস ও লুটপাট ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না।

আশ্চর্য বোধ হয় তাদের ওপর যারা এই বর্বরতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে নিজ চোখে দেখা সত্ত্বেও তাদের বাহ্যিক চাকচিক্যে প্রভাবিত ও মোহিত হয়ে তাদের তাহযীব-তামাদ্দুনকে আদর্শ এবং সে জাতিকে আইডিয়াল মনে করে।

---

৭০. প্রাগুক্ত : ১-৫

## আমেরিকা ও জায়নিস্ট

"খুব শিগগিরই ইসরাইলের খোদা আমাদের মধ্যে এসে যাবেন তখন আমরা ইহুদীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র দেশ গঠন করব। যারা নতুন জায়নিস্টদের বিরোধিতা করবে, তারা আমাদের দেশ থেকে চলে যাক।"

এই বাণী মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের, যারা ইহুদীদের সাথে আমেরিকার সুসম্পর্কের মূল নায়ক। জায়নিস্ট; যারা সর্বদা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে আসছে, তাদের নিকট আমেরিকার ভূ-খণ্ড সবচেয়ে উর্বর ও উপযোগী মনে হয়েছে। কারণ মার্কিন জাতিও তাদের মত সাম্রাজ্যবাদী। ইহুদীরা ভালভাবেই জানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার গোড়াপত্তনের লগ্ন থেকেই চুপ ও নীরব হয়ে বসে নেই এবং কোন বছর তাদের এমন অতিবাহিত হয়নি, যে বছর তারা বহির্দেশে আগ্রাসন ও বর্বরতার প্রমাণ পেশ করেনি। এমন দেশই তাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে পারবে। সে দেশই তাদের কামনা, বাসনা, অভিলাষ ও গোটা বিশ্বের ওপর ইজারাদারি প্রতিষ্ঠার 'নেশার' কিশতি কিনারায় পৌঁছাতে পারবে। সুতরাং জায়নিস্টরা তাদের পরিকল্পনার ফিরিস্তিতে মার্কিন ক্ষমতার উপকরণ দখল ও কব্জা করা, তাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর তালা লাগিয়ে দেওয়া, সেখাকার অর্থনীতি স্বীয় কব্জায় নিয়ে আসা এবং মার্কিন রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করাকেই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয় যাতে মার্কিন পলিসি ও ইহুদী পলিসি এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। আর আমেরিকার উন্নতি শুধু মার্কিন জাতির উন্নতিই মনে করা হবে না, বরং ইহুদী জাতির উন্নতিও মনে করা হবে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দেয় তাহলে তাকে অবশ্যই এ পর্যন্ত এনেছে ইহুদী ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদরা। অতপর মনে করতে হবে, মার্কিন নেতৃত্ব মূলত ইহুদী নেতৃত্বই। জায়নিস্টরা তাদের পুরানো স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুসন্ধানে মার্কিন ভূখণ্ডকে নির্বাচন করার সাথে সাথে অনেক পরিকল্পাও তৈরি করেছে যেগুলো বাস্তবায়ন করে তারা বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। সে সমস্ত পরিকল্পনাকে জায়নিস্ট প্রটোকল বলে।

## জায়নিস্ট প্রটোকল

ইতোপূর্বে আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি, সুইজারল্যান্ডের শহর ব্রাসেলসে ১৮৯৭ এর জুন মাসে জায়নিস্টদের প্রথম বিশ্ব সম্মেলন তাদের নেতা তিওয়ার্দা

হারাটিজেল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় ৫০-এর ঊর্ধ্বে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ৩০০ ইহুদী অংশ গ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে তারা গোটা বিশ্বকে গোলাম বানানো, আন্তর্জাতিক জায়নিস্ট রাষ্ট্র গঠন এবং ৫০ বছরের ভেতরে ফিলিস্তিন অঞ্চল দখল করার পরিকল্পনা তৈরি করে। সে সমস্ত পরিকল্পনা সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী চিন্তাবিদরা ছাড়া আর কেউ জানত না। সে পরিকল্পনাগুলো পরবর্তীতে জায়নিস্ট প্রটোকল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কিন্তু একজন ফরাসী মহিলা কোন ইহুদী চিন্তাবিদের মাধ্যমে তাদের কিছু পরিকল্পনা জেনে ফেলেছিল। সে মহিলা ১৯০১ সালে উক্ত পরিকল্পনার কথা রুশ সরকারকে জানিয়ে দেয়। রুশ সরকার সে সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে লুক্কায়িত বিপদ, ভয়াবহতা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর প্রটোকলগুলোকে অনুবাদ আকারে প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। জায়নিস্ট প্রটোকলের অনুবাদ প্রকাশ হওয়ার পর ইহুদী বিশ্বের তদানীন্তন সবচেয়ে বড় নেতা হারটিজেল খুব দুঃখিত ও ব্যথিত হন। তিনি একথা বলা ছাড়া আর থাকতে পারলেন না যে, এই সমস্ত গোপন দলীল বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই তা ব্যাপক প্রচার হয়ে যাওয়া ইহুদীদেরকে বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন করতে পারে। উল্লিখিত দলীলের মধ্যে সে সমস্ত পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ ছিল যার মাধ্যমে ইহুদীরা গোটা বিশ্বের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং জেরুজালেম ভূখণ্ডে জায়নবাদী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করতে পারে। এই ভয়াবহ ইহুদী দলীল গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে যাওয়ার পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তা প্রচারিত হয়ে যায়। সে সকল প্রটোকল সামনে আসতেই ইহুদী লবির স্বরূপ ও জায়নবাদী বর্বরতা ও বর্ণবাদ উজ্জ্বল দিবসের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। তাদের দলীলগুলো বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় লাখ লাখ কপি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু খুব দ্রুত এই কপিগুলো বাজার থেকে গায়েব হয়ে যায়। হয়ত সকল কপিই ইহুদীরা কিনে নিত এবং মানুষের হাতে পৌঁছতে দিত না কিংবা সে সমস্ত দোকান ও বাণিজ্য কেন্দ্রকে ভস্মীভূত করে দেওয়া হতো যেখানে তাদের দলীলের অনুবাদ বিক্রি হতো। এমনিভাবে অনুবাদক ও প্রকাশকদেরকেও অপহরণ করে অন্যদের জন্য শিক্ষার কারণ বানিয়ে দেওয়া হতো যাতে আর অন্য কেউ জায়নিস্ট রহস্য ও গুপ্ত খবর প্রকাশ করার সাহস না পায়। যখন ইহুদীরা তাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্ত বায়নে প্রাণপণ প্রচেষ্টা করছে এবং তারা স্বীয় লক্ষ্যের অনেক কাছে এসে গেছে,

তখন তারা গোপন দলীলগুলো বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ করতে শুরু করেছে। নিম্নে সে সমস্ত দলীল ও প্রটোকলের কিছু ধারা তুলে ধরা হলোঃ

১। মানুষের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করা একটি মহান ও পবিত্র কাজ। ইহুদীদের নির্বাচিত জামাআতই এই কাজের যোগ্যতা রাখে এবং তারাই এর বেশী হকদার।

২। স্বর্ণভাণ্ডারের মালিক জায়নিস্ট ইহুদীদের উচিত প্রচারের সকল মাধ্যম প্রেস, প্রকাশনা ও সিনেমা হলের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা।

৩। ভূ-পৃষ্ঠের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে এমন ব্যবহার ও আচরণ করা হবে, যেমন আচরণ জানোয়ারদের সাথে করা হয়। সকল ইহুদীর এই প্রচেষ্টা করা উচিত যে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বড় বড় নেতা ও রাজনীতিকরা তাদের দাবার ঘুঁটির মত হবে, যখন যেদিকে প্রয়োজন সেদিকে যেন ঘোরানো যায় এবং যখন ইচ্ছা তখন যেন হুমকি-ধমকি দিয়ে কিংবা সম্পদ, গাড়ী, ও উঁচু উঁচু পদের লোভ দেখিয়ে গোলাম বানানো যায়।

৪। স্বর্ণ শিল্প যেন ইহুদীদের হাতে থাকে। কারণ এটা সবচেয়ে উত্তম হাতিয়ার। এই হাতিয়ার জনমত গঠন, যুব সমাজকে পথভ্রষ্ট করা, বিবেক, ধর্ম, জাতীয়তা ও পারিবারিক ব্যবস্থা নির্মূল করা এবং সাম্প্রদায়িকতা, ফেতনা-ফ্যাসাদ, পথভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের উপকরণ ব্যাপক করার ক্ষেত্রে উত্তম সহায়ক হতে পারে।

৫। ইহুদীদের জন্য আমেরিকার সহায়তা করা একান্ত আবশ্যকীয়, যাতে ইউরোপকে সবক শেখানো যায় এবং তাদেরকে নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীনে রাখা যায়।

৬। ইহুদী জাতিই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও পছন্দনীয় জাতি। তারা আল্লাহ্‌র সন্তান। ইহুদী জাতি ছাড়া আর সকল জাতিগোষ্ঠী পৌত্তলিক ও কাফের। ইহুদীরাই আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয়। একমাত্র তাদের সত্ত্বাই আল্লাহ্‌র সত্ত্বা হতে সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক তাদের ইজ্জত ও সম্মান করেন এবং তাদেরকে মানবাকৃতি দান করেছেন।

৭। গোটা বিশ্বকে শাসন করার সর্বোত্তম পথ হচ্ছে উগ্রতা, শক্তি, জবরদস্তি ও সন্ত্রাসমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও পর্যালোচনায় এদের শাসন করা যাবে না।

৮। রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা মাত্র। বাস্তব সত্য নয়। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দলকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে জনগণকে নিজের দলে শামিল করা দরকার। আর ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই স্বাধীনতার এই কাল্পনিক ছবিকে কখন কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা জেনে নেওয়াই হচ্ছে কীর্তিমান ব্যক্তির কৃতিত্ব। স্বাধীনতা এমন একটি চিন্তা বা ফিকির যার কোন অস্তিত্ব নেই। বিভিন্ন অনৈক্য ও মতানৈক্যকে উস্কে দেওয়াও এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যাতে এটা একটি সামাজিক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে এবং বিভিন্ন দেশে এমন আগুন জ্বলে ওঠে যা রাষ্ট্র ও সরকারের সকল প্রভাব-প্রতিপত্তিকে নির্মূল করে দেয়।

৯। যে সকল রাষ্ট্র আমাদের অধীনে ও বলয়ে আসবে না, সে সকল রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ অনৈক্য কিংবা যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া হবে। মোট কথা, তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ও নির্মূল করে দেওয়া হবে। যতক্ষণ আমাদের নিকট সম্পদ ও প্রাচুর্যের পাহাড় থাকবে, ততক্ষণ সকল রাষ্ট্র আমাদের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য। অন্যথায় তাদেরকে নিঃশেষ ও ডুবে যাওয়া থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

১০। রাজনীতি ও চরিত্রের মাঝে দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। যে সকল শাসক নিজেকে চরিত্র ও নৈতিকতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে নিয়েছে, সে কোন সফল রাজনীতিবিদ নয়। আমরা এ ধরনের শাসকদেরকে কখনই শাসন করার সুযোগ দেব না।

১১। শাসনকার্য যদি চালাতে হয় তা হলে ষড়যন্ত্র, ধোঁকা, প্রবঞ্চনা, চালাকি, শঠতা ও লোক দেখানোর মাধ্যমেই করতে হবে। কারণ নিষ্ঠা ও আমানতের মত গুণাবলী রাজনীতির ময়দানে একেবারে অকেজো ও গৌণ।

১২। আমাদের সত্য শক্তির মধ্যে নিহিত। সত্য কথা বলা একটি চিন্তা ও ভাবনা যার কোন ভিত্তি নেই।

১৩। উদ্দেশ্য সকল প্রকার উপকরণকে সঠিক ও বৈধ বানিয়ে দেয়। আমাদের উচিত, আমাদের দৃষ্টি কেবল সে সমস্ত বিষয়ের দিকেই হবে, যা ইহুদী জাতির জন্য উপকারী হবে।

১৪। উগ্রতা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার সকল উপায়-উপকরণ আমাদের প্রতীক হবে। রাজনীতির ময়দানে বিজয় ও সাফল্যই আমাদের প্রকৃত শক্তি, আর উগ্রতা এই শক্তির ভিত্তি। সর্বোত্তম উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শুধু অনিষ্টই একটি মাধ্যম হতে

পারে। আমরা আমাদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য ধোঁকা ও প্রতারণা দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনই সংশয়ের শিকার হব না।

১৫। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের মূলনীতি ও পথ-পদ্ধতি এমন উপায়-উপকরণ, যেগুলোকে আমরা স্বীয় শক্তি প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করি। আমরা অবশ্যই সে সকল সরকার ও শাসকের ওপর বিজয় লাভ করব যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ। প্রজ্ঞার দাবীদার মূর্খ (অ-ইহুদী) জাতিগোষ্ঠীদের জেনে রাখা উচিত ক্ষমতা একটি অন্ধ শক্তি। ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া তেমনিই সহজ যেমন হাত হতে হাত মোজা খুলে নেওয়া সহজ।

১৬। আমরা সীমাহীন শক্তিশালী। গোটা বিশ্বকে আমাদের ওপরই ভরসা ও নির্ভর করা উচিত এবং আমাদের দিকেই ধাবিত হওয়া উচিত। কোন দেশ একটি ছোট-খাটো চুক্তিও যেন আমাদের হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতা ছাড়া করতে না পারে।

১৭। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মূর্খদের (অ-ইহুদী) নবাবী শাসন নির্মূল হয়ে গেছে। এখন আমাদের কোন চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য নবাবরা জমি ও উৎপাদনের মালিক হওয়ার কারণে আজও তারা আমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। কারণ স্বতন্ত্র জীবন-উপকরণ (যমীন) ও তৎসঙ্গে উৎপাদন তাদেরই হাতে আছে। এজন্য নবাবদেরকে তাদের জমি ও সহায়-সম্পদ থেকে বেদখল করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে কোন মূল্যে এটা আমাদের করতে হবে। সাথে সাথে আমাদেরকে শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর যতদূর সম্ভব আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়ে তা আমাদের কব্জায় নিয়ে আসতে হবে। নবাবদের থেকে জমি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে আমরা শিল্পের রাস্তায় যমীনে লুক্কায়িত সকল সম্পদ চুষে নেব। এভাবে বিনিয়োগকৃত গোটা বিশ্বের সকল ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য নিজে নিজেই আমাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।

১৮। ফেতনা-ফ্যাসাদ ও শত্রুতা প্রসার করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। আমাদের উচিত, আমরা প্রত্যেকে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেব, যে আমাদের রাস্তায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে চায়, হোক তা বিশ্বযুদ্ধ! আমরা উগ্রতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করব। যদি বিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে এক

প্লাটফরমে খাড়া হয় তখন আমরা মার্কিন তোপের মাধ্যমে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেব।

১৯। শত্রুর মোকাবেলার জন্য সকল উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম গ্রহণ করতে হবে। আমরা আইনের সুন্দর সুন্দর চিত্তাকর্ষক ধারা তৈরি করব এবং চিরন্তন ধারায় সে সমস্ত আইন-কানুন বাস্তবায়ন করব যাতে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এই সকল আইন চরিত্র ও নৈতিকতার মাপকাঠি এবং প্রকৃতি ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আমাদের সরকার সভ্য জীবনের সকল শক্তি দ্বারা সজ্জিত হবে। এজন্যে প্রকাশক, উকিল, রাজনীতিবিদ ও উপদেষ্টাদের সাহায্য নেওয়া জরুরী।

আমরা আমাদের সরকারকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অর্থনীতিবিদদের একটি বিশাল ও পূর্ণাঙ্গ বাহিনী সরবরাহ করব।[৭১] জায়নিস্ট প্রটোকলের এই সামান্য কিছু নমুনা যা প্রায় এক'শ বছর পূর্বে জনসমক্ষে এসেছিল আর তখন থেকেই আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই সকল প্রটোকলে জায়নিস্টরা প্রত্যেকে ঐ ব্যক্তিকে শায়েস্তা করার অঙ্গীকার করেছে, যে তাদের তাঁবেদারী করা হতে ঘাড় ফিরিয়ে নেবে এবং স্বাধীন রীতি-নীতি গ্রহণ করবে। এ সকল প্রটোকল ও প্রস্তাবাবলী তাদের ভণ্ডামী ও নীতি-নৈতিকতাহীন রাজনীতির পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। এ দ্বারা ইহুদীদের সংকীর্ণ মনোভাব নীতি-নৈতিকতাহীনতা, অসভ্য মানসিকতা ও গোটা বিশ্বের ওপর শাসনকার্য চালানোর অভিলাষ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাস্তবতা এই যে, আজকাল বিশ্ব মানচিত্রে যা কিছুই সংঘটিত হচ্ছে তা জায়নিস্ট প্রটোকল বাস্ত বায়নেরই ফলাফল। ইহুদীরা তাদের মুরুব্বী শাসক ও বুদ্ধিজীবীদের রচিত সে সকল প্রটোকলকে বুকে লাগিয়ে গোপনে অগ্রসর হচ্ছে। দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে একটানা পরিশ্রমের পর আজ তারা স্বীয় লক্ষ্যের সন্নিকটে পৌঁছে গেছে। গোটা বিশ্বের সকল রাজনৈতিক নেতা আজ তাদের নিকট দাবার গুটির মত। স্বর্ণ শিল্পের ওপর তাদের পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমের ওপর তাদের পূর্ণ ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

---

[৭১]. বোরোতূকোলাতু হুকামা-সাইয়ূন, জাযূরুল আওলামাহ ওয়াল মুআমারাতুস-সাইয়ূনিমাহ আলাল আলম আকরাম আব্দুর রাজ্জাক আল-মাশহাদীনী সৌজন্যে পাক্ষিক আর-রায়েদ লক্ষৌ, ২৮ সংখ্যা, ১৪২৪।

একটি বিশেষ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, মার্কিন পশ্চিমা মিডিয়ার ৯০ শতাংশ ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। মার্কিন প্রসিদ্ধ দৈনিক 'নিউ ইয়র্ক টাইম'ও ইহুদীদের মালিকানাধীন। যার অধীনে ৯টি দৈনিক, ৯টি মাসিক, ৪টি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, ২টি রেডিও স্টেশন ৩টি ছাপাখানা রয়েছে। কানাডার কাগজ প্রস্তুতকারী ৩টি বড় বড় কোম্পানীর মধ্যে ইহুদীদের সবচেয়ে বেশী অংশীদারিত্ব রয়েছে। এমনিভাবে প্রসিদ্ধ জায়নিস্ট পত্রিকা ষ্ট্রিট জার্নাল ও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ আন্ত র্জাতিক পত্রিকা টাইম ম্যাগাজিন ও নিউজ উইকও তাদের নিয়ন্ত্রণে। শুধু টাইম ম্যাগাজিনই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ৪০ মিলিয়নেরও বেশী প্রচারিত হয়। উপরন্তু ৫০০ সংবাদ পরিবেশন সংস্থাও তাদের মালিকানায় রয়েছে।[৭২]

এই রিপোর্ট দ্বারা ভালভাবেই অনুমান করা যায় যে, ইহুদী জাতি গোটা বিশ্বের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করার স্বীয় স্বপ্ন পূরণ করার জন্য তাদের নেতা ও মুরুব্বীদের প্রস্তাবের ওপর কি পরিমাণ সচেতনতার সাথে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যদি বলা হয়, তারা আজ স্বীয় লক্ষ্যের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে ভুল হবে না।

## আমেরিকার ওপর জায়নবাদীদের আধিপত্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণা দেখে ইহুদীরা বুঝে ফেলেছিল যে, এই দেশ ভবিষ্যতে বিশাল শক্তির অধিকারী হবে। এজন্য জায়নিস্ট নেতৃবর্গ তাদের প্রটোকলে আমেরিকামুখী হওয়া এবং সেখানে স্বীয় থাবা বিস্তারের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এরপর হতেই ইহুদীরা আমেরিকামুখী হওয়া এবং সেখানের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা বিশাল উন্নতি করেছে, এমন কি তাদের কোম্পানীগুলো মার্কিন অর্থনীতির মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছে এবং দেখতে দেখতেই মার্কিন রাজনীতিতে ইহুদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তাদের মর্জি ছাড়া মার্কিন কংগ্রেসে কোন বিল পাস হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ইহুদী ইজারাদারীর অনুমান এ দ্বারাই করা যেতে পারে যে, মার্কিন রাজনীতিতে বর্তমানে দুটি পার্টি সক্রিয় ও কর্মতৎপর।

[৭২]. মাসিক আল-আলম- আল-ইসলামী সংখ্যা ১৭৪১, ১৩ই সফর ১৪২৩ হিঃ, হুসাইন মোহাম্মদ আলীর রিপোর্ট"।

১. রিপাবলিকান পার্টি, ২. ডেমোক্রেটিক পার্টি। এই দুটি পার্টি প্রকৃতপক্ষে এককালে একই ছিল। সেই সময় এই পার্টিকে ডেমোক্রেট রিপাবলিকান পার্টি বলা হতো। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম প্রেসিডেন্টের শাসনামলে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত বাসিন্দাদের গোলামী ও দাসত্বের সমস্যাকে কেন্দ্র করে কিছু নেতা কর্মী এই পার্টি হতে আলাদা হয়ে যায় এবং তারা পরবর্তীতে রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি পার্টি গঠন করে। এই পার্টির পলিসি ও অবস্থান ছিল মার্কিন সমাজ থেকে দাসপ্রথাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেওয়া। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটিক পার্টির পলিসি ছিল এর উল্টো। তারা মার্কিন সমাজে আফ্রিকার বাসিন্দাদের নিয়মতান্ত্রিক দাস বানিয়ে রাখার পক্ষে ছিল।

অত:পর রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে ইহুদী ব্যবসায়ীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হতে লাগল। এই পার্টি বহুজাতিক কোম্পানী ও বড় বড় শিল্পমালিকদের স্বার্থ রক্ষাকে প্রাধান্য দিতে লাগল। এভাবে যে পার্টি এক সময় দাস ও গোলাম প্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা ও সোচ্চার হওয়ার জন্য গঠিত হয়েছিল, সেই পার্টিকে আজ গোটা বিশ্বকে গোলাম বানানোর পথে ধাবমান দেখা যাচ্ছে । এমন পার্টি যা মানবতার সংরক্ষণের জন্য তৈরি হয়েছিল তা আজ কট্টরপন্থী, বর্ণবাদ, গোড়া ও সাম্রাজ্যবাদী ইহুদীদের খাঁচায় আবদ্ধ হওয়ার কারণে ইসরাইল পূজারী হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটিক পার্টি রিপাবলিকান পার্টির তুলনায় কিছুটা নরম ও মধ্যমপন্থী। সুতরাং জর্জ বুশ (সিনিয়র) যিনি রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তার শাসনামলেই সর্বপ্রথম বিশ্বায়ন বাস্তবায়নের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং পরীক্ষামূলকভাবে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট মিঃ বিল ক্লিনটনের শাসনামলে যা ৮ বছরব্যাপী ছিল যদিও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে কোন পরিবর্তন আসেনি কিন্তু আবার এমন কোন বড় ধরনের ঘটনাও সংঘটিত হয়নি যা ক্লিনটন প্রশাসনের মাথায় কলংকের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ডেমোক্রেটিক পার্টির ক্ষমতার পর জর্জ বুশ জুনিয়রের (রিপাবলিকান প্রার্থী) কাফেলা যখন তার পিতার তৈরিকৃত বাহিনীর সহায়তায় হোয়াইট হাউজ পর্যন্ত পৌঁছল, তখন ইসরাইল পূজাতে আবার দৃঢ়তা সৃষ্টি হল এবং ইহুদীদের প্রভাব সরাসরি পররাষ্ট্রনীতির ওপর পড়তে লাগল।

পিতার শাসনামলে বিশ্বায়নকে অভিজ্ঞতার পর্যায় অতিক্রম করানো হয়েছে। আর ছেলের শাসনামলে তার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ইহুদী স্বার্থ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য আফগানিস্তানের ওপর আগ্রাসন চালানো হয়েছে।

ইরাককে দিয়েই ইরাকীদের শায়েস্তা করা হচ্ছে। ইরানও সিরিয়াকে ইসরাইলের সম্ভাব্য শত্রু চিহ্নিত করে আমেরিকা তাদের প্রতি রক্তচক্ষু প্রদর্শন করছে।

## ইহুদী যাঁতাকলে আমেরিকাঃ এক মার্কিন কংগ্রেসম্যানের রোয়েদাঁদ

মার্কিন কংগ্রেস (উচ্চকক্ষ) সদস্য পল ফান্ডলে অনেক বছর ধরে কংগ্রেসের সদস্য রয়েছেন। তিনি সে সকল মার্কিনীর একজন যারা বুঝতে পারছেন যে, আমেরিকাকে ইহুদীরা যাঁতাকালে পিষতে শুরু করেছে। তিনি ক্ষমতার খুব কাছে থেকে ইহুদীদের চালবাজি ও ষড়যন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছেন, বরং তিনি তাদের ষড়যন্ত্রের শিকারও হয়েছেন। এজন্য তিনি সাহস ও হিম্মত করে স্বীয় রোয়েদাঁদ ও প্রত্যক্ষ বিষয়াবলীকে বিন্যাস ও একত্র করে (They Dare to speak out) "তারা বলতে ভয় পায়" নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাতে তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে ইহুদীদের আধিপত্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। পল ফান্ডলে লেখেন, ওয়াশিংটন বহু সংক্ষিপ্ত নামে প্রসিদ্ধ। তবে কংগ্রেসে AIPAC নামই সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ। এর আলোচনাই সে সমস্ত লোকদেরকে চমকিয়ে দেওয়া এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট, যারা ক্যাপিটেল হিলে মধ্যপ্রাচ্যের পলিসির সাথে সম্পর্ক রাখে, AIPAC অর্থাৎ আমেরিকান-ইসরাইল পাবলিক এ্যাফেয়ার্স কমিটি' এখন ওয়াশিংটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লবি।

১৯৬৭ খৃস্টাব্দে যখন আমি ৪র্থ বার নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেসের সদস্য হয়েছিলাম, তখন ফরেন এ্যাফেয়ার্স কমিটিতে আমার নাম ঘোষণা করা হয়। সে সময় আমি এর নামও শুনিনি। একদিন আমি কমিটির রুমে ব্যক্তিগত আলোচনার মাঝে ইসরাইলের সিরিয়া আগ্রাসনকে অযৌক্তিক বলেছিলাম। মিশিগান প্রদেশের সিনেট সদস্য উইলিয়াম বরোমফিল্ড হাসতে হাসতে বললেন, ভাই তোমার এই মন্তব্যখানি শুধু AIPAC এর সি, কেনান পর্যন্ত পৌঁছাতে দাও তারপর দেখবে ........। তার ইঙ্গিত ছিল I. L. Kanana-এর দিকে যিনি "AIPAC" এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ছিলেন। পরবর্তীতে প্রমাণিত হলো বরোমফিল্ড উপহাস করছিলেন না; সুতরাং বুঝুন, AIPAC এমন একটি ভয়াবহ প্রতিষ্ঠান যার কাছে এমন লোকের

ব্যক্তিগত সংবাদও পৌঁছে যায়, যিনি মার্কিন সিনেটের সদস্য হয়ে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। AIPAC ইসরাইলী লবির একটি অংশ। কিন্তু প্রভাব সৃষ্টি করার দিক দিয়ে একটি বিশাল গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই সংগঠন গত কয়েক বছরে বিশাল শক্তি ও দৃঢ়তা অর্জন করে ফেলেছে। এ কথা বললে কিছুতেই অতিরঞ্জিত হবে না যে, মধ্যপ্রাচ্য নীতির ক্ষেত্রে এই সংগঠন ক্যাপিটেল হিলের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ওপর ছেয়ে গেছে। হাউস ও সিনেটের সদস্যগণ প্রায় নির্দ্বিধায় তার নির্দেশ পালন করে। কারণ তাদের জানা আছে, এই সংগঠন (ক্যাপিটেল হিলে) সরাসরি এমন এক রাজনৈতিক শক্তির প্রতিনিধি, যা নির্বাচনের সময় তাদের সম্ভাবনাকে ওঠাতে ও নামাতে পারে। এ কথার ভিত্তি চায় বাস্তবতার ওপর হোক কিংবা নভেল-নাটকের ওপর হোক, কিন্তু একথা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, AIPAC নামই একটি শক্তি অর্থাৎ ত্রাস সৃষ্টিকারী শক্তি। তার প্রকাশিত যে সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়, তার মধ্যে নিউ ইয়র্ক টাইমসের এই বাক্য সর্বদা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়, "এই সংগঠন খুবই শক্তিশালী, খুবই সুসংগঠিত, সুপরিকল্পিত ও সক্রিয় গ্রুপ, যা ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রনীতির ওপর প্রভাব রাখে।" ম্যাক গ্লোস্‌লি পল (MCCGloslleypaul) সাবেক কংগ্রেস সদস্য তো স্পষ্ট ভাষায়ই বলেছেন যে, কংগ্রসের উপর AIPAC এর ভয়াল ত্রাস ছেয়ে আছে। ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার সহকারী পরিচালক স্টিফেন এস রুজেনফেল্ড (Steaphen S Rosen Feld)-এর ভাষায় "AIPAC এখন স্পষ্টভাবে আমেরিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইহুদী রাজনৈতিক শক্তি"।[৭৩]

পল ফান্ডেলে ঘরের রহস্য বাইরে প্রকাশ করার দৃষ্টান্ত। তিনি স্বীয় গ্রন্থে আমেরিকার ইহুদী পূজার ওপর জায়গায় জায়গায় প্রতিবাদ করেছেন এবং স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, এই ইহুদীদের কারণেই আজ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যসহ দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হলো, মার্কিন সিনেটের এই সাবেক সদস্য ও বিশাল প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী পল ফান্ডলেও স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করার পর ইহুদী আধিপত্য ও ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে পারেননি; ইহুদীদেরকে সবাই এ পরিমাণ ভয় করে যে, পল ফান্ডলের গ্রন্থ পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করতে সাহস করেনি। লেখক নিজেই লেখেন, "আমার এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে অনেক কঠিন স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে।

---

[৭৩]. They Darc to speak out. পল ফান্ডলে প্রণীত, উর্দূ অনুবাদ- শিকনজা-ই-ইয়াহুদ, পৃ. ৫০-৫২।

উদাহরণ স্বরূপ দুই বছর লেগে যায় প্রকাশক খুঁজতে। এরপর দু'জন প্রকাশক পান্ডুলিপির প্রশংসা করতঃ প্রকাশের যোগ্য আখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও একথা বলে অক্ষমতা প্রকাশ করে যে, এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু খুবই স্পর্শকাতর। এক প্রকাশক বললেন, এই গ্রন্থ প্রকাশ করলে আমাদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং আমরা বিপদে পড়তে চাচ্ছি না। পরিশেষে অন্য একজন প্রকাশক এই জুয়া খেলতে প্রস্তুত হলেন।"

মার্কিন সরকারের ইহুদী গ্যাঁড়াকলে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনা বিস্তারিতভাবে অনুমান করা কোন অভিযানে বিজয় লাভ করার সমার্থক।

সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এতটুকু বলা যেতে পারে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কখন কি করতে হবে তার সিদ্ধান্ত মার্কিন ইহুদীরা দেবে। ইহুদীদের ইঙ্গিতেই মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন বিভিন্ন দেশে অভিযান পরিচালনা করে এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ীই ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্রনীতি তৈরি হয়। এজন্য বিশ্বায়ন যা মূলত আমেরিকানাইজেশন, তা প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহুদাইজেশন। এই আন্দোলনে যদি কারো সবচেয়ে বেশী উপকার হয় তাহলে তা হবে ইহুদীদের, যারা গ্লোবালাইজেশনের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের ওপর মোড়লীপনা করতে চায়।

## লীগ অব নেশন ঃ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ

যে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন ইহুদীরা দেখেছিল তার বাস্তব রূপ ও সুসংগঠিত প্রয়াসের সূচনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে হয়েছে। যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনে'র রাজনৈতিক উপদেষ্টা কর্নেল মন্ডিল হাউস তার বন্ধু-বান্ধবদের সহায়তার 'লীগ অব নেশনস' এর খসড়া প্রস্তুত করে। জানুয়ারী ১৯১৮ খৃস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট উইলসন সেই খসড়াকে কংগ্রেসের সামনে পেশ করেন। উক্ত খসড়াতে একথাও উল্লেখ ছিল, "মার্কিন ডিপ্লোম্যাসি হবে স্বাধীন। স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে, অস্ত্র হ্রাস করা হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী সমস্যা জনগণের ইচ্ছা অনুসারে মুক্ত চিন্তার আলোকে সমাধান করা হবে। এর জন্য এমন একটি সংস্থার প্রয়োজন যা বিশ্বের সকল দেশের পৃষ্ঠপোষকতা করবে আর তার প্লাটফরমে সকল সমস্যার সমাধান বের করা হবে।" লীগ অব নেশনসের এই খসড়া মার্কিন কংগ্রেসে প্রস্তাব-১৪ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৭৪]

---

[৭৪] আমেরিকা, আল-মুস্তাবাদ্দাহ্, পৃ. ৪৪।

সাংবিধানিকভাবে কেবল মার্কিন সিনেটেরই এই অধিকার ছিল। যে সে যে কোন চুক্তি বা দস্তাবেজ গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। এই ভিত্তিতে সিনেটের তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এই বলে লীগ অব নেশনসের। খসড়া ও পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে দেয় যে, মার্কিন সুপার শক্তি অন্য কোন সংগঠন বা সংস্থার অধীনে থাকতে পারে না। এভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ লাভের পূর্বেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়। যদিও আমেরিকা লীগ অব নেশনসের সদস্য হয়নি কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কোনভাবে নামকাওয়াস্তে টিকে থাকে।[৭৫]

লীগ অব নেশনসের উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে একটি আদর্শ বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা, যে ব্যবস্থাকে বিশ্বের সকল জাতিগোষ্ঠী অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেবে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য লীগ অব নেশনসের প্লাটফরমে এ মর্মে একটি আইন পাস হয় যে, যুদ্ধ একটি নিষিদ্ধ ও অন্যায় কাজ। কোনো দেশের এই অন্যায় কর্মে জড়িত হওয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু বিশ্ব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলোর জন্য বিদ্রোহী দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার অধিকার থাকবে।

এই আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে "ইম্পায়ারিজম ও সাম্রাজ্যবাদ" অন্যায় ও অপরাধের তালিকায় এসে যায়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উক্ত খসড়াতে কেবল সে সাম্রাজ্যবাদকেই নিন্দা করা হয়েছে, যা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী হবে কিংবা তার রাস্তায় প্রতিবন্ধক হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন লীগ অব নেশনসের খসড়ায় অস্ত্র সংকোচনের ব্যাপারে যে আলোচনা করেছিলেন, তার ওপর আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য দেশকে জোর পূর্বক তা মানতে বাধ্য করানো হয়েছে। কারণ উইলসনের উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই ছিল না, যাতে আমেরিকা ভবিষ্যতে খুব সহজেই তার সম্ভাব্য বিরোধীদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাতে পারে। আর আমেরিকার মোকাবেলায় অন্য কোন দেশের যেন স্বীয় প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জিত না হয়।

লীগ অব নেশনসের চার্টারে দ্বিতীয় বিষয়ে স্বাধীন বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছিল। স্বাধীন বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও উইলসনের উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রতিযোগীদের মোকাবেলা করা হবে এবং

---

[৭৫] মাগরিবী মিডিয়া, পৃ. ৬৮।

তাদেরকে অর্থনৈতিক যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে হবে। আমেরিকার নিকট বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তর সামুদ্রিক বাণিজ্য নৌবহর রয়েছে। এজন্য স্বাধীন বাণিজ্য আমেরিকাকে এই সুযোগ প্রদান করেছে যে, সে বিশ্ব বাজারের বিরাট অংশ দখল করে নেবে এবং কোনো দেশ কিংবা কোনো জাতি এই ময়দানে তাদের মোকাবেলায় যেন টিকতে না পারে। এরই ফলে আমেরিকার নিকট যে সংরক্ষিত ও রিজার্ভ স্বর্ণ ছিল তা ছিল গোটা বিশ্বের। স্বর্ণ যা ১৯২৯ খৃস্টাব্দে বেড়ে ৬০% হয়ে গেছে। এমনিভাবে আমেরিকায় কয়লার সবচেয়ে বেশী উৎপাদন হতে লাগল। গম ও ইস্পাতের উৎপাদনও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। অতঃপর অন্যান্য দেশের সহায়তার নামে আমেরিকা যে সব যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল তার ঋণও বাকী ছিল যার কারণে আমেরিকা ঋণ গ্রহীতা দেশগুলোর ওপর সর্প হয়ে বসে গেল এবং জবরদস্তি স্বীয় মর্জি তার ওপর বাস্তবায়ন করতে লাগল। সুতরাং জার্মান সাম্রাজ্যবাদ, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিপদ ও ভয়ংকর হয়ে চলছিল, তাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেওয়া হলো এবং তাকে ছোট ছোট টুকরায় বন্টন করে দেওয়া হলো।

প্রেসিডেন্ট উইলসন অন্যদের ওপর যা কিছু বাস্তবায়ন করতে চাইতেন তা নিজে কখনো পালন করেন নি। তিনি সাম্রাজ্যবাদ নির্মূলের জন্য এমন সময় জোর আওয়াজ তুললেন, যখন আমেরিকা স্বয়ং কোন কারণ ছাড়াই বা আত্মরক্ষার বাহানায় ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ ও অন্য এশিয়ান অঞ্চলকে নিজের কলোনী বানিয়ে রেখেছিল।

বায়ের মাইকেল লেখেন, "ইউরোপীয়দের প্রেসিডেন্ট উইলসনকে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিৎ ছিল, তিনি লীগ অব নেশনসের প্লাটফরমে জাপানীদের সেই অধিকার প্রদান করেননি যা যা তাদের প্রাপ্য ছিল। এমনিভাবে তিনি ফিলিপাইনের মত মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলসমূহের স্বার্থের জন্যও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের খন্ডিত হওয়ার সময় আসল তখন আমেরিকা সবচেয়ে বেশী তৎপরতা দেখাল।" আমেরিকা ছাড়া যেহেতু আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দেশ লীগ অব নেশনসের অন্তর্ভূক্ত হয়নি, তাই এই সংগঠন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। মার্কিন প্রশাসনে জোঁকের মত লেগে থাকা ইহুদীদের ভাল করেই অনুমান হয়ে গেল, এই সংগঠন তাদের উদ্দেশ্যাবলীকে পূরণ করতে

পারবে না এবং তার স্টেজে বিশ্ব শাসনের স্বপ্ন পূরণ হবে না।[৭৬] এতদ্সত্ত্বেও লীগ অব নেশনস যেসব আইন-কানুন তৈরি করেছিল তা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার রাস্তা সুগম করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হলো এবং নীতি-নির্ধারক মস্তিষ্ক কিভাবে আগামীতে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবে, কোন কর্মপদ্ধতি এই পরিকল্পিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ও ফাউন্ডেশনের কাজ দেবে এবং কিভাবে ভবিষ্যতে সর্বোত্তম সুন্দর পদ্ধতিতে বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তা ভাল করেই অনুমান করে ফেলল। হীন উদ্দেশ্যগুলোকে বাস্তব রূপ দানের জন্য লীগ অফ নেশনস বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর চুপ করে বসে থাকেনি, বরং তারা পূর্ব হতেই প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল যাতে করে যে সব কাজ লীগ অব নেশনস তাদের জন্য করতে পারেনি, তা জাতিসংঘ করতে পারে।

## জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র

লীগ অব নেশনস মার্কিন ও জায়নবাদী স্বার্থ ও উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তা বিলুপ্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সে মতে ১ জানুয়ারী ১৯৪২ খৃস্টাব্দে ২৬টি দেশ একটি চার্টারে দস্তখত করার পর "লীগ অব নেশনস"-কে জাতিসংঘে রূপান্তরিত করে দেওয়া হলো। অতঃপর ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে মার্কিন শহর "সানফ্রান্সিসকো" তে জাতিসংঘের একটি সংবিধান ঘোষণা করা হলো। এই সংবিধান প্রকৃতপক্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে তৈরি করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে যুদ্ধে বিজয়ী দেশগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘ সংবিধান সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পেশ করে। এই সংবিধান বিশ্বের জাতিসমূহের তথাকথিত এই সংস্থাকে কিছু হাতে গোণা ও বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী দেশসমূহ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দয়ার পাত্র বানিয়ে দেয়। জাতিসংঘের এই চার্টার জনসমক্ষে আসার পর বিশ্ব যে একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের অধীনতা গ্রহণ করার পথে ধাবমান তা আর গোপন থাকল না। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের অধীনতা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না জবরদস্তির সাথে গ্রহণ করানো হবে এ সিদ্ধান্ত সে-ই দেবে। জাতিসংঘ সনদের ৩৯ নং উপধারায় একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, "নিরাপত্তা পরিষদের ওপরই বিশ্বের

---

[৭৬]. আমেরিকা, আল-মুস্তাবাদ্দাহ্ আল-উলায়াতুল মুত্তাহেদাহ ওয়া সিয়াসাতুস সায়তারাহ আলাল আলম, ৪৪-৪৫।

শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পিত হবে। একমাত্র নিরাপত্তা পরিষদেরই সে সব দেশে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সেখানে কিভাবে হস্তক্ষেপ করবে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে না অন্য কোনভাবে তা নিরাপত্তা পরিষদই সংরক্ষণ করবে।

২৫ নং উপধারা মুতাবেক নিরাপত্তা পরিষদের পাসকৃত প্রস্তাব সকল সদস্য দেশের মেনে নেওয়া এবং তা বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক। আর ৭ম উপধারায় উল্লেখ আছে, প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনী গঠন করা যেতে পারে। এই সামরিক বাহিনী তখনই তার ভূমিকা পালন করবে যখন নিরাপত্তা পরিষদ কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেবে।[৭৭] জাতিসংঘের এই সংবিধান প্রণীত হওয়ার ফলে বিভিন্ন দেশে হস্তক্ষেপের ভিত্তি গড়ে ওঠে। যদিও তাৎক্ষণিকভাবে এই সংবিধানের ওপর কোন কার্যকারিতার সূচনা হয়নি। কিন্তু ১৯৬০ সালে আফ্রিকান দেশ "কঙ্গোতে" রাজনৈতিক অস্থিরতা চলাকালে প্রথমবার জাতিসংঘ কোন দেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করে। সে মতে চুম্বে যখন ঘোষণা দিল কটেংগা প্রদেশ কংগো থেকে অবকশ্যই স্বাধীন হয়ে যাবে, তখন সাথে সাথে চুম্বেকে হত্যা করা হলো এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ প্রথমবার জাতিসংঘ বাহিনীকে কঙ্গোতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিল, সেখানে তথাকথিত জাতিসংঘের "শান্তি বাহিনী" হাজারো নিষ্পাপ, নিরীহ জনগণকে হত্যা করে, কটেংগা প্রদেশের জনগণের ওপর নির্মম ও পাশবিক নির্যাতন চালায়।[৭৮] নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও আরো শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান দেশ রয়েছে। কিন্তু সেখানে কর্তৃত্ব চলে শুধু আমেরিকার। যদি মার্কিন স্বার্থের অনুকূলে কোন প্রস্তাব পাস করাতে সমস্যা হয় তাহলে আমেরিকার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অন্য সদস্যদেরকে তার কথা মেনে নিতে বাধ্য করানো কোন কঠিন কাজ নয়। ১৯৭৬ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারী তুরস্ক ও গ্রীসের মাঝে যুদ্ধ চলাকালে গ্রীসের তিন হাজারের বেশী লোক নিহত হয়। কারণ গ্রীসের এই ধ্বংস সাধন মার্কিন স্বার্থের পক্ষে ছিল। এজন্য জাতিসংঘের পক্ষ থেকে (যা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার নামে অস্তিত্ব লাভ করে ছিল) কোন চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। এমনিভাবে ৭ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড এবং তার উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জার "তিমুর" উপদ্বীপ

---

[৭৭]. আমেরিকা আল-মুস্তাবাদাহ পৃ. ৯৬।
[৭৮]. মাগরিবী মিডিয়া, পৃ. ৫০।

পরিভ্রমণ করার তিন ঘন্টা পরেই ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী পূর্ব তিমুরে আক্রমণ করে বসে, যার ফলে ১ থেকে ২ লাখ মানুষ নিহত হয়। যেহেতু এই হামলা মার্কিন স্বার্থের অনুকূলে ছিল, সেমতে যখন ইন্দোনেশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করার ব্যাপরে জাতিসংঘে ভোটাভুটি হলো তখন আমেরিকা হামলাকারীদের পক্ষেই ভোট দিল। এর ফলে ইন্দোনেশিয়ার সাহস ও প্রেরণা আরো বৃদ্ধি পেলো। ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুরের জনগণের ওপর "নাবালাম" বোমার বৃষ্টি বর্ষণ করে। অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট এই কর্মকান্ডকে এমন "গণগত্যা" বলে আখ্যা দিল যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কখনো সংঘটিত হয়নি। তখন থেকে সময় সময় মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ হতে ইন্দোনেশিয়াকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা হয়। কোটি কোটি ডলার ইন্দোনেশিয়াকে দেওয়া হয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের শাসন আমলেও ৪০০ মিলিয়ন ডলার ইন্দোনেশিয়াকে দেওয়া হয়েছে এবং ১৭০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র ইন্দোনেশিয়ার কাছে বিক্রি করা হয়েছে। কিন্তু যখন ইন্দোনেশিয়ার সাথে আমেরিকার সম্পর্কের অবনতি ঘটল তখন সেই পূর্ব তিমুর যার ওপর হামলা করাকে আমেরিকা বৈধ আখা দিয়েছিল এখন তার দখলকে অবৈধ আখ্যা দিল।

উপরন্তু পূর্ব তিমুরের জনগণকে পরিপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা হলো। পরিশেষে জাতিসংঘের মাধ্যমে গণভোটের আয়োজন করে পূর্ব তিমুরকে স্বাধীন করে দেওয়া হলো।[৭৯] একই অঞ্চলের ব্যাপারে জাতিসংঘের এই দ্বি-মুখী নীতি একথা প্রমাণ করে যে, শান্তি-নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা শুধু আমেরিকা ও তার ওপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণকারী ইহুদী অভিলাষকে পূরণ করে চলেছে, চায় এর জন্য যতই অশান্তি ও যুদ্ধের অবস্থাই সৃষ্টি হোক না কেন।

কিছুদিন নীরব থাকার পর প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় একবার জাতিসংঘ তার তথাকথিত ক্ষমতার প্রয়োগ করে এবং আমেরিকাকে ইরাকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার সাধারণ অনুমতি দিয়ে দেয়। ইরাকের ওপর আগ্রাসন চালানো হয়। লাখ লাখ টন বোমা বর্ষণ করা হয়। অগণিত মানুষ মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। জাযিরাতুল আরবের উন্নতি ও স্বচ্ছলতার দৃষ্টান্ত "ইরাক" একটি বিরান ও উজাড় ভূমিতে পরিণত হলো; কিন্তু জাতিসংঘ নামের আন্তর্জাতিক প্রতারক সংঘ এর ওপরেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং ইরাকের ওপর বিভিন্ন ধরনের অবরোধ আরোপ করে,

---

[৭৯] আমেরিকা, আল-মুস্তাবাদাহ, পৃ. ৯৬।

এমন কি খাদ্যপণ্য ও পেট্রোলের আমদানী-রফতানীর ওপরও সম্পূর্ণ অবরোধ আরোপ করে। জাতিসংঘ তার অস্ত্র পরিদর্শকদের এই ক্ষমতা দিয়ে দেয় যে, তারা যখন ইচ্ছা ইরাকে প্রবেশ করে অস্ত্র পরিদর্শন করবে। এই সমস্ত অবরোধের ফলে ইরাকী জনগণ যে সমস্ত বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হয়, তা বর্ণনা করা অসম্ভব। ইরাকের পর নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্য ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাস করিয়ে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের ওপর আগ্রাসন চালায় এবং মানবেতিহাস জঘন্যতম গণহত্যা প্রত্যক্ষ করে। হাজার হাজার জনগণকে মৃত্যুর ওপারে ঠেলে দেওয়া হয় এবং আমেরিকার দালাল, তল্পীবাহকও তাঁবেদার সরকার আফগানিস্তানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

একথা আর গোপন নেই, ২০০১-এর ১১ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র আক্রমণের যে নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল তার মূল হোতা ছিল ইহুদী। ইউরোপ ও আমেরিকারই কিছু কিছু গবেষক ও চিন্তাবিদ একথা ফাঁস করেছেন এবং এই নাটকের পেছনে যে ইহুদী মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল ছিল তার ওপরে মজবুত প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ১১ই সেপ্টেম্বরের বিস্ফোরণের অপবাদ "আল-কায়দা'র ঘাড়ে চাপানো হয়। আর আল-কায়দা প্রধান উসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে আফগানিস্তানের ওপর আগ্রাসন চালানো হয়। এসব কিছু জাতিসংঘের অনুমতির পরই হয়েছে। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, আমেরিকার ওপর ও আমেরিকার মাধ্যমে জাতিসংঘের ওপর ইহুদীদের কী পরিমাণ প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে।

এ কারণেই ইসরাইলের (যে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনী জনগণের ওপর বর্বরতা ও পাশাবিক অত্যাচার চালিয়ে আসছে এবং আরবদের গণহত্যার কোন সুযোগ হাতছাড়া করেনি) বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত নিন্দা প্রস্তাবে আমেরিকা সব সময় ভেটো দেয়। যদি ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব পাস হয়েও যায় তবুও তা কখনো বাস্তবায়ন হয়নি।

আমেরিকা ২০০৩ সালে আবার ইরাকের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে স্বীয় পাশবিকতা ও বর্বরতার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর হতে পারে না। ইরাকের ওপর এই আগ্রাসন পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র রাখার অপবাদ দিয়ে চালানো হয়, যদিও আমেরিকা আজ পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে মার্কিন ক্রীড়নক

জাতিসংঘ, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া ও চীনের বিরোধিতা আমেরিকা কোন আমলে নেয়নি।

ইরাকের ওপর মার্কিন আগ্রাসনের কারণে জাতিসংঘের স্বরূপ ও চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। "যার লাঠি তার মেঘ" কিংবা "জোর যার মুল্লুক তার"-এর ভিত্তিতে গোটা বিশ্বসহ জাতিসংঘের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমেরিকা ইরাককে তছনছ করে দিয়েছে। ইরাকের পুন:নির্মাণের ক্ষেত্রেও আজ আমেরিকা জাতিসংঘের কোন ভূমিকাকে বরদাশত করছে না। তোয়াক্কা করছে না জাতিসংঘের নীতিমালাকে। কিন্তু ইসরাইল (যার সম্পর্কে বিশ্ববাসী জানে যে, সে দীর্ঘদিন যাবত পারমাণবিক শক্তির অধিকারী এবং অনেক পূর্বেই রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করেছে যার কারণে আরবরা আজ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন)- এর বিরুদ্ধে জাতিসংঘে কোন ধরনের কোন প্রস্তাব পাস করার কেউ সাহস রাখে না।

একথা বললে ভুল হবে না, জাতিসংঘে স্বার্থের রাজনীতি চলে। কারণ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের যে ভেটো অধিকার রয়েছে, তা মূলত জংলী ও বর্বর আইনের সাথেই বেশী তুলনীয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে যে কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে, চায় এ দ্বারা শান্তি-নিরাপত্তার জানাযাই হয়ে যাক না কেন! আমেরিকা (যে সব সময় স্বীয় স্বার্থের চিন্তায় থাকে) ১৯৯০- এর মাঝামাঝি সর্বোচ্চ ৬০ বার ভেটো অধিকার প্রয়োগ করেছে। আর ফ্রান্স ১১ বার এবং সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া সর্বমোট ৮ বার এই অধিকার প্রয়োগ করে স্বীয় মর্জি ও ইচ্ছা গোটা দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। আমেরিকার বিরোধিতাকারী দেশগুলোর সাথে কঠোর ব্যবহার করা এবং আমেরিকার মিত্র দেশগুলোর মাথায় হাত রাখার দ্বি-মুখী রাজনীতি জাতিসংঘের ভূমিকাকে সন্দেহযুক্ত ও অগ্রহণযোগ্য বানিয়ে দিয়েছে। আজ বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, জাতিসংঘ আমেরিকা ও জায়নিস্টদের একটি গোলাম ও তাঁবেদার সংঘ, যা এমন একটি অর্ধ সরকারের আকার ধারণ করেছে যে, তার যে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে। এখন এই অর্ধ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে শুধু এতটুকু দেরী আছে যে, আঞ্চলিক সরকারগুলোকে খতম করে দেওয়া হবে এবং গোটা বিশ্বে এই সংঘের তৈরিকৃত আইন বাস্তবায়ন করা হবে। এই বাস্ত

বতার মুখোশ উন্মাচন করতে গিয়ে জাতি সংঘের সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোস গালি লেখেন, “জাতিসংঘ একদিক দিয়ে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ইট।[৮০]

## ইসলামী বিশ্ব ও ইহুদী খৃষ্ট ঐক্য

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বাধা ইসলাম ও তার সত্যিকার অনুসারীরা। যারা এখনো ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও অন্যদের সাথে সাথে নিজেদের জ্ঞাতি ভাইদের পক্ষ হতেও তাদেরকে সন্ত্রাসীর মত উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হচ্ছে, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা দৃঢ়মনোবল ও উন্নত শির নিয়ে দৃঢ় পদে এগিয়ে চলেছে এবং জায়নিস্টদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চাপিয়ে যাচ্ছে। আর ইসলামপন্থীদের এই সংগ্রাম যেহেতু জায়নবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা বরদাস্ত করতে পারছে না, এজন্য ১১ সেপ্টেম্বরের মত বহু উদ্দেশ্য সম্বলিত নাটক মঞ্চস্থের মাধ্যমে তারা সে সংগঠনগুলোকেও টার্গেট বানাতে শুরু করেছে যারা জায়নিস্ট সংকল্পের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে সে সকল দেশের ওপর আগ্রাসন চালানো হচ্ছে যেসব দেশ ইসলামী জাগরণ ও দ্বীনী চেতনাবোধের প্রাণকেন্দ্র। এ সব দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হয়েছে। অঞ্চলের পর অঞ্চল ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অগণিত নিষ্পাপ প্রাণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আর অর্থনৈতিক ক্ষতি ও ধ্বংসের তো হিসাবই সম্ভব নয়। জায়নিস্টরা তাদের সংকল্প বাস্তব রূপ দানের জন্য খৃস্টানদের সাথে ঐক্য গড়ে তুলে তাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর সওয়ার হয়ে আছে। আজ বিশ্বের যে প্রান্তেই মুসলিম উম্মাহ ধ্বংস ও নির্যাতনের শিকার সেখানে বাহ্যত অন্য কোন জাতি এই অন্যায় কর্মে লিপ্ত হলেও কিন্তু এর পশ্চাতে ইহুদী মস্তিকই কাজ করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে খৃস্টানরা ইহুদীদের গোলামী ও তাঁবেদারী করাকে গর্বের বিষয় মনে করছে এবং তাদের ইশারায়ই নাচছে।

সভ্যতার দাবীদার জাতিগোষ্ঠী এখন প্রকাশ্য মানবতাবিধ্বংসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এমন কি গর্বভরে তার প্রকাশও করছে। তাদের প্রভু ইহুদী জায়নিস্টদের খুশি করার জন্য একথা বলতেও দ্বিধাবোধ করে না যে, স্বীয় উদ্দেশ্য

---

৮০. আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র, ড. বুট্রোস গালি, প্রকাশ-১৯৯৭, মাগরিবী মিডিয়ার, পৃ. ৮৫- এর সৌজন্যে।

পূরণের জন্য আমাদেরকে যে কোন রাস্তা দিয়ে চলতে কোন আপত্তি নেই, চায় এর জন্য আমাদেরকে মানবতার সাথে ধোকা বাজিই করতে হোক না কেন?

নিম্নে আমরা বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র জর্জ বুশের ভাষণের অনুবাদ পেশ করছি, যে ভাষণ তিনি মার্কিন শহর নিউ মেক্সিকোর এলবোক ইয়র্কে ইহুদী-খৃস্ট ঐক্য পরিষদের অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে দিয়েছিলেন। এই ভাষণ ওয়াশিংটন পোস্ট ম্যাগাজিন ১৩ মে ২০০৩ সংখ্যায় প্রকাশ করেছে। আর এর আরবী অনুবাদ আহমদ বশীর বাকের www. islamway. com নামক ওয়েব সাইটে উপস্থাপন করেছেন। উক্ত ভাষণ দ্বারা একথা সহজেই অনুমান করা যায়, আজ আমেরিকা ও জায়নবাদীদের লক্ষ্যে-উদ্দেশ্য ও পথ এক ও অভিন্ন হয়ে গছে। স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ ও হীন সংকল্পকে বাস্তব রূপ দানের জন্য তথাকথিত সভ্য দুনিয়া যে কোন কিছু করতে পারে, এমন কি সে সমস্ত জাতিকে নির্মূল ও গণহত্যা করতে পারে, যারা জায়নবাদী বিশ্বায়নের বিরোধী এবং জালেম ও অত্যাচারী জাতির আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। নিচে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জুনিয়রের একটি ভাষণের অনুবাদ পেশ করা হলো।

## ইহুদী-খৃস্ট ইউনিয়নের অধিবেশনে জর্জ বুশের ভাষণ

অধিবেশনের মাননীয় সভাপতি, কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ ও মার্কিন জনগণ!

আজকের রাতে আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে আপনদেরকে বলছি, শ্বেতাঙ্গ ইহুদী-খৃস্ট ঐক্য বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমাদের ইতিহাসে এ রকম আর কখনো হয়নি যে, মার্কিন শক্তি, মার্কিন আধিপত্য ও মার্কিন মূল্যবোধ এমন মর্যাদা, শ্রেষ্টত্ব ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যেমন আজ এই ইহুদী-খৃষ্ট ঐক্যের ফলে অর্জিত হয়েছে। মার্কিন পতাকা, মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী, মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ সি. আই. এ. এবং এফ. বি. আই. সন্ত্রাসবাদের ভয় হতে বিশ্বকে মুক্তি দান এবং শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার খাতিরে দেশে বিদ্যমান রয়েছে। মার্কিন নাগরিকদের তাদের সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর জোয়ানদের নিয়ে গর্ববোধ করা উচিত যারা বিশ্বব্যাপী মার্কিন ব্যবস্থা বিস্তারের জন্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম- আয়েশ পরিত্যাগ করছে।

## প্রিয় দেশ ও জাতি

আজ আমি আপনাদেরকে একথা জানাতে গর্ববোধ করছি, তালেবান নির্মূল হয়ে গেছে। কাবুল স্বাধীন হয়েছে। মোল্লা ওমর ও উসামা বিল লাদেন হয়তো শেষ হয়ে গেছে কিংবা গ্রেফতারের পথে, এদিকে ওদিকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বেশী দিন নয়, কারণ আমি তাঁকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ন্যায়নীতির কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ইস্পাত-কঠিন সংকল্প করে রেখেছি।

আজ আমি আপনাদেরকে একথা জানাতেও গর্ব অনুভব করছি, আফগানিস্তানে নারীরা চিরদিনের জন্য বোরকা হতে মুক্ত হয়ে গেছে! আফগানিস্তানের মেয়েরা স্কুলে ফিরে এসেছে। তারা এই সবক পড়ছে যে, কিভাবে আমাদেরকে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য জগত কামিয়াবী ও সফলতা দান করেছে। পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় নিদর্শন টেলিভিশন আফগান নাগরিকদের জীবনে আবার স্থান করে নিয়েছে। আফগানিস্তানের লোকেরা আজ বড্ড খুশি ও পুলকিত এই ভেবে যে, তারা আজ নিজ দেশে স্বাধীনভাবে ঘুরা ফেরা করছে। আমেরিকা, বিশেষ করে মার্কিন শিশুরা আফগানিস্তানের জনগণকে পানাহারসামগ্রী ও সম্পদ উপরকরণ প্রেরণ করে যে মহান কর্ম সম্পাদন করেছে তার ওপর যতই গর্ব করা হোক তা কম হবে। আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আমি আফগান শিশুদেরকে উত্তম উত্তম খাদ্যের স্বাদ অনুভব করতে দেখেছি। তারা আজ চিপ্‌স, জেলী ও বিস্কুট খাচ্ছে। আফগানিস্তানে যুদ্ধ প্রায় শেষ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সামনে এখনো দীর্ঘ ও বন্ধুর পথ রয়েছে। আমাদেরকে অনেক ইসলামী ও আরব রাষ্ট্র অতিক্রম করতে হবে। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নিস্তেজ হব না যতক্ষণ প্রত্যেক মুসলমান নিরস্ত্র, দাড়িবিহীন, ধর্মহীন, শান্তিপ্রিয় ও মার্কিন প্রেমিক না হবে এবং মুসলিম নারীরা তাদের শরীর ঢাকার জন্য হিজাব ছেড়ে না দেবে। আমার দৃঢ় সংকল্প যে, আমার দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বেই এ সংকল্প পূরণ করার জন্য সকল প্রকার উপায় উপকরণ ও মাধ্যম প্রয়োগ করব।

আমাদের শাসন করার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি একথা বলে যে, সরকারকে সক্রিয় ও কর্মতৎপর হতে হবে। কিন্তু সাথে সাথে সীমিতও হবে এবং সকল যিম্মাদারী ও দায়িত্ব পালন করতে হবে। আজ আমরা শক্তির ক্ষেত্রে বিরাট অস্বস্তি অস্থিরতার শিকার, যার কারণে আমাদেরকে একটি জাতীয় পলিসি বানাতে হবে। আমাদের নিকট শান্তিকে ব্যাপক ও বিস্তার করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমরা শান্তির

মার্কিন সীমাকে বিস্তার করে তা সংরক্ষণ করতে পারি। আমরা আমাদের মিত্র ও বন্ধুদের সাথে মিলে মিশে কাজ করব যাতে আমরা কল্যাণের জন্য, শক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সহযোগী প্রমাণিত হতে পারি। আমরা মুক্ত বাজার, মুক্ত বাণিজ্য এবং সে সকল জাতির জন্য মিলেমিশে কাজ করব, যারা স্বাধীনতার পথে ধাবমান। আমরা আমাদের মূল্যবোধ ও নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমাদের শান্তি নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী প্রয়োজন। কারণ বিন লাদেনের আগমন সম্পর্কে অবগত হওয়া আমাদের কারোর শক্তির মধ্যে ছিল না। কেউ জানে না, সে আমাদের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কখন কি ধরনের ধ্বংস সাধন করবে এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পলিসিকে কিভাবে টার্গেট করবে। অমানবিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আঞ্জামদাতাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও আমি মার্কিন জনগণের সাথে কৃত সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। শুধু একটি ছাড়া। কারণ আমাদের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অনেকটা বাধা হয়েছে এবং এই যুদ্ধ অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগণের ওপরও বিরাট প্রভাব ফেলেছে। আমাদের উচিত আমরা শান্তি ও গোপন তথ্যের ক্ষেত্রে স্বীয় কর্মতৎপরতা বিস্তৃত করব। ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি.আই) ও সি. আই. এ আমেরিকান মুসলমাদের উপর কড়া নযর রাখছে। ইতোমধ্যে হাজার হাজার গ্রেফতারও করা হয়েছে। আমরা নাগরিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতাকে অনেক শর্তযুক্ত করে দিয়েছি। আমরা প্রচার মাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপরও কিছু কিছু অবরোধ আরোপ করেছি এবং বিমানবন্দরে যাত্রীদের আসবাবপত্র ইত্যাদির তল্লাশীর ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করেছি। আমি এজন্য আনন্দিত যে, মার্কিন জনগণ সিকিউরিটির মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদের সহায়তা করছে। সাদা চামড়ার ইহুদী-খৃস্টানরা ছাড়া আমাদের দেশে অন্যান্য জাতির অবস্থান (চায় আইনীভাবে হোক বা বেআইনী হোক) আমাদের জাতির জন্য বিপদস্বরূপ। আপনাদের সকলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে আমার দায়িত্ব ও যিম্মাদারী হলো আপনাদের শান্তি, নিরাপত্তা প্রদান করা। 'ইমিগ্রেশন' (অভিবাসন) সম্পর্কেও আমাদের পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন আসবে যাতে আমরা আমাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে পারি। কিন্তু এর জন্য যখন উপযোগী সময় আসবে তখনই কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তখন ভবিষ্যতের নিউ ইয়র্ক শহর যার ওপর অনেক বিপদ- আপদ আপতিত হয়েছে তা আবার সাদা চামড়ার লোকদের শহর হবে।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড, ড. কন্ডোলিসা রাইস, পল ভোলফিটজ, রিচার্ড ব্যারেল, কংগ্রেসের ইহুদী প্রতিনিধি ও মার্কিন-ইসরাইল যোগাযোগ কমিটির (AIPAC) সহায়তায় আমরা আমেরিকান আন্তর্জাতিক পররাষ্ট্রনীতির বিরাট উন্নতি সাধন করেছি। সুতরাং আজকের পর আগামীতে আমেরিকা আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে এমন কোন পক্ষের ভূমিকা পালন করবে না যাতে মার্কিন অর্থনীতি ও সামরিক উদ্দেশ্য বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি এখানে বন্ধুবর এ্যারিয়েল শ্যারনের (ইসরাইলী প্রধান মন্ত্রী)- কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেন, আমরা সে সকল আন্তর্জাতিক সংগঠন, যারা মার্কিন ও ইসরাইলের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হবে তাদেরকে সম্পর্কহীন মনে করি। হোক তা জাতিসংঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আরব লীগ (যার সম্পর্কে আমার মতামত হলো তাকে এখনই ভেঙ্গে ফেলা হোক), রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি, ভেটিকান কিংবা অন্যান্য সকল ইসলামী সংগঠন। এতদ্‌সত্ত্বেও অমানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বিপুল বাজেটের প্রয়োজন। কিন্তু তবুও আমি ১৫ কোটি ডলার (যে পরিমাণ আমরা প্রতি বছর ইসরাইলকে সাহায্য ও অনুদান হিসেবে দিয়ে থাকি) সিনিয়র সিটিজেনস (বয়স্ক লোকদের) ভাতা প্রদানের জন্য পাস করেছি যাতে তারা নিজেদের রোগ-শোকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে। আমরা খুব শীঘ্রই আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি খননের কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছি যাতে সেখানে পেট্রোল অনুসন্ধান করা যায়। উপরন্তু ইরান, ইরাক, উপসাগর ও সৌদী আরব হয়ে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত সামুদ্রিক পথে পানির নিচ দিয়ে পাইপ লাইন বিছানো হবে, যার খরচ তারাই বহন করবে। এর পরিবর্তে তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক সাহায্য প্যাকেজ প্রদান করা হবে। আমি এর পূর্বে ২সেপ্টেম্বর ২০০১-এ এ কথাই বলেছিলাম, আমরা আমাদের শত্রুদেরকে ন্যায়নীতির কাঠগড়ায় দাঁড় করাব কিংবা তাদের ওপর ন্যায়নীতি বাস্তবায়ন করব। মোট কথা, তাদের বিচারের সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ভাষায়- এখন সময় এসেছে একথা ঘোষণা করার যে, আমাদেরকে নতুনভাবে দুনিয়া পুনর্গঠন করতে দাও, যাতে গোটা বিশ্ব আমাদের মাঝে বিলীন ও একাকার হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র ফজলে আমরা সাদা চামড়ার সভ্য লোক এই বিশ্বের ওপর আমাদের স্বাধীন, চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর বিশ্বাস চাপিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হব। কারণ বিশ্ব আজ আমাদের ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য ও বিশ্বজনীন আহবানের প্রতি বুভুক্ষু। আজকের পর কারো দাড়ি রাখার ওপর আর কোন ধরনের কড়াকড়ি থাকবে না। নারীদের

আর বোরকায় আবৃত থাকতে হবে না। আজ থেকে সব সময়ের জন্য সকল স্থানের লোক মদ ও নেশা পান করতে পারবে। সিগারেট খেতে পারবে, যৌনক্ষুধা স্বাধীনভাবে মেটাতে পারবে। সমকামিতা করতে পারবে। হোটেলে হোক কিংবা স্বীয় বেডরুমে হোক যৌন সুড়সুড়িমূলক ছবি দেখতে পারবে এবং তাতে অংশ পর্যন্ত নিতে পারবে। আমাদের যে সকল কোম্পানী এ ধরনের নগ্ন ও যৌন ছবি তৈরি করে, নিকট ভবিষ্যতে তা কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে যাবে। সন্ত্রাসী মুসলমানরা তাদেরই ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের সাথে গাদ্দারী করছে। তারা প্রকৃতপ্রস্তাবে ইসলামকেই অপহরণ করতে চায়। এজন্য আমরা ইহুদী-খৃস্ট ঐক্য পরিষদ রাজনীতিকে স্বীয় আকীদা-বিশ্বাস হতে আলাদা ও স্বতন্ত্র রাখি। আমরা যুদ্ধ ও লড়াইকে ধর্ম হতে দূরে রাখি। এজন্য আপনারা কখনো মিডিয়ায় দেখবেন না, ইহুদী কিংবা ক্যাথলিকদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আমরা কাউকে হত্যা করলে ঈমানের নামে নয়, বরং স্বীয় স্বাধীনতা ও সভ্যতা সংস্কৃতি রক্ষা করে হত্যা করি। তারা কেন আমাদেরকে অপছন্দ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা সেই জিনিসকে অপছন্দ করে যা আমি এই অধিবেশনে দেখছি। আর তা হলো পেট্রোল, মোবাইল ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর আর্থিক সহযোগিতায় নারী-পুরুষের নির্বাচন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হচ্ছে, এর চেয়েও বেশী যে জিনিসটি তাদের নিকট অপছন্দনীয় তা হলো আমাদের মার্কিন ইহুদী নাগরিকরা ইংল্যান্ড ছাড়া বিশ্বে আমাদের একক মিত্র ও বন্ধু ইসরাইলের স্থায়ী সমর্থন লাভ করার জন্য কোটি কোটি ডলার আর্থিক সহায়তা দেয়। তারা চায়, কিছু কিছু মুসলিম দেশের সরকারকে খতম করে দেওয়া হোক! কিন্তু আমরা এ রকম হতে দেব না। আমাদের শত্রুরা মধ্যপ্রাচ্য হতে ইসরাইলকে নির্মূল করে দিতে চায়, ইহুদী জাতিকে আমাদের ইহুদী প্রদেশ নিউইয়র্কে পাঠিয়ে দিতে চায়। উপরন্তু তারা চায়, এশিয়া ও আফ্রিকার সুবিস্তৃত অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গ ইহুদী ও খৃস্টানদের বসতি স্থাপনে বাধ্য করা উচিত। কিন্তু এটা আমার লাশ অতিক্রম করেই সম্ভব। সন্ত্রাসবিরোধী এই অভিযানে শুধু আফগান নাগরিকরাই নিহত হয়নি, গোটা বিশ্বে অইহুদী ও অখৃস্ট ব্যাংক ও জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে আমরা সন্ত্রাসীদেরকে সম্পদ হতে বঞ্চিত করে দিয়েছি। এখন ক্ষুধার্ত শিশুদের আহার দানের বাহানা গ্রহণযোগ্য মনে করা হবে না।

পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তের অর্ধ অঞ্চলের প্রতিটি দেশকে আমরা একথা ঘোষণা করে দিয়েছি, তারা ইহুদী-খৃষ্ট বিরোধী কণ্ঠকে কঠোরভাবে নিস্তব্ধ করে দেবে।

সকল দেশকে এখন এ রাস্তাই গ্রহণ করতে হবে, তারা হয়ত আমাদের সহায়তা ও সমর্থন করবে কিংবা সন্ত্রাসীদের পক্ষাবলম্বন করবে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি, সকল দেশ আমাদের এ কথা মেনে নিয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকার সে সব অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে সক্রিয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে যারা আমেরিকার জন্য হুমকি হতে পারে। আমার পিতার (সিনিয়র জর্জ বুশ) নেতৃত্বে যদিও আমেরিকা স্নায়ু যুদ্ধ করেছে, কিন্তু আজ আমাদের নিকট সুযোগ এসেছে আমরা আমাদের পুরাতন শত্রু-রুশ, চীন ও ভারতের সাথে মিলে মজবুত ও শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তুলি। আমেরিকা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মৌলবাদীদের উৎখাত করতে এবং তাদের দেশে স্বাধীন পরিবেশ তৈরি করতে অংশীদারিত্বের সাথেও মিলেমিশে কাজ করছে এবং করতে থাকবে। সে সকল দেশের (যার মধ্যে প্রায় দুনিয়ার অর্ধেক মানুষ রয়েছে)- ইসলামী মৌলবাদীদের উৎখাত করতে এবং তাদের চিরতরে নির্মূল করতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে।

কিন্তু আমি সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীর সামনে এই ঘোষণা করছি, ইসরাইলের সাথে আমাদের ঐক্য লৌহ প্রাচীরের মতই অটুট। আমি পূর্ণাঙ্গভাবে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধের সমর্থন করছি যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইসরাইলী প্রধান মন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারন। আজ আমি ঘোষণা দিচ্ছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়াসির আরাফাত ও তার অধীনে অন্যায় ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িতদের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করবে যারা আমাদের ইহুদী ভাইবোনদের হত্যা করছে এবং বোমা বিস্ফোরণে তাদেরকে উড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা আজকের পর নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নং প্রস্তাবের সমর্থন করব না, যার সমর্থনে আমেরিকা ১৯৬৭ সালে শান্তি-নিরাপত্তার খাতিরে ভোট দিয়েছিল। মি. শ্যারন একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আমরা দুই নৌকায় এক সাথে সওয়ার হতে পারি না- একদিকে আমরা বিন লাদেনের নেতৃত্বে চলমান ইসলামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করব, অপর দিকে ইসরাইলের পক্ষ হতে সুচিত এ ধরনের যুদ্ধেরও বিরোধিতা করব। ইসরাইল ৫৩ বছর ধরে আরব সেনাবাহিনী ও ফিলিস্তিনী দখলদারিত্বের সম্মুখীন। আমি জানি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ইসরাইলের এফ-১৬ বিমানের মাধ্যমে বেথেলহামের ওপর বোমাবর্ষণ করার নিন্দা করেছেন। কিন্তু আমি পূর্ণ বিশ্বাসের

সাথে একথা বলতে পারি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ও আমি একই ধ্যান-ধারণার অধিকারী। এজন্য আমার বিশ্বাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার অবশিষ্ট সময়গুলো ইসরাইলের শান্তি-নিরাপত্তার খাতিরেই অতিবাহিত হবে। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার কারণে ইসরাইলে সংঘটিত অর্থনৈতিক ক্ষতির বদলায় আমরা ইসরাইলকে দুই কোটি ডলারের সাহায্য প্রদান করেছি। আমরা ঐ সমস্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে ছাড়ব না যারা ইসরাইল ও আমাদের অন্যান্য মিত্র দেশগুলোর বিরোধিতা করে, তাদের ব্যাপারে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে স্পষ্ট।

আমরা আজকের পর কোন ধরনের প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার পরওয়া করব না। আমেরিকা আর এমন দেশ নয় যার নিকট দুনিয়া শান্তি-নিরাপত্তার জন্য আসবে বরং আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি এখন বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট। আমরাই সে সকল দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছুঁড়ে দেব, যাদেরকে আমরা টার্গেট বানাবো এবং আমরাই সে সকল দেশকে পুন:নির্মাণ ও পুর্নগঠনের পূর্বে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেব। আজকের পর আমরা হাত গুটিয়ে রেখে বিশ্বকে রক্তে ডুবন্ত দেখব না। আমেরিকা বিশ্ব শান্তির জন্য কাজ করবে। কিন্তু যদি আমাদের রক্ত প্রবাহিত করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা রক্ত অবশ্যই দেব। আজ থেকে সব সময়ের জন্য আমেরিকাই এ ফায়সালা করবে কবে, কোথায়, কিভাবে ও কেন যুদ্ধ করা হবে এবং কেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এই ইউনিয়নের অধিবেশনেই যা ২৯ জানুয়ারী ১৯৯১-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে আমার পিতা বলেছিলেন, আমি এই উচ্চ কক্ষে আপনাদেরকে ও সমগ্র আমেরিকানদেরকে একথা বলতে এসেছি, আজ আমরা' একটি সিদ্ধান্তকারী মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশ তথা মহাশূন্য, সমুদ্র ও মরুভূমি অঞ্চলে আমরা শক্তিশালী লড়াই ও জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা জানি, আমরা সেখানে কেন আছি? কারণ আমরা আমেরিকান জাতি এবং আমাদের চেয়ে একটি বড় জগতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কঠিন পরিশ্রম ও অবিরাম সংগ্রাম করে আসছি। আমরা মূলনীতি ও মানবতার আসন্ন বিপদ-আপদ ও হুমকি প্রতিরোধ করার জন্য বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছি।

উপস্থিত সুধি !

আমরা আশা করছি, আমি বিগত ১০ বছরে আরব ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ ও লড়াই করে এবং সে সকল দেশের মধ্যে অস্থিরতা-অনৈক্য বিস্তার করে বুশ বংশের উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করেছি। এখন আমাদেরকে কোন শাসক কিংবা কোন আরব বাদশাহ স্বীয় গাড়িতে জ্বালানি ভরতে বাধা প্রদান করতে পারবে না। কম পক্ষে এটা সে সময় পর্যন্ত তো হতে পারবে না যতক্ষণ আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকব। তারা পেট্রোলের উৎপাদন বৃদ্ধি তার মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য হবে। এমনিভাবে আমি মনে করি, বিন লাদেন ও অমানবিক কর্মকান্ডে জড়িতদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার মাঝে আমরা আমেরিকানরা সবাই সম্পদ অর্জনের সুযোগ পাবো। ১১ সেপ্টেম্বরে শহীদ হওয়া আমাদের হিরোদের সম্ভবত আমরা এভাবেই সম্মান করতে পারি। ধন্যবাদ। খোদা আমেরিকাকে রক্ষা করুন !

## বুশের ভাষণের আলোকে বিশ্বায়ন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জুনিয়রের উল্লিখিত ভাষণ দ্বারা মার্কিন সংকল্প ও উদ্দেশ্যাবলী বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে কোন নতুন কথা বলেন নি, বরং সে সমস্ত কথাই উল্লেখ করেছেন যা বিগত কয়েক বছর ধরে তারা করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু এ সব সংকল্প এত স্পষ্ট ও আগ্রাসী ভাষায় প্রকাশ সম্ভবত এটাই প্রথম। এই ভাষণে যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্লোবালাইজেশন শব্দের নাম নেননি কিন্তু বাস্তবতা এই যে, গোটা ভাষণই গ্লোবালাইজেশনের আসল উদ্দেশ্যকেই পূরণ করার সংকল্প ও ইচ্ছার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। কারণ গ্লোবালাইজেশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'আমেরিকানাইজেশন ছাড়া আর কিছুই নয়। জর্জ বুশ মার্কিন মূল্যবোধ, মার্কিন আধিপত্য ও মার্কিন মোড়লীপনাকে গোটা দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ইস্পাত কঠিন শপথ ও সংকল্প ঘোষণা করেছেন এবং অতীতে তার ইসলামবিদ্বেষী কৃতকর্মের ওপর গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করেছেন।

জর্জ বুশ ইসলাম বিদ্বেষী ও মার্কিন আধিপত্যকে গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার শুধু ইচ্ছাই করেন নি, বরং তা কাজে পরিণত করেও দেখিয়েছেন। এই ভাষণের পূর্বে ও পরে বিশ্ব মানচিত্রে সংঘটিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে এই

আলোকেই দেখা উচিত। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ হতে আফগানিস্তানের ধ্বংসলীলা, অত:পর ইরাকের ধ্বংস সাধন পর্যন্ত সকল ঘটনা এই ধারাবাহিকতারই অংশ। এতে সভ্যতার দাবীদার জাতি বর্বরতা ও পাশবিকতার যে প্রদর্শনী করেছে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়াও কঠিন। কিন্তু আফসোস, গোটা বিশ্ব এই বর্বরতা ও পাশবিকতা প্রত্যক্ষ করেও মুখে কুলুপ এঁটে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, এমন কি যুদ্ধাপরাধে জড়িত মার্কিন সৈন্যদের আশ্রয়ও দিচ্ছে। বিশ্বের ৪৩টি দরিদ্র দেশ আমেরিকার হুমকিতে এমন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার অধীনে তারা মানবাধিকার লংনের দায়ে যে কোন মার্কিন নাগরিক, সেনাবাহিনী কিংবা সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের আন্তর্জাতিক আদালতে (আইসিসি) মামলা করতে পারবে না। 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'- এর এক রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে, আমেরিকা এ সকল দেশকে ৩০ জুনের ভেতরে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার হুমকি দিয়েছিল। অন্যথায় তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেবে। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে দুনিয়ার ১৪০টি দেশে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। মোটকথা আজ বিশ্ব একটি সিদ্ধান্তকারী মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো সে নিজের জন্য ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার রাস্তা নির্বাচন করবে নতুবা মার্কিন আধিপত্য ও ইজারাদারি গ্রহণ করে গোলামী ও তাঁবেদারী মেনে নেবে এবং সে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের অংশ হয়ে যাবে। বাস্তবতা এই যে, বিশ্বায়নের নীতি নির্ধারকরা যে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের রূপরেখা ও খসড়া পেশ করেছিল তার রোড ম্যাপ তৈরি হয়ে গেছে। এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় কেবল এতটুকু দেরী আছে যে, সকল দেশের আঞ্চলিক সরকারগুলোকে নির্মূল করে জাতিসংঘের অধীন করে দেওয়া হবে, যা বাহ্যত কোন কঠিন কাজ মনে হয় না।[৮১]

---

[৮১]. দৈনিক রাষ্ট্রীয় সাহারা (উর্দু), নয়া দিল্লী, ৩ জুলাই, ২০০৩ইং।

তৃতীয় অধ্যায়

# অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন

## বস্তুপূজা ও বিশ্বায়ন

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, যে জাতিই এমন কোন নেতিবাচক আন্দোলন শুরু করেছে যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর পড়ে। তার মূল কারণ বস্তুপূজা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের প্রতিটি আন্দোলনের পেছনে এক জাতি অন্য জাতির ওপর বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য অর্জনের অনুপ্রেরণা কাজ করে যাতে সে জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য্যের অপ্রতুলতা প্রতিবন্ধক না হয়। প্রাচীনকাল হতেই মানবেতিহাস এমন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত, যে ব্যবস্থায় প্রাচুর্যের মোহ, অতিশয় ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অভিলাষের ফলে শক্তিশালী জাতি দুর্বল জাতির ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। বস্তুগতভাবে নিজেদেরকে মজবুত ও সুসংহত করার জন্য অন্য জাতির ওপর বিভিন্ন অস্ত্র ও হাতিয়ার প্রয়োগ করেছে। তাদের ওপর আগ্রাসন চালিয়েছে। লোকদেরকে গোলাম ও দাস বানিয়েছে এবং তাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করে নিয়েছে। এই নগ্ন পাশবিকতা কেবল ধন-সম্পদ অর্জনের জন্যই করা হয়েছে।

ইউরোপ যখন নতুন যুগে পা রাখল তখন সাইন্স বা বিজ্ঞানকে কেবল থিউরি কিংবা মতবাদ হিসেবেই গ্রহণ করল না, বরং তা অভিজ্ঞতা পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করল এবং এর সাহায্যে নিত্য-নতুন জিনিস আবিষ্কার করল। তখন থেকেই ইউরোপ প্রাচ্যের ধন-সম্পদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিতে লাগল। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের এই সয়লাব পাশ্চাত্য হতে প্রবাহিত হয়ে প্রাচ্যের এশিয়া ও দক্ষিণের আফ্রিকার আঙ্গিনায় এসে উপচে পড়ল এবং বিশ্বের বিশাল ও বিস্তৃত অঞ্চলকে নিজেদের কলোনীতে পরিণত করল। যদি সে সময়কার সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করা হয় তাহলে বস্তুপূজার দিকেই দৃষ্টি চলে যায়। ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অন্ধ নেশা পশ্চিমা জাতিকে প্রাচ্যের দিকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূর্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হওয়ার সাথে সাথেই সাম্রাজ্যবাদের লালিমা তার চাদর ছড়িয়ে দিল। অর্ধ শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই সাম্রাজ্যবাদ

পরিপূর্ণভাবে অস্তমিত হয়ে গেল এবং বছরের পর বছর গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ দেশগুলো স্বাধীনতার নতুন প্রভাতে পা রাখল। কিন্তু কয়েক বছর নীরবতার পর আবার সাম্রাজ্যবাদ স্বীয় পুরাতন কলোনীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল যেন সে আবার সাবেক কলোনীর দিকে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করছিল। যদিও এবার তার আকৃতি-প্রকৃতি ও লেবাস-পোশাক পরিবর্তিত ছিল এবং বহুজাতিক কোম্পানী তার নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সে সময় এ সকল কোম্পানীর নিজস্ব দেশ তো ছিল কিন্তু তারা সীমান্ত হতে সম্পূর্ণ অপরিচিতি ছিল। এজন্য তারা দেশীয় সীমারেখার পরওয়া করা ছাড়াই সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে লাগল এবং প্রাচ্যকে আবার একবার স্বীয় শৃংখলে আবদ্ধ করে ফেলল। গ্লোবালাইজেশনের এমনিই তো কর্মক্ষেত্র রয়েছে! কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার অবদান সবচেয়ে বেশী, এমন কি এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ তো গ্লোবালাইজেশনকে শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করেছেন!

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন চায় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র দেশীয় সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকুক, বরং প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে কিংবা দলগতভাবে অন্য দেশে বিনিয়োগ করবে এবং এর পরিবর্তে তার মুনাফা অর্জন করার অধিকার থাকবে। আধুনিক পরিভাষায় একেই বিশ্ব বাণিজ্য বলে। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য এ বিষয়টি আবশ্যকীয় ছিল যে, বাণিজ্য ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধের অনুমতি থাকবে না, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নিজস্ব দেশ ও মাতৃভূমি হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিশ্বের সকল বাজারের দরজা তার জন্য খুলে দেওয়া হবে। এজন্য বিশ্বায়নের পতাকাবাহকরা এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করল, যেতে দাও কাজ করতে দাও। কিন্তু এদিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই যে, কে কোথায় যাচ্ছে এবং কি কাজ করছে?

প্রকাশ থাকে, ব্যক্তিগত ও একক উদ্যোগে বিশ্ব বাণিজ্যে বড় ধরনের বিনিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। এজন্য বহুজাতিক কোম্পানী অস্তিত্ব লাভ করল। তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য সেক্টরে বিনিয়োগ করল এবং স্বীয় মালিকদের পকেট ও পেট ভরল। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের বাহ্যিক স্লোগান ও দাবী এই যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। দারিদ্র্য নির্মূল হবে। প্রতিটি পণ্য উপযুক্ত মূল্যে ও বিপুল পরিমাণে হস্তগত হবে। প্রতিটি দেশের পণ্য সকল বাজারে বিক্রি হবে। ফলে সে যুগের অবসান হবে যে যুগে বিভিন্ন বস্তু, এমন কি পানাহারের বস্তু পর্যন্ত কেবল সে সব লোকের হস্তগত হতো, যাদের ছিল বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ।

কিন্তু যদি অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে এ বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গ্লোবালাইজেশন স্বচ্ছল ও মানসম্পন্ন জীবন সৃষ্টির পরিবর্তে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ। এ ব্যবস্থায় স্বচ্ছলতা অবশ্যই আসে কিন্তু তা কেবল বহুজাতিক কোম্পানির মালিকদের ঘরেই আসে, যারা বিভিন্ন দেশে জনসাধারণের পয়সায় স্বীয় মালিকদের পেট ভরার কাজে ব্যস্ত, অথচ উন্নয়নশীল দেশগুলো যারা উন্নত হওয়ার অভিলাষে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তারা ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের শিকার হয়ে যাচ্ছে।[৮২]

## অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কর্ম পদ্ধতি

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন মূলত পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাকে ভিত্তি বানিয়ে তার নির্ধারিত মূলনীতির আলোকে স্বীয় বস্তুগত অগ্রযাত্রার সূচনা করেছে। গ্লোবালাইজেশনের নীতি নির্ধারকদের সম্মুখে যে বিষয়টি ছিল তা হলো যদি এ ব্যবস্থায় কোম্পানী ও তার মালিকদের সীমা ও হিসেব ছাড়া উপকার হয় তাহলে সে সকল দেশেরও ফায়দা অর্জন হবে যে সকল দেশের সাথে এই কোম্পানীগুলো সম্বন্ধযুক্ত। তাদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল বিশ্ব অর্থনীতি মুষ্টিমেয় হাতে গণা কিছু কোম্পানীর কব্জায় থাকবে। আমদানী-রফতানী তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং জনগণের উপার্জনের বিরাট একটি অংশ কোম্পানীর মালিকদের ব্যাংক একাউন্টে জমা হতে থাকবে। আর অপর দিকে এ সকল কোম্পানী যেসব দেশে বাণিজ্য করছে তাদেরকে সামান্য কিছু ট্যাক্স দিয়ে আঁচল ঝেড়ে নেবে এবং স্বীয় দেশকে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স দিয়ে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত ও সুসংহত করবে।

প্রকাশ থাকে, যখন প্রতিটি দেশের ছোট-বড় বাজারে কয়েকটি মাত্র দেশের কোম্পানীর পণ্য বিক্রি হবে তখন সে সকল কোম্পানীর কখনো কোনো ক্ষতি বা লোকসান হবে না। ফলে মালিকদের পক্ষ হতে স্বীয় দেশকে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স দেওয়ার ভিত্তিতে সে সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত ও সুসংহত হবে। উদাহরণস্বরূপ এক টাকার একটি পণ্য তৈরিতে তার ৩০ পয়সা খরচ হয়। তন্মধ্যে ১০ পয়সা স্থানীয় সরকারকে ট্যাক্স হিসেবে দেয়। ২৫ পয়সা মালিকরা তাদের দেশের সরকারকে ট্যাক্স হিসেবে দেয়। আর বাকী পয়সা দিয়ে মালিকরা নিজেদের

[৮২]। মা-ল আওলামাহ। হাসান হানাফীকৃত, পৃ-২৪।

পেট ভরে। যেমন ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিটি নেতিবাচক আন্দোলনের পেছনে বস্তুর মোহ অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

এজন্য নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রেরণা এই বস্তুর মোহ এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ও সুসংহত হওয়ার নেশা। জায়নিস্ট নীতি নির্ধারকরা এই ব্যবস্থাকে যেমনিভাবে গোটা বিশ্বের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য তৈরি করেছে, তেমনিভাবে তাদের মধ্যে এ উদ্দেশ্যও কাজ করছিল যে, যখন গোটা দুনিয়া তাদের তথাকথিত আইনের অধীন হয়ে যাবে তখন প্রতিটি দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জনের বড় একটি অংশ তাদের খাদ্যে পরিণত হবে। কিন্তু এমন কি হওয়া সম্ভব? জায়নিস্ট পরিকল্পনা এতদিনে কোন স্তরে পৌঁছেছে? তাদের কর্ম পদ্ধতি কি? অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কি? এ সকল প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করার পূর্বে আসুন পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে আগে কিছু বিশ্লেষণ করি যার উপর বিশ্বায়নের ভীত প্রতিষ্ঠিত।

**পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাঃ** পুঁজিবাদী ব্যবস্থা (Capitalism) একটি অর্থ ব্যবস্থা, যা পশ্চিমা জগতের উদ্ভাবন। দুনিয়ার অন্যান্য অর্থ ব্যবস্থা যেমনিভাবে মানবের প্রয়োজন পূরণে অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও মানবের প্রয়োজন পুরা করার জন্য অস্তিত্বশীল হয়েছে। কিন্তু এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই যে, এই ব্যবস্থা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করছে না, তাদের মুখ থেকে গ্রাস কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতিদের মুখে তুলে দিচ্ছে।

দুনিয়ার যে অর্থ ব্যবস্থাই হোক, তা এমন কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে যার সমাধান ছাড়া সে ব্যবস্থা কার্যকরী হতে পারে না। সাধারণত মৌলিক সমস্যা ৪টি:

**(১) আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ (Determination of Priorities):** প্রথম সমস্যা যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ বলা হয়। এর সারমর্ম হলো, মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অগণিত। আর চাহিদার তুলনায় উপকরণ সীমিত, এই সীতিম উপকরণ দিয়ে সকল প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য কিছু চাহিদা ও প্রয়োজনকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। আর কিছুকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। সুতরাং মানুষের নিকট যে সীমিত উপকরণ রয়েছে তার ভিত্তিতে সে নিজেই নির্ধারণ করবে যে, কোন বস্তুর উৎপাদনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে আর কোন জিনিসের উৎপাদনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে না। কোন পণ্য বাজারে আনা হবে আর কোন পণ্য বাজারে আনা

হবে না। মোট কথা, সেই উপকরণকে কোন্ কাজে লাগানো হবে? এর নামই হলো আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ।

**(২) উপকরণ বিভাজন (Allocation of Resources):** দ্বিতীয় সমস্যা হলো 'উপকরণ বিভাজন', আমাদের নিকট উৎপাদনের উপকরণ আছে অর্থাৎ মূলধন, শ্রম, জমি ইত্যাদি। এগুলোকে আমরা কোন কাজে কি পরিমাণ ব্যয় করব? মনে করি আমাদের জমি আছে। এখন কতটুকু জমিতে গম, কতটুকুতে ধান এবং কতটুকুতে তুলা উৎপাদন করব? তেমনি আমাদের কারখানা তৈরির সামর্থ্য আছে। আমরা কাপড়ও তৈরি করতে পারি। স্যান্ডেল তৈরি করতে পারি, পানাহারের দ্রব্যও প্রস্তুত করতে পারি। এখন কয়টি কারখানাকে কাপড় তৈরিতে, কয়টিকে স্যান্ডেল তৈরিতে এবং কয়টিকে পানাহার সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করব? এ প্রশ্ন নির্ধারণকে অর্থনৈতিক পরিভায়ায়- "উপকরণ বিভাজন" বলে।

**(৩) আয়ের বন্টন (Distribution of Income):** তৃতীয় সমস্যা আয় বা উৎপাদনের বন্টন। অর্থাৎ উল্লিখিত উপকরণগুলোকে কাজে লাগানোর পর অর্জিত উৎপাদন বা আয়কে সমাজে কিভাবে, কিসের ভিত্তিতে বন্টন করা হবে? একে অর্থনীতির পরিভাষায় "আয়ের বন্টন" বলে।

**(৪) উন্নয়ন (Development):** ৪র্থ সমস্যা "উন্নয়ন" অর্থাৎ অর্থনৈতিক উৎপাদনকে কিভাবে উন্নত করা হবে? যাতে উৎপাদিত দ্রব্য মান ও পরিমাণগত দিক দিয়ে উন্নত হয় এবং কিভাবে নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তির কৌশল আবিষ্কার করা যায় যেন অর্থনীতির উন্নয়ন হয়, জনগণের উপায়-উপকরণ বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের আয়ের বিভিন্ন উৎস সৃষ্টি হয়? এই সমস্যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় "উন্নয়ন" বলে। এ চারটি মৌলিক সমস্যা, প্রতিটি অবস্থাতেই এগুলোর সমাধান জরুরী। [৮৩]

## পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এই সমস্যাগুলোর কী সমাধান উপস্থাপন করেছে

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার দাবী, এই চারটি মৌলিক সমস্যার সমাধানের একটি মাত্র পথ, আর তা হলো প্রত্যেক মানুষকে বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য একেবারে মুক্ত ছেড়ে দিতে হবে। যথাসম্ভব বেশী লাভবান হওয়ার জন্য যে কোন পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যাপারে ছাড় দিতে হবে। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক চারটি

---

৮৩। ইসলাম আওর জাদীদ-মায়ীশাত ওয়া তিজারত। বিচারপতি তকী উসমানী, পৃ.২০-২১।

সমস্যার সমাধান এমনি এমনিই হয়ে যাবে। কারণ যখন বেশী মুনাফা অর্জনই প্রত্যেকের লক্ষ্য হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থনীতির ময়দানে এমন কাজ করবে সমাজে যার প্রয়োজন। ফলে প্রতিটি সমস্যা পর্যায়ক্রমে সমাধান হয়ে যাবে।

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার দর্শন বলে যোগান ও চাহিদার (Demand and Supply) প্রাকৃতিক নীতিই বাস্তবে কৃষকদের নির্ধারণ করে দেয় যে, সে কী উৎপন্ন করবে। এ নীতিই শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদেরকে নির্ধারণ করে দেয় যে, সে কোন জিনিস কী পরিমাণে বাজারজাত করবে। এমনিভাবে অর্থনীতির উল্লিখিত চারটি সমস্যা অবলীলায় সমাধান হয়ে যাবে। কারণ যোগান ও চাহিদার নীতি হলো, বাজারে যে বস্তুর যোগান ও সাপ্লাই চাহিদার তুলনায় বেশী হবে তার মূল্য হ্রাস পেয়ে যাবে। চাহিদা ও যোগান নীতি দ্বারা আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ এভাবে হবে যে, যখন আমরা প্রত্যেককে যথাসম্ভব বেশী মুনাফা অর্জনের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেব তখন তারা প্রতিটি মুনাফার জন্য এমন পণ্যই বাজারজাত করার প্রচেষ্টা করবে, যার প্রয়োজন ও চাহিদা বেশী, যাতে সে বেশী মুনাফা অর্জন করতে পারে। এমনিভাবে যোগান ও চাহিদার নীতি তাকে বাধ্য করবে যে, সে কোন জিনিস উৎপাদন করবে আর কোন জিনিস উৎপাদন করবে না। এই নীতিই দ্বিতীয় সমস্যা অর্থাৎ উপকরণের বিভাজন সমস্যার সমাধান করবে। কারণ বাজারে যে জিনিসের প্রয়োজন ও চাহিদা যত বেশী হবে, ব্যবসায়ী সে বস্তুকে চাহিদা ও পরিমাণমত বাজারজাতকরণের জন্য সে অনুপাতেই উপকরণ সরবরাহ করবে। চাহিদা ও প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে বেশী কিংবা কম উপকরণ সরবরাহ করবে না। কারণ এর ফলে তার লোকসান হতে পারে। তাই যোগান ও চাহিদার নীতি দ্বারা উপকরণের বিভাজন সমস্যা অবলীলায় সমাধান হয়ে যায়। তৃতীয় সমস্যা হলো আয়ের বণ্টন। কিছু উপকরণ কাজে লাগানোর মাধ্যমে যা উৎপাদন বা আয় হয়, সমাজে তা কিসের ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে? পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার কথা হলো, যা কিছু আয় হবে তা উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যেই বণ্টন করতে হবে।

## পুঁজিবাদী দর্শন অনুযায়ী উৎপাদনের উপাদান ৪টি

১. ভূমি ২. শ্রম ৩. মূলধন বা পুঁজি ও ৪. সংগঠন

সংগঠনের উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যিনি কোন কিছু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমি, শ্রম ও মূলধন একত্র করেন। এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং উৎপাদনের

যাবতীয় ঝুঁকি বহনসহ সত্যিকারভাবে উৎপাদন কার্য তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করেন অর্থাৎ প্রতিটির বিনিময় তাদের চাহিদা ও যোগানের ওপর নির্ভর করে যার চাহিদা বেশী হবে তার বিনিময়ও বেশী হবে।

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার আসল কথা হলো উৎপাদনের ফলে যে আয় হবে তা এমনভাবে বণ্টন বা বিভাজন হতে হবে যাতে ভূমি সরবরাহকারীকে ভাড়া দেওয়া যায়, শ্রম ব্যয়কারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া যায়, পুঁজি সরবরাহকারীকে সুদ দেওয়া যায় এবং যে উদ্যোক্তা এই উৎপাদনের মূল সংগঠক ছিল তাকেও মুনাফা দেওয়া যায়। অত:পর কোন উদ্যোক্তা কতটুকু পাবে তা নির্ধারণের জন্য পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার যোগান ও চাহিদানুসারে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। সুতরাং যে উদ্যোক্তার চাহিদা বেশী হবে, তার মজুরিও বেশী হবে। মনে করি যায়েদ একটি কাপড়ের কারখানা স্থাপন করতে চাচ্ছে। তাই লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদনের উপাদানগুলো একত্র করার দায়িত্ব তারই। এজন্য অর্থনীতির পরিভাষায় তাকে উদ্যোক্তা বলে। কারখানার জন্য প্রথমে জমি দরকার। যদি তার জমি না থাকে তাহলে অন্যের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিতে হবে। এখন জমির ভাড়া যোগান ও চাহিদা অনুসারে হবে অর্থাৎ যদি ভাড়া প্রদানকারীর সংখ্যা বেশী হয় এবং সে তুলনায় গ্রহীতা কম হয় তাহলে জমি ভাড়া অবশ্যই কম হবে। এর উল্টো হলে ভাড়া বেশী হবে। তাই যোগান ও চাহিদাই জমির ভাড়া নির্ধারণ করবে। এরপর তার কারখানা, মেশিনারিজ ও কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য পুঁজিরও প্রয়োজন। এই অর্থ ব্যবস্থায় পুঁজি সরবরাহকারীকে সুদ দিতে হবে। সুতরাং পুঁজি যোগানদাতাদের সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহলে সুদের হার কম হবে। আর যদি পুঁজি যোগানদাতার সংখ্যা কম হয় তাহলে সুদের হার বেশী হবে। এমনিভাবে কারখানায় কাজ করার জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন, যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় শ্রম বলে। তাদের মজুরি দিতে হবে। এ মজুরি নির্ধারণ যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে হবে। অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা বেশী হলে শ্রমের যোগান বেশী হবে। তাদের মজুরি কম হবে। কিন্তু যদি কারখানায় কাজ করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিক পাওয়া না যায় তাহলে শ্রমের যোগান কম হবে, তখন তাদের মজুরি বেশী হবে। তাই যোগান ও চাহিদানুসারে উভয়ের আলোচনার মাধ্যমে মজুরি নির্ধারিত হবে। এভাবে যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতেই ভাড়া, মজুরি ও সুদের পরিমাণ নির্ধারিত হয় এবং কারখানায় উৎপাদনের ভিত্তিতে আয়ের অবশিষ্ট অংশ মুনাফা হিসেবে

উদ্যোক্তা পায়। তাই আয়ের বণ্টনের সমস্যার সমাধানও ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে।

চতুর্থ সমস্যা উন্নয়ন, প্রতিটি অর্থ ব্যবস্থাই নিজের উৎপাদনের উন্নয়ন, গুণগত ও পরিমাণগত মান বৃদ্ধির প্রতি জোর দিয়ে থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার দর্শনে এ সমস্যাও চাহিদা ও যোগানের নীতির অধীনে সমাধান হয়। কেননা যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাসম্ভব বেশী মুনাফা অর্জনের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হবে তখন চাহিদা ও যোগানের প্রাকৃতিক নীতি এমনিতেই তাকে নতুন নতুন পণ্য ও উন্নততর কোয়ালিটি বাজারজাত করতে বাধ্য করবে যেন তার উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বেশী হয় এবং মুনাফা বেশী অর্জন করা যায়।[৮৪]

## পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার নীতিসমূহ

ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মৌলিক নীতি ৩টি। যথা:

**১. সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা (Private property)**: এই অর্থ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় মালিকানায় সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণ রাখতে পারে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজস্ব ব্যবহারিক দ্রব্য ব্যক্তি মালিকানায় স্বীকৃত হলেও উৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ ভূমি অথবা কারখানা স্বীকৃত নয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার ব্যবহারিক দ্রব্য ও উৎপাদনের উপকরণ সব কিছু ব্যক্তি মালিকানায় স্বীকৃত।

**২. মুনাফা অর্জন (Profit motive)**: পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার দ্বিতীয় মূলনীতি হলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্যে কাজ পরিচালিত হয় তা হলো, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন। মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালনা অর্থাৎ প্রত্যেক উৎপাদনকারীর লক্ষ্য হলো সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।

**৩. রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি (Laissez faire)**: ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার তৃতীয় মূলনীতি হলো রাষ্ট্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে না। তারা যেভাবে কাজ চালিয়ে যায় তাতে বাধা দেয় না। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হয় না। এ ভিত্তিতেই বলা হয় যে, সব চেয়ে উত্তম সরকার বা রাষ্ট্র হলো, যে সরকার কম হস্তক্ষেপ করে অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে না।[৮৫]

---

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।
৮৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

## পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা

সমাজতন্ত্রের পতনের পর পশ্চিমা দেশসমূহে পুঁজিবাদ মহাধুমধামের সাথে উল্লাস ধ্বনি করতে লাগল এবং দাবী করে বসল যে, যখন সমাজতন্ত্র বাস্তব জীবনে বিফল হয়েছে তখন ধনতন্ত্রের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। মূলত ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মৌলিক দর্শনে এতটুকু কথা ঠিক যে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন এবং বাজারের শক্তি অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে কাজ সমাধা করা জরুরী। কারণ তা মানবিক স্বভাবের চাহিদা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভুল হয়েছে প্রত্যেককে লাগামহীনভাবে অধিকতর মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতা দিয়ে। এতে হালাল-হারামের কোন পার্থক্য নেই এবং জনকল্যাণের দিকেও মনোযোগ নেই। সুতরাং এমন পদ্ধতি অবলম্বন করাও বৈধ হয়ে গিয়েছে, যার ফলে একজন ব্যক্তি অধিকতর সম্পদশালী হয়ে বাজারে ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত করে নেবে।

মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য না থাকার কারণে অনেক অনিষ্ট সমাজে বিস্তার লাভ করে। কারণ তা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনে অধিকাংশ মানুষের মনোবৃত্তিকে আকর্ষণ করে। তার অন্যান্য চাহিদাবলী মেটাতে উপকরণ সরবরাহ করে। এতে সমাজে চারিত্রিক অনিষ্ট বিস্তার লাভ করে। পশ্চিমা দেশসমূহের নগ্নতা ও বেহায়াপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটাও যে, নগ্ন ছবি ও ফিল্মের সয়লাব সমাজে বিস্তার করে মানুষ ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মহিলারা শরীরের একেকটি অঙ্গ এ উদ্দেশেই বাজারে বিক্রি করছে। সম্প্রতি একটি রিপোর্ট অনুসারে সমস্ত কারবারের মধ্যে বেশী লাভজনক কারবার 'মডেল গার্লস' এর কারবার। এরা স্বীয় ছবিসমূহ উৎপাদিত শিল্প ও দ্রব্যের ওপর ছাপাতে অথবা বিজ্ঞাপনের অংশ তৈরিতে প্রদান করে মোটা অংকের প্রতিদান গ্রহণ করে। বর্তমানে এ গোষ্ঠী আমেরিকার সর্বাধিক উপার্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

দু:খজনক ব্যাপার হলো, এর ওপর যে লাখ লাখ ডলার ব্যয় করা হচ্ছে, শেষে তা উৎপাদন মূল্যে সংযোজন হয়ে সাধারণ ক্রেতাদের পকেট থেকে যাচ্ছে। এভাবে সকল জাতি এ দুশ্চরিত্রদের খরচ বহন করছে।[৮৬] উল্লিখিত রিপোর্ট ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় সম্পর্কে। অর্থনীতি- যা এই ব্যবস্থার মুখ্য আলোচ্য বিষয়- তাও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দর্শনের কারণে পতনের

---

৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

ও অবক্ষয়ের শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে পারেনি। সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মুষ্টিতে এসে গেছে। আর প্রকৃত পক্ষে এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যও এই যে, গোটা দুনিয়ার পুঁজির ওপর হাতে গোণা কিছু লোকের ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হবে। খুব নগণ্য সংখ্যক লোক এমন আছে যাদের কোন না কোনভাবে রুজি-রুটি যোগাড় হয়ে যায়। আর বাকী সংখ্যক লোকের এক বেলা খাবারের জন্যও চিন্তা-ভাবনা করতে হয়।

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ফলে বেকারত্বের হার বিপুল আকারে বেড়ে গেছে। জনমত জরিপে এ বিস্ময়কর বাস্তবতা সামনে আসে। সুতরাং দেখা যায়, বিশ্বে ৮০০ মিলিয়ন লোক বেকার। তাদের কোন কর্ম সংস্থান নেই। এই সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ১০ বছরে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিকশিত দুনিয়ার ৫০০ বড় বড় কোম্পানী প্রতি বছর প্রায় চার লাখ শ্রমিক ছাঁটাই করছে, অথচ সেসব কোম্পানীর মুনাফা হ্রাস হচ্ছে না, বছর প্রতি নতুন অর্থ বছরে মুনাফার হার বৃদ্ধিই হতে দেখা যাচ্ছে। সেসব কোম্পানীর মধ্যে একটি কোম্পানী তার প্রত্যেক বিনিয়োগকারীকে ৫ মিলিয়ন ডলার মুনাফা হিসেবে প্রদান করেছে।[৮৭]

## পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার প্রাচীন পশ্চিমা দর্শন

পশ্চিমা জগত তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মজবুত ও সুসংহত করার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন পেশ করেছে তা কোন নতুন দর্শন নয়, বরং তার সম্পর্ক প্রাচীন গ্রীক দর্শনের সাথে, এমন কি এই ব্যবস্থায় গ্রীক দার্শনিক 'প্লেটো' ও সফিসটিক গোত্রের মাঝে মতানৈক্য ও দ্বন্দ্বও পাওয়া যায়। পশ্চিমা লেখক জন বোকার ও হিনরী ট্রোমেন লেখেন যে, সফিসটিক সম্প্রদায় গ্রীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পতাকাবাহক ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, প্রত্যেক ব্যক্তির পরিপূর্ণ বাণিজ্য স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্র কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তার বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার মধ্যে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। পক্ষান্তরে তাদের মোকাবেলায় প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর বক্তব্য ছিল, অর্থনৈতিক ময়দানে এতটুকু ঢিল দেওয়া উচিত নয় যে, সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে আর বাকি লোক তা হতে বঞ্চিত হবে। তাদের বক্তব্য ছিল, ভূ-

---

৮৭। আল আরব ওয়াল আওলামাহ, পৃ. ১৪১।

পৃষ্ঠে জীবন যাপনের জন্য অধিকতর ন্যায়-ইনসাফ ও সাম্য-মৈত্রী জরুরী, যাতে লোকদের মধ্যে শান্তি-নিরাপত্তার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এজন্য এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যা দেশে ইনসাফের আধিপত্য নিশ্চিত করবে।

প্লেটোর প্রস্তাবিত আইন মতে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে ততটুকু সম্পদই আসতে পারে যতটুকু সে কাজ করেছে কিংবা সে কাজে অংশ গ্রহণ করেছে। প্লেটোর পর দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল মাঝামাঝি এক প্রস্তাব বা দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তো অর্জিত হওয়া উচিত কিন্তু সাথে সাথে আবার প্রতিটি শহরে এমন এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও জরুরী যা ব্যবসায়ীদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং দেশকে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা হতে রক্ষা করবে। মার্কিন শ্রমিকদের মধ্যেও গ্রীক দর্শনের ব্যাপারে মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু তারা সফিসটিক গোত্রের মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার ফয়সালা করে। জর্জ ওয়াশিংটন, ফ্রাঙ্কলিন ও জেফার্সনদের মত সাম্রাজ্যবাদী লোকেরা ভাল করেই জানতেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদকে কতটুকু বিকশিত করতে পারে। তাই তারা প্লেটোর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করে সফিসটিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন এবং এটিই মার্কিন অর্থনীতির মূলনীতি ও ভিত্তি সাব্যস্ত হলো।[৮৮] সামনে অগ্রসর হয়ে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার এই দর্শন বিশ্বায়নের বুনিয়াদ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কারণ পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা যেমনিভাবে স্বাধীনতা ও মুক্তবাদিতার প্রবক্তা তেমনিভাবে গ্লোবালাইজেশনও বাণিজ্য স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক ময়দানকে সকল প্রকারের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত রাখার পতাকাবাহক। এজন্য এই ফলাফলে উপনীত হওয়া কোন কঠিন বিষয় নয় যে, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে গোটা দুনিয়ার ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের পকেটে গুটিয়ে আসে এবং তারাই প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জনের প্রকৃত মালিক ও হকদার হয়ে বসে, অথচ গোটা বিশ্ব আজ বঞ্চিতের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। যে সকল দেশে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বাস্তবায়িত হয়ে গেছে সেখানে সম্পদশালী লোক তারাই যাদের রয়েছে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিজ ও কল-কারখানা।

কিন্তু ধনকুবের শ্রেণী থেকে শুরু করে নিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যাংকের কাছে ঋণী এবং সুদের বোঝাতলে পিষ্ট হচ্ছে।

---

৮৮। আমেরিকা আল-মুস্তাবাদ্দাহ, আল উলায়াতুল মুত্তাহিদাহ ওয়া সিয়াসাতুস-সায়তারাহ আলাল আলম, পৃ.২০।

সে সকল দেশের লোকদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ঋণ নিতে হচ্ছে। অত:পর নিজের জীবনের এক বিরাট অংশ ঋণ পরিশোধ করার জন্য নি:শেষ করে দিচ্ছে। এক ব্যক্তি কোন ব্যাংককে, সেই ব্যাংক কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীকে ঋণ পরিশোধ করে।

ঋণের পর ঋণ ও সুদের পর সুদের এই ধারাবাহিকতা যে ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের ওপর গিয়ে শেষ হয় সে-ই প্রকৃত প্রস্তাবে জনসাধারণের উপার্জনের চাবি ঘোরানোর আসল মালিক। সে খুব মজার সাথে তাদের রুজি-রুটির ওপর সর্প হয়ে বসে আছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য এই যে, মুষ্টিমেয় হাতে গোনা বিশ্বায়নের কিছু নীতি-নির্ধারক গোটা বিশ্বের সম্পদের ওপর কব্জা করে আছে। প্রতিটি ডলার পাউন্ডের তারা মালিক এবং জনসাধারণের পেটে যাওয়া রুটির টুকরারও তারা মালিক। তাদের অনুমতিতেই পেটে যাওয়ার রাস্তা নির্ধারিত হয়।

## অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন কিভাবে বিকাশ লাভ করল

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশন বিকাশ দানের জন্য সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জনগণের মস্তিষ্ক ধোলাই করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উন্নতি অগ্রগতি দানের জন্য নিজ দেশের পণ্য ও শিল্পের চেয়ে বিদেশী পণ্য ও শিল্পকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে জনগণকে অভ্যস্ত করে তোলা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাতে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক শিল্প ও পণ্য নির্মূল হয়ে যায় কিংবা তাদের ক্রেতা অন্যান্য দেশে বিদ্যমান থাকলেও যাতে দেশীয় খরিদারদের ব্যাপারে তারা ভয় ও শংকা বোধ করতে থাকে এমন কি এক দেশের পণ্য তার সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যেন গোটা বিশ্বে তা ছড়িয়ে যায়!

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে 'গ্যাট' (GATT) নামক চুক্তি (যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে) অস্তিত্ব লাভ করে। এই চুক্তি অনুযায়ী চুক্তিতে দস্তখতকারী প্রতিটি দেশের জন্য আবশ্যকীয় হলো, তারা যেন দেশী কিংবা বিদেশী পণ্য সামগ্রীর মাঝে ট্যাক্স ইত্যাদির ব্যাপারে কোন ধরনের পার্থক্য বা বাছ-বিচার না করে, বরং সকল শিল্প ও প্রডাক্টকে এই দৃষ্টিতে দেখবে, যাতে বিদেশী কোম্পানীগুলো চড়া ট্যাক্স না হওয়ার কারণে নিজেদের পণ্য সামগ্রী স্বল্প মূল্যে বিক্রি করতে পারে। ফলাফল এই হবে যে, বিদেশী পণ্য দেশীয় উৎপাদন ও শিল্পের মোকাবেলায় বেশী চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ার কারণে বাজারে ব্যাপক

হয়ে যাবে এবং স্থানীয় শিল্পের ওপর বিজয় লাভ করবে, বিশেষ করে সে সকল দেশে যেখানে জীবন যাপন তুলনামূলক নিম্ন। যেমন ভারত উপমহাদেশ, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ। এ সকল দেশের অর্থনীতিকে বিদেশী, বিশেষ করে পশ্চিমা কোম্পানীগুলো গ্রাস করে চলেছে।

প্রতিটি দেশের বাজারে বহুজাতিক কোম্পানীর ইজারাদারি প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন বিশ্বায়নবাদীরা দেখেছিল তা বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য তারা এ বিষয়ে বেশী জোর দিয়েছে যে, ছোট ছোট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো (Small business)- নির্মূল করে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানী তাদের শাখা-প্রশাখা ও ব্রাঞ্চ গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহরে ছড়িয়ে দেবে, যাতে জনসাধারণ ঐ সব কোম্পানীর জিনিসপত্র কিনতেই বাধ্য হয় এবং তাদের পকেটের এক টাকার মধ্যে ৯০ পয়সাই যেন বিদেশী কোম্পানীর মালিকদের পকেটে ঢোকে। কিন্তু তা তখনই সম্ভবপর যখন জনসাধারণের মগজ ধোলাই করা হবে এবং মস্তিষ্ক তৈরি করা হবে। এজন্য খুব জোরেশোরে একথা প্রচার করা হলো, ব্যক্তিগত দোকান বা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে কোম্পানীর ব্রাঞ্চ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করা উন্নত ও মানসম্মত জীবন-যাপনের গ্যারান্টি। জনগনের মস্তিষ্কে একথা বসিয়ে দেওয়া হলো যে, ছোট দোকান থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করার পরিবর্তে কোম্পানীর ব্রাঞ্চ থেকে পণ্য ক্রয়ের মধ্যেই বেশী সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। পশ্চিমা, বিশেষ করে মার্কিন জনগণ সর্বপ্রথম এই সুবিধা দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত দোকানের হার খুবই কম। সাধারণ জনগণ বিভিন্ন কোম্পানীর ব্রাঞ্চ কিংবা সে সকল বাণিজ্য কেন্দ্র থেকেই পণ্য খরিদ করাকে বেশী প্রাধান্য দেয় যার ব্রাঞ্চ প্রায় প্রতিটি শহরেই পাওয়া যায়। ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় ও সাধারণ ব্যবহৃত আসবাবপত্র পর্যন্ত সে সকল কেন্দ্র হতেই ক্রয় করা হয়। এ ধরনের কেন্দ্রের মধ্যে ওয়াল মার্ট (Wal mart)- এর নামও উল্লেখযোগ্য- আমেরিকায় যার প্রায় এক হাজার ব্রাঞ্চ রয়েছে। ১৯৯৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মালিকের নিকট প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের ব্যাংক ব্যালেন্স সব সময় বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের বিজ্ঞাপন এখন অনুন্নত দেশগুলোতেও হওয়া শুরু হয়েছে, এমন কি পশ্চিমা প্রভাবিত আরব দেশগুলোতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়ে গেছে।

আর এখন উপমহাদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে এই ধ্যান-ধারণাকে পূর্ণ শক্তির সাথে ব্যাপক ও বিস্তারিত করা হচ্ছে। ব্যক্তিগতকরণ ও প্রাইভেটাইজেশন-এর নামে জনসাধারণের উপার্জন লুণ্ঠন ও গ্রাস করার জন্য

বিদেশী কোম্পানীকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। ভীতি ও প্রভাবিত হওয়ার উপাদানে সজ্জিত উপমহাদেশের জনগণ এই প্রোপাগান্ডায় বিরাট প্রভাবিত এবং বিদেশী কোম্পানীর পণ্যসামগ্রী ব্যবহার করাকেই উন্নত ও মানসম্পন্ন জীবন আখ্যা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ফলাফল এই দাঁড়াচ্ছে, পশ্চিমা কোম্পানী সকল দেশে স্বীয় ঠিকাদারি ও ইজারাদারি প্রতিষ্ঠা করছে যা অদূর ভবিষ্যতে সে সকল দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করে রাষ্ট্রীয় পলিসির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

বিশ্বায়নের পতাকাবাহকরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাহ্যত এমন কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি, যার আলোকে প্রাচ্য ও এশিয়ান কোম্পানীর পশ্চিমা ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ হবে।

কিন্তু এতটুকু তো তাদেরও জানা ছিল, জাপানকে বাদ দিয়ে কোন প্রাচ্য কিংবা এশিয়ান কোম্পানী কখনো এই অবস্থানে আসতে পারবে না যে, সে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কারবার করবে এবং পশ্চিমা কোম্পানীর জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। আর বর্তমান পরিস্থিতিও ঠিক এমন যে, ময়দানে কেবল পশ্চিমা ও বেশীর পক্ষে জাপানী কোম্পানীই রয়েছে যারা পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে মূল্য হ্রাস করে দেশীয়দের উপার্জন গ্রাস করে চলেছে। তারা প্রতি দেশের প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে টিভিতে অব্যাহতভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে ম্যাকডোনাল্ড খাদ্য কেক, পেপসি, জুস ইত্যাদি পান করা এবং টি শার্ট পরিধান করাকেই উন্নত ও মানসম্পন্ন জীবন বানিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, মার্কিন “ফাস্ট ফুড” রেস্তোরাঁ ম্যাকডোনাল্ড যখন প্রথমবার সউদী আরবের রাজধানী রিয়াদে খোলা হলো তখন পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে উজ্জীবিত বিপুল সংখক আরব নেতৃবর্গ গাড়ীতে করে সেখানে পৌঁছে যায়। তাদের ভিড়ে আশপাশের সকল রাজপথে যানজটের সৃষ্টি হয়। ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট-এর গবেষণা দ্বারা জানা যায়, এ সকল লোক ম্যাকডোনাল্ড ফাস্ট ফুড খেতে যাচ্ছে। গ্লোবালাইজেশন বড় বড় কোম্পানী খোলার ছাড় দিয়ে দিয়েছে, যাতে তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য বাজার দখল করে নেয় এবং তাদের আকর্ষণীয় শিল্পের মাধ্যমে সে সকল বাজারের ওপর নিজেদের ইজারাদারি ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বহুজাতিক কোম্পানী কোন বিলম্ব ছাড়াই স্বীয় পুরানো আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ করে নিল। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলোর পর উন্নয়নশীল দেশেও তারা স্বীয়

শিল্প পণ্যের সয়লাবে স্থানীয় শিল্পকে পরাজিত করেছে এবং প্রতিটি দেশের বাজার দখল করে নিয়েছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে আজ-কাল মাল্টিন্যাশনাল (বহুজাতিক) কোম্পানীর ব্যাপকতার অনুমান বা পুঁজি উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা সম্ভব নয়, বরং তার অনুমান আয় দ্বারা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ জেনারেল মোটর্স (GM) সে সকল কোম্পানীর মধ্যে শীর্ষ তালিকায় রয়েছে যার আয় অনেক দেশের বার্ষিক বাজেট হতেও বেশী। জেনারেল মোটর্সের প্রতি বছর প্রায় ১৬৮ মিলিয়ন ডলার থেকেও বেশী মুনাফা হয়। আইবিবি কোম্পানী (যা ৬০টি কোম্পানী একীভূত হয়ে গঠিত হয়েছে) এশিয়া ও আফ্রিকার ১৩০ ও ইউরোপের ৪১টি কোম্পানীর চেয়েও শক্তিশালী। শুধু মিসরেই এই কোম্পানী ১০০ মিলিয়ন ডলারের পুঁজি বিনিয়োগ করেছে।[৮৯] এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ৭৫% অর্থনীতির ওপর ৫০০ শত বড় বড় কোম্পানীর আধিপত্য রয়েছে যার মধ্যে আমেরিকার ১৫৩টি, ইউরোপের ১৫৫টি ও জাপানের ১৪১টি।[৯০] এই রিপোর্ট দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, এ পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনীতির অর্ধেকেরও বেশী অংশের ওপর মার্কিন ও ইউরোপিয়ান কোম্পানীর ইজারাদারি কায়েম হয়ে গেছে। আর সে সকল কোম্পানীর মধ্যে ইহুদীরাও খুবই সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে। বিশ্বায়নের টার্গেট বিশ্ব অর্থনীতির বাকী অর্ধেক অংশকেও পরিপূর্ণভাবে স্বীয় প্রভাবাধীনে নিয়ে আসা, যার ওপর এখনো পর্যন্ত তাদের পূর্ণ আধিপত্য আসেনি। অন্য ভাষায় জাপানের (যা প্রকৃতপ্রস্তাবে পশ্চিমাপন্থী দেশ)- কোম্পানীসমূহের সেই অংশের ওপর কন্ট্রোল ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যা একটি এশিয়ান দেশ। যদিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা এবং পশ্চিমের অনুসরণ ও অনকরণ, পাশ্চাত্য পূজার কারণে সেও বিশ্বায়নের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে।

মোট কথা, জনমত গঠন ও জনগণের মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের কারণে কোম্পানী কালচার বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে, যার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন আজকে এই পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে। কিন্তু শুধু কিছু নোট কামানোই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। কারণ কুটিল ও ষড়যন্ত্রকারী মস্তিষ্ক যখন কোন কাজ করে তখন তা বহুমুখী উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এজন্য অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের পশ্চাতেও বহুমুখী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে। নিম্নে আমরা সামান্য কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনা করছি।

---

৮৯। মাগরিবী মিডিয়া, পৃ. ৪২।

৯০। মাসিক আল আলম আল ইসলামী, সংখ্যা-৭৪১, সফর, ১৪২৩ হিঃ (সাইন মুহাম্মদ আলীর রিপোর্ট)।

## অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য

গ্লোবালাইজেশন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিস্তার ঘটিয়েই পূরণ করতে পারে। এজন্য এই ব্যবস্থার প্রচলন ও বিস্তার ঘটানোর জন্য ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল) ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক (বিশ্ব ব্যাংক)-এর মত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানগুলো গণবিরোধী অর্থনৈতিক পলিসির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের অনেক উদ্দেশ্য পূরণ করছে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১। বিশ্বায়ন আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলো আরবদের সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে স্বয়ং নিজেরা তা বিনিয়োগ করছে। আজ দিন দিন আরব বিশ্ব ঋণের বোঝাতলে ডুবে যাচ্ছে। এক সমীক্ষা অনুযায়ী আরব বিশ্ব প্রতি মিনিটে প্রায় ৫০ হাজার ডলার ঋণ নিচ্ছে আর এতটুকু পরিমাণই ইউরোপ প্রতি মিনিটে বিনিয়োগ করছে। সেমতে ১৯৯৫ সালে ইউরোপ ৪৬৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। আর ১৯৮৬ সালে ইউরোপীয়ান কান্ট্রি ৬৮০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছিল। ইউরোপ যত সম্পদ বিনিয়োগ করছে ঠিক এ পরিমাণ সম্পদই আরব বিশ্ব প্রতি বছর ঋণী হচ্ছে। আরব বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বল অবকাঠামো ও পশ্চিমের মানসিক গোলামীর ফলাফল এই যে, যখন এই সম্পদ ও অর্থ সুদসহ পশ্চিমা দেশে ফিরে যায় তখন এই মোটা অংকের মুনাফাকে তারা বিশ্বব্যাপী পাশ্চাত্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে।[৯১]

২। বিশ্বায়নের একটি উদ্দেশ্য হলো, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের শক্তি ও কর্তৃত্ব খতম করে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপর মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। তা এভাবে যে, অর্থনীতি চায় তা যে দেশেরই হোক, কিন্তু সে দেশের সরকারের স্বীয় অর্থনীতিকে বিকাশ ও অগ্রগতি দানের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা থাকবে না, বরং গোটা বিশ্বের অর্থনীতি আমেরিকার রহম-করমের ওপর চলবে। স্থানীয় সরকার আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের অধীন হবে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল স্থানীয় সরকারকে যেদিকে চাইবে সেদিকেই ফেরাতে পারবে। এ প্রতিষ্ঠান উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ঋণ সরবরাহ করে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু সাথে সাথে আবার এমন শর্তাদিও আরোপ করে যা দ্বারা জনসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং

৯১। প্রবন্ধ আল-আওলামাহ হালকাতুন ফী তাত্বওয়ারি আ-লিয়াতিস সায়তারাহ, ড. খালেদ আবুল ফাতূহ, মাসিক আল-ব য়ান, সংখ্যা-১৩৬।

দেশ ও রাষ্ট্র সে সকল মার্কিন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর দয়ার পাত্রে পরিণত হয়ে যায়।[৯২] সেসব প্রতিষ্ঠান ঋণী দেশগুলোতে স্বাধীন বাণিজ্য করে জনসাধারণের অর্জিত ধন-সম্পদ দ্বারা নিজেদের পকেট ভরে। তুরস্ক, মেক্সিকো, মালয়েশিয়া ইত্যাদি যেসব দেশের শীর্ষ তালিকায় রয়েছে তাদেরকে বিশ্বায়ন মার্কিন পুঁজিপতিদের স্বার্থের খাতিরে বিশাল ও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।[৯৩] এ সকল দেশ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার কারণে গ্লোবালাইজেশনের পলিসি ও নীতি মানতে বাধ্য।

এজন্যই মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ (যিনি বিশ্বায়নের কট্টর বিরোধী ও ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক একতার বিরাট প্রবক্তা) তার বক্তব্য হলো, "বিশ্বায়ন প্রভাবিত বিশ্বে কখনোই ন্যায়-ইনসাফ ও সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, বরং গোটা বিশ্ব কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্ধ নেশায় মত্ত দেশগুলোর গোলাম ও অধীন হয়ে যাবে। যেমনিভাবে স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর অনেক লোক ধ্বংসের মুখে চলে গেছে। এমনিভাবে বিশ্বায়ন দ্বারাও বিপুল সংখ্যক লোক মৃত্যুর গ্রাসের শিকার হবে। বিশ্বায়ন প্রভাবিত এই যুগে সম্পদশালী দেশগুলোর জন্য অবশিষ্ট দেশগুলোর ওপর তার পলিসি চাপিয়ে দেওয়া খুবই সহজ হবে। এজন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর একথা ভাল করেই জেনে রাখা উচিত, তাদের অবস্থা সে যুগ থেকে কখনই উন্নত হবে না যখন তারা উন্নত বিশ্বের কলোনী ছিল।[৯৪]

ড. ইমাদুদ্দীন খলীল বলেন, "গ্লোবালাইজেশন গোটা বিশ্বকে এমন এক পল্লীতে রূপান্তরিত করে দেবে যার নেতৃত্ব থাকবে মার্কিনীদের হাতে। আর নির্দেশ ও কর্তৃত্ব চলবে ইহুদীদের। দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের ফয়সালা তাদেরই হাতে থাকবে আর নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা যা ইচ্ছা তাই করবে। ন্যায়নীতির নির্দেশদাতা কেউ থাকবে না, চায় তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোন জাতিকে তার সকল সদস্যসহ জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হোক না কেন।[৯৫]

১৯৯৫ সালেই আরব বিশ্বের (যারা বিশ্বায়নের প্রধান টার্গেটে রয়েছে) বিদেশী ঋণ ২৫০ কোটি ডলারে এসে পৌঁছেছিল। প্রতি মিনিটে আরব বিশ্ব ৫০

---

৯২। আল-আওলামাহ, মুহাম্মদ সাইদ-আবূ যারুর প্রনীত. পৃ.৬২।

৯৩। ফাখখুল আওলামাহ, পৃ.২৫৪।

৯৪। মাসিক আল ইসলাম আল-ইয়াওম, সংখ্যা-১৬ বর্ষ-১৭, ১৪২১হিঃ।

৯৫। তাহাদ্দিয়াতুন-নিযামিল আলামিল জাদীদ দেখুন http// :www. Islamway. com

হাজার ডলার ঋণ গ্রহণ করে চলেছে। আজ পর্যন্ত সে গতিতে কোন হ্রাস হয়নি। এজন্য কোন সন্দেহ-সংশয় ছাড়া নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, যত দ্রুত ঋণ বৃদ্ধি হবে তত দ্রুতই আরব বিশ্ব গোলামীর চোরাবালিতে ফেঁসে যাবে এবং পাশ্চাত্য, বিশেষ করে আমেরিকার বেশী বেশী হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ কারণেই এ সমস্ত দেশ বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (যার উদ্দেশ্যই ঋণী দেশগুলোকে ধ্বংস ও নি:চিহ্নকরা) থেকে গ্রহণ করছে। অধিকাংশ আরব বিশ্ব অর্থনৈতিক দুর্বলতার শিকার। এই দেশগুলো পর্যায়ক্রমে ঋণ ও সুদের বোঝা তলে নিস্পেষিত হচ্ছে। ফলে অতীতের সেই অবস্থা আবার সামনে আসছে যখন পশ্চিমা বিশ্ব আরব দেশগুলোর ওপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে কর্তৃত্ব চালাত।[৯৬] প্রমাণ হিসেবে আলজেরিয়াকে সামনে আনা যেতে পারে। অর্থনৈতিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী আলজেরিয়া স্বীয় ঋণের কারণে "গ্যাট" চুক্তি মানতে বাধ্য হয় যার ফলে বিদেশী কোম্পানী সেখানে প্রকাশ্যে বাণিজ্য করছে। সুতরাং আলজেরিয়াকে তাঁর স্থানীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বার্ষিক পাঁচ থেকে ১২ কোটি ডলার পর্যন্ত লোকসান দিতে হচ্ছে। কিন্তু ঋণে জর্জরিত হওয়ার কারণে সে বিদেশী কোম্পানীগুলোর জন্য নিজের দরোজা উন্মুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছে।[৯৭]

৩। বিশ্বায়ন এটাও চায়, গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর গলায় ছুরি রেখে পশ্চিমের সম্পদশালী ও তাদের মিত্র দেশগুলোর স্বার্থ পূরণ করা হবে। চায় তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যতই নিচে যেতে হোক না কেন এবং যতই ষড়যন্ত্র করার প্রয়োজন হোক না কেন। ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া যাদেরকে "এশিয়ান টাইগারস" বলা হয় তারা যখন উন্নয়নের খাতিরে পৃথক অর্থনৈতিক রাস্তা গ্রহণ করল এবং জনগণের প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করল, তখন বহুজাতিক কোম্পানী ও তার পৃষ্ঠপোষক পশ্চিমা শাসকবর্গ এই নতুন অভিজ্ঞতাকে ব্যর্থ করার জন্য কী না করেছে! এমন কোন ষড়যন্ত্র নেই যা তারা করেনি। শুধু এ কারণে যে, যদি "এশিয়ান টাইগারস" পশ্চিমা দেশের সাহায্য-সহযোগিতা ও বিশ্বায়নের ছাচে ঢালা ছাড়াই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি করে ফেলে তাহলে হয়তো বা লন্ডন ও নিউ ইয়র্কের সুবিশাল প্রাসাদ ও সুরম্য অট্টালিকায় বসে থাকা সুদখোর কোটিপতি ইহুদী ব্যবসায়ীদের সামনে বিপদ সংকেত বেজে উঠতে পারে! এজন্য ষড়যন্ত্রকারী মস্তিষ্ক তাদের সকল অভিজ্ঞতাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত

---

৯৬। (প্রবন্ধ) আল আওলামাহ হালকাতুন ফীতাত্বওওয়ারি আ-লিয়াতিস সায়তারাহ, খালেদ আবুল ফাতূহ, মাসিক আল-বয়ান, সংখ্যা-১৩৬।

৯৭। প্রবন্ধ আল আওলামাহ ওয়া রুমূযুস-সিয়াদাহ আল ওয়াতানিয়াহ, মাসিক আল মুজতামাহ, ১৪১২ হি.

করার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। তাদের সফল অভিজ্ঞতার পর অন্যান্য দেশও তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলবে। পরিণতিতে ইন্দোনেশিয়া কঠিন অর্থনৈতিক অস্থিরতার শিকার হয়। কোটিপতি ব্যবসায়ী গ্লোবালাইজেশনের সবচেয়ে বড় সমর্থক জর্জ বুশ উল্লিখিত এশিয়ান দেশগুলোর স্টক এক্সচেঞ্জে এমন খেল খেলল যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাজ এক মুহূর্তে থেমে গেল এবং দেশের প্রতিটি বাণিজ্য সেক্টর অর্থনৈতিক দুরবস্থার সাক্ষ্য দিতে লাগল।[৯৮] পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানী ভূ-মণ্ডলকে এমন এক বাজারে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছে যেখানে পারস্পরিক রশি টানাটানি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধের পরওয়া ও ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। বরং সেই বাজারের গ্রাহকদেরকে বেশী বেশী লুণ্ঠন করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

এই কোম্পানীগুলো বিশ্ব বাজারে কখনো দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ করে যার মুনাফা সে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত পেতে থাকবে। আর কখনো স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ করে। উভয় অবস্থাতেই তার বিপুল মুনাফা অর্জিত হয়। আর স্থানীয় শিল্পপতিরা হতভম্ব হয়ে পড়ে! স্থানীয় শিল্পের ব্যর্থতার কারণ হলো, আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলো যে দেশেই বিনিয়োগ করে, পশ্চিমা শাসকবর্গ সে দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করে তাদের কোম্পানীগুলোকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে, অথচ এই সুযোগ-সুবিধাগুলো স্থানীয় শিল্পের ভাগ্যে জোটে না। এই বৈষম্যমূলক আচরণ নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক পণ্য পর্যন্তও হয়ে থাকে। ফল এই হয় যে, স্থানীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো ও শিল্পপতিরা আন্তর্জাতিক কোম্পানীর সামনে টিকতে পারে না। ফলে তারা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।[৯৯]

ড. মাজদী ক্বরক্বর বলেন, "বহুজাতিক কোম্পানীর সম্প্রসারণ ও উন্নতির কারণে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ভীত মজবুত করার সুবর্ণ সুযোগ মিলেছে। পুঁজি বিনিয়োগ, প্রোডাকশন, আমদানী-রফতানী, বন্টন শেয়ার ইত্যাদির মত সকল ক্ষেত্রে এই কোম্পানীগুলো স্বীয় কর্মতৎপরতার কারণে দেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতির ওপরও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আর এই রাস্তায় সে অন্যান্য দেশের ওপর পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দিচ্ছে, যাতে পাশ্চাত্য দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায়। শুধু একটি পণ্য বাজারে আনা পর্যন্ত কাজে কয়েক দেশের শ্রমিক-মজদুর শরীক হয়। কোথাও সেই পণ্য প্রস্তুত হয় বিশেষ করে এমন

---

৯৮। আল-ইসলাম ওয়াল আওলামাহ,পৃ. ১৫২।

৯৯। প্রবন্ধ তুফানুল আওলামাহ ওয়া ইকতিসাদিয়াতুনাল মুসলিমাহ। মাসিক আল-বয়ান, সংখ্যা ১৫১।

স্থানে যেখানে শ্রমিক স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। আবার কোথাও সে পণ্যের প্যাকিং করা হয়। আবার কোথাও নিয়ে গিয়ে তা বিক্রি করা হয়। এক একটি পণ্যের ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশের অংশ গ্রহণ এবং সেখানে নিজের কারখানা খোলার কারণে এই সকল কোম্পানী সে সমস্ত দেশকে সহজেই ব্ল্যাকমেইল করতে পারে এবং স্বীয় মর্জি অনুযায়ী সেখানকার রাজনীতির মোড় পাল্টে দেওয়ার শক্তি রাখে।[১০০]

১৯ জুন ২০০০ সালে ১৫টি উন্নয়নশীল আফ্রিকান ও এশিয়ান দেশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের সদস্যরা স্বীকার করেন, নতুন বিশ্ব অর্থনীতির ফায়দা বা লাভ ছোট্ট একটি গোষ্ঠীরই হবে। এর ফলে তাদের সম্পদ আরো বৃদ্ধি হবে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য নির্মূলের পরিবর্তে তা আরো বৃদ্ধি পাবে। আরব অর্থনীতিবিদরা সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের আলোচনা নিম্নবর্ণিত কয়েকটি পয়েন্টে উপস্থাপন করেছেন:

(ক) সরকারের নিজস্ব জাতীয় অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা খতম হয়ে যাবে।

(খ) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশ্বায়ণ করা হবে এবং বিদেশ থেকে তার নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখার জন্য সেগুলোকে বিশ্ব বাজারে সংযুক্ত করা হবে।

(গ) বিদেশী বাজার কর্তৃক আরবদের বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নির্মূল করে দেওয়া হবে।

(ঘ) স্থানীয় অর্থনীতিকে দেশীয় উন্নয়নের দাবী পূরণ করার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পরিচালনা করা হবে।

(ঙ) আন্তর্জাতিক ব্লক ও পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের অবকাঠামোকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হবে। 'মধ্যপ্রাচ্য' পরিভাষা যে অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বলা হয় তা অর্থহীন সাব্যস্ত করা হবে।[১০১]

(চ) গ্লোবালাইজেশনের একটি উদ্দেশ্য হলো, উন্নয়নশীল দেশের ওপর এমনভাবে অর্থনৈতিক অধীনতা চাপিয়ে দেওয়া হবে যে, বছরের পর বছর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যেন সে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী থাকে এবং সর্বদা অর্থনৈতিক গোলামীর জিঞ্জির স্বীয় গলায় পরিয়ে রাখে। এ উদ্দেশ্যের জন্য পশ্চিমা কোম্পানীর কর্ম পদ্ধতি হলো, তারা উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে কাঁচামাল সস্তা দামে ক্রয় করে। সেগুলোকে প্রস্তুত করে সে সকল দেশেই আবার চড়া মূল্যে বিক্রি করে। এমনিভাবে আরব

---

১০০। আল-ইসলাম ওয়াল আওলামাহ্, পৃ.৭০।

১০১। প্রবন্ধ, আল-ইকতিসাদিল আরাবী ফী মুওয়াজাহাতি তাহাদ্দিয়াতিন নিসফিছছানী মিন আকদিত-তিসয়িনাত, মাসিক আরব দিগন্ত, সংখ্যা-১১।

বিশ্বে পেট্রোলের ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত সকল কোম্পানীই পশ্চিমা যারা পেট্রোল উত্তোলন থেকে নিয়ে তা পরিষ্কার করা, ব্যবহারযোগ্য বানানো এবং তা বিক্রি করা পর্যন্ত সকল স্তর অতিক্রম করে। এর জন্য তারা আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে বিরাট বিনিময় উসূল করে। এই সম্পদই শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা দেশে পৌঁছে যায়। এর চেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষ থেকে তেল উত্তোলনের এই কাজের ওপর (যা আরব বিশ্বে হচ্ছে) ট্যাক্সও আরোপ করা হয়। এই ট্যাক্সকে 'কার্বোন ট্যাক্স' বলে। আরব বিশ্ব এই ট্যাক্স আদায় করতে শুধু এজন্য বাধ্য যে, তেল উত্তোলন করা দ্বারা পশ্চিমা দেশের পরিবেশ বিনষ্ট হয়।[১০২] অথচ আরব বিশ্বে যে তেল উত্তোলিত হয় তার সবচে' বেশী ব্যবহার ইউরোপ ও আমেরিকাতেই হয়। যার অনুমান এ কথা দ্বারা করা যেতে পারে যে, আরব বিশ্ব এক কালে বাদশাহ ফয়সলের নেতৃত্বে তেলকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল এবং পশ্চিমা জগতের ইচ্ছা অনুযায়ী তেল উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার ধমকি দিয়েছিল।

এতে ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা বাদশাহ ফয়সলকে শহীদ করে এই অস্থিরতার সমাধান করল। উল্লিখিত উদ্দেশ্য যদিও স্বীয় ভাষা ও কর্ম পদ্ধতির দিক দিয়ে ভিন্ন ছিল, কিন্তু অর্থ ও পরিণামের দিক দিয়ে ছিল একই।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মাধ্যমে পশ্চিমা, বিশেষ করে আমেরিকা ও তার ওপর পরোক্ষ শাসনকারী ইহুদীগোষ্ঠী চায়, গোটা দুনিয়া অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের অধীন, বরং তাদের গোলামে পরিণত হয়ে যাক! লোকদের কেবল সে গ্রাসই গ্রহণ করার অনুমতি থাকবে যা তাদের সামনে নিক্ষিপ্ত হবে। গোটা জীবন সে যা কিছু উপার্জন করবে তা থেকে সে স্বয়ং কিছু উপকৃত হোক বা না হোক, কিন্তু তার বিরাট একটি অংশ পূর্ব হতেই বদহজমের শিকার পশ্চিমা শিল্পপতিদের পেটে পৌঁছুক! মোট কথা বিশ্ব অর্থনীতির ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার খাতিরেই বিশ্বায়নবাদীরা অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও তার বুনিয়াদ 'পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা'কে গোটা বিশ্বে বিকাশ ও বিস্তারের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং নানা রকমের পলিসি তৈরি করছে। চুক্তি হয়েছে, সংগঠন তৈরি হয়েছে, সম্মেলন হয়েছে। সব কিছু এজন্যই হয়েছে যে, বিশ্বের সম্পদের প্রবাহ যেন পশ্চিমের দিকে হয়! কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই উপায়-উপকরণ কি যা অর্থনৈতিক

---

১০২। আল- আওলামাহ ওয়া ক্বাযায়াল আস, সায়্যিদ দুসূকী হাসান প্রণীত, দেখুন - http// :www.Islamway.com

বিশ্বায়নকে বাস্তব রূপ দানের ক্ষেত্রে কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে? কোন্ রাস্তায় চলে তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে এবং কিভাবে বিভিন্ন দেশকে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কাঠামোর মধ্যে চলার জন্য বাধ্য করা হয়েছে? নিম্নে সে সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

## গ্যাট চুক্তি ঃ অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের জন্য একটি বাস্তব প্রচেষ্টা

রাজনৈতিক বিশ্বায়নের মত অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের জন্যও প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। ওয়াশিংটনের গোপন শাসক বিশ্বের সম্পদকে স্বীয় কব্জায় নিয়ে আসার জন্য তাদের বুদ্ধিজীবী ও পরিকল্পনা তৈরিকারীদের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করেছিল। এটা সেই যুগ ছিল যখন প্রতিটি দেশের অর্থনীতি সে দেশের সরকারের অধীন ছিল। আর এটাই অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা ছিল। কারণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলন তখনই কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হতে পারে যখন অর্থনীতির সাথে সরকারের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এবং এই ময়দানকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে যেটাকে অন্য ভাষায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও বলা যেতে পারে। এজন্য বিশ্বায়নের পরিকল্পনা ও রূপরেখা তৈরিকারীদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, কিভাবে অর্থনীতির সাথে সরকারের সম্পর্ক খতম করে দেওয়া যায়। এ উদ্দেশ্যের জন্য তারা সরকারকেই ব্যবহার করল। আমেরিকা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী দেশগুলো সে সময় এমন পজিশনে ছিল যে, দুনিয়ার গতি যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে ফেরাতে পারত। এজন্য বিশ্বায়নবাদীরা সর্বপ্রথম সে সকল দেশের সরকারের দিকেই টার্গেট করল এবং তাদের প্রশাসনিক বিষয়ের ওপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করার পর তারা অন্যান্য দেশের সরকারকে স্বীয় পলিসি ও নীতির অধীন বানাতে শুরু করল। অর্থনৈতিক ময়দান থেকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা নির্মূল করা যেহেতু একটি কঠিন বিষয়, এজন্য তারা মার্কিন সরকারের মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে একটি চুক্তি বাস্তবায়নের সূচনা করায় যা "GATT" (গ্যাট) চুক্তি নামে খ্যাতি এবং সম্ভবত অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের মাঝে আলোচনার অনেক স্তর অতিক্রম করে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে এই চুক্তি চূড়ান্ত ফর্মূলার ওপর ঐকমত্যে আসে।

এসব আলোচনা যেহেতু চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দেশের মাঝে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেহেতু সেসব দেশ কিংবা শহরের নামেই এই আলোচনাগুলো প্রসিদ্ধি

লাভ করে এবং সেসব আলোচনাকে Rounds (রাউন্ডস) নাম দেওয়া হয়। প্রায় ৫০ বছরব্যাপী এই দীর্ঘ সফরের মাঝে গ্যাট চুক্তিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এ সকল পরিবর্তনে বিভিন্ন দেশের মাঝে অনুষ্ঠিত আলোচনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই রাউন্ডস (Rounds) সদস্য দেশের মাঝে প্রতি ১০ বছরে একবার হতো। তার উদ্দেশ্য ছিল, চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট একে অপরের সিদ্ধান্ত শোনবে। সাথে সাথে চুক্তির ধারাসমূহে সে সকল পণ্যকেও অন্তর্ভূক্ত করা হবে, যা পূর্বে অন্তর্ভূক্ত ছিল না। অর্ধ শতাব্দীর এই দীর্ঘ সফরে প্রায় ৮টি রাউন্ডস হয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি রাউন্ডস বিরাট গুরুত্বের অধিকারী। কানাডীয়ান রাউন্ড (১৯৬৪-১৯৬৭), টোকিও রাউন্ড (১৯৭৩-১৯৭৯) ও উগান্ডা রাউন্ড (১৯৮৬-১৯৯৩)।[১০৩]

## গ্যাট চুক্তির উদ্দেশ্য

গ্যাট চুক্তি যদিও বিশ্বায়নের রাস্তা সুগম করার জন্য হয়েছিল, কিন্তু তা সংঘটিত হয়েছিল তখন, যখন ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উন্নত ছিল। ইহুদী চিন্তাবিদ ও নীতি-নির্ধারকরা তাদের পরিকল্পনাকে বাস্তবতার লেবাস পরানোর জন্য আমেরিকাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী দেখতে চাচ্ছিল। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা ইউরোপ হতে মজবুত ও সুসংহত হওয়া। এজন্য এই চুক্তির মাধ্যমে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যা দ্বারা ইউরোপের তুলনায় আমেরিকার অধিকতর ফায়দা হয় এবং চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী সকল দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে রাস্তাটিই অনুসরণ করে চলে যা আমেরিকা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছিল।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে গ্যাট চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সে সব বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত করা যা যুদ্ধের পর আরোপ করা হয়েছিল। এর জন্য এই রাস্তা গ্রহণ করা হয়েছে যে, চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত সকল দেশ একে অপরের সাথে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে কাস্টম ডিউটি বা ট্যাক্স বিরাট অংশে কম করে দেবে। সাথে সাথে প্রতিটি দেশকে এই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যে, সে চুক্তিতে অংশীদার অন্য কোন দেশকে সুবিধাজনক ও পছন্দনীয় বাণিজ্যিক দেশ আখ্যা দিয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সাথে সেখানে বাণিজ্য করতে পারে। এছাড়াও

---

১০৩। মুনাযযারাতুত তিজারাতুল আলমিয়াহ্, পৃ. ৩৮।

অন্যান্য কর্ম পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বিকাশ দান করা এবং বাণিজ্যকে সকল বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত করা, যাতে কোম্পানী যে দেশে ইচ্ছা সে দেশে বাণিজ্য করতে পারে। ফলে তার প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, ১৯৪৮ সালে চুক্তির পর সদস্য দেশগুলোর মাঝে বিভিন্ন পণ্যের ওপর প্রায় ৪৮ শতাংশ কাস্টম ডিউটি বা ট্যাক্স বসানো হলো। সত্তর-এর দশকের সূচনালগ্নে এই হার হ্রাস পেয়ে ৬ শতাংশ ও ৮ শতাংশের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ায়, অথচ টোকিও রাউন্ডের পর ইউরোপিয়ান দেশগুলোর মাঝে যে কোনো পণ্যের ওপর ট্যাক্স ৬ শতাংশ, জাপানে ৪.৫ শতাংশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪.৯ শতাংশ বসানো হলো। কেমন যেন ১৯৪৮ সালে যে কোনো পণ্যের মূল্যের ৪.৮ শতাংশ সে দেশের সরকারকে ট্যাক্স হিসেবে দিতে হবে, যেখানে সেই পণ্য বিক্রয় করা হবে। কিন্তু কয়েক বছর পর সেই পণ্যের ওপর শুধু ৪ থেকে ৬ শতাংশ ট্যাক্স আদায়ের ওপরেই ঐকমত্য হয়ে গেল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।[১০৪]

মোট কথা, গ্যাট চুক্তির ফলে সে সকল দেশের মাঝে স্বাধীন বাণিজ্যের বিকাশ ঘটল যারা এই চুক্তিতে শরীক ছিল। গ্লোবালাইজেশনের নীতি নির্ধারকদের জন্য এটা ছিল বিশাল বড় সাফল্য। কারণ এই চুক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ অনেকাংশে কম করে দিয়েছিল এবং এ বিষয়টি নিশ্চিত করে দিয়েছিল যে, কোন পণ্য বিক্রয়কারী কোম্পানী পণ্য বিক্রি দ্বারা অধিকতর লাভ ও মুনাফা অর্জন করবে।

কিন্তু চুক্তিকারীদের এদিকে কোন চিন্তা ছিল না, কাস্টম ডিউটি বা ট্যাক্স জোর করে হ্রাস করার পর সরকারের যে লোকসান হবে তা কিভাবে পূরণ করা হবে। কারণ তারা জানত, জনগণের ট্যাক্স বৃদ্ধি করে সেই লোকসান হতে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং সরকারের মত এবার জনগণকেই বিশ্ব বাণিজ্যের বিকাশের মূল্য দিতে হয়েছে। বাজার থেকে যদি কেউ পণ্য ক্রয় করে তাহলে তার মূল্য বিদেশী শিল্পপতিদের পকেটে চলে যাবে। সরকার থেকে কোন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করলে সে বিপুল ট্যাক্সের অতলে ডুবে যাবে। কিন্তু জনসাধারণের সমস্যা হতে ভ্রূক্ষেপহীন গ্যাট চুক্তি তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বিভিন্ন বিধি নিষেধ ও অবরোধ থেকে মুক্ত রেখেছে।

---

১০৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০।

## গ্যাট চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

১। **বৈষম্যহীনতাঃ** এই মূলনীতির উদ্দেশ্য হলো, চুক্তিতে অংশীদার দেশগুলো একে অপরের প্রস্তুতকৃত পণ্যকে সে মর্যাদাই দেবে যা সে স্থানীয় বা দেশীয় শিল্পকে দিয়ে থাকে। সুতরাং দেশীয় শিল্পের ওপর যে পরিমাণ ট্যাক্স বসানো হয় ঠিক সে পরিমাণই ট্যাক্স বিদেশী শিল্পের ওপর আরোপ করা হবে। যে আইন-কানুন স্থানীয় পণ্যের ওপর আরোপিত হবে সে আইন-কানুনই বিদেশী পণ্যের ওপরও আরোপিত হবে। উপরন্তু এই মূলনীতির অধীনে চুক্তিকারী দেশগুলোর এই অনুমতিও থাকবে যে, তারা যে কোনো দেশকে 'সর্বোত্তম বাণিজ্যিক দেশ' আখ্যা দিয়ে স্বীয় বাজার তার জন্য উন্মুক্ত করে দিবে এবং তার বাজারও নিজের জন্য উন্মুক্ত করে নিবে।

২। **পরিমাণ নির্ধারণ শর্তের নির্মূলঃ** এই মূলনীতির উদ্দেশ্য হলো কোনো চুক্তিকারী দেশের এই অধিকার থাকবে না যে, সে অন্য দেশ হতে আগত শিল্পের পরিমাণ নির্ধারণ করবে, বরং যে দেশ যে পরিমাণ শিল্প অন্য দেশে এক্সপোর্ট করতে চায় করতে পারবে।

এই মূলনীতির ফায়দা সে সকল দেশেরই হবে যাদের বিপুল পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয়। যারা স্বীয় দেশের চাহিদা পূরণের পর অন্য দেশেও এক্সপোর্ট করতে পারে এবং পরিমাণ নির্ধারণের শর্ত না থাকার কারণে তারা অন্য দেশের স্থানীয় শিল্পের ওপর নিজেদের শিল্পকে বিজয়ী করতে পারে। যে দেশে উৎপাদন কম হয় সেখানের জনগণ বিদেশী পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য থাকে। ফলে স্থানীয় শিল্প বিরাট লোকসানের সম্মুখীন হয়।

৩। **ট্যাক্স হ্রাসঃ** এই মূলনীতির উদ্দেশ্য হলো, চুক্তিতে শরীক দেশগুলো বিদেশী শিল্পের ওপর আরোপিত ট্যাক্স হ্রাস করবে যাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তার হয় এবং স্থানীয় শিল্পের মোকাবেলায় বিদেশী পণ্যের মূল্য বেশী ট্যাক্স দেওয়ার কারণে চড়া না হয়ে যায়।

৪। **সরকারের অনুপস্থিতিঃ** এই মূলনীতির উদ্দেশ্য হলো, সদস্য দেশগুলো এক্সপোর্ট হওয়া পণ্য ও শিল্পে সরাসরিভাবে আর্থিক সাহায্য করবে না। যেমন চুক্তির দাবী এই যে, শিল্পের ক্ষেত্রে হওয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন সরকারসমূহের কিংবা সরকার ও কোম্পানীর মাঝে না হয়, বরং বিভিন্ন কোম্পানীর মাঝে হয়। কারণ

সরকার তার সীমাহীন উপকরণকে কাজে লাগিয়ে যে কোনো বিদেশী কোম্পানীর ওপর বিজয়ী হতে পারে।[১০৫]

উল্লিখিত সকল মূলনীতির সারকথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে এমনভাবে বিকশিত করা যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মেরুদন্ডতুল্য বহুজাতিক কোম্পানীরই যেন এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা থাকে। যে কোম্পানী যত বেশী পণ্যসামগ্রী বাজারে আনতে পারবে সে-ই বিজয়ী হবে এবং যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেছনে থেকে যাবে সে বাজার থেকে নির্মূল হয়ে যাবে।

এই স্ট্র্যাটেজিকে বিন্যাস করার পর জায়নবাদী ও মার্কিনী শক্তিবর্গ তাদের কোম্পানীকে মজবুত ও সুদৃঢ় বানানো এবং তা সম্প্রসারণে লেগে যায়, যাতে তাদের কোম্পানীসমূহ গোটা বিশ্বের বাজারে উত্তম কর্মতৎপরতা দ্বারা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু তা তখনই সম্ভব ছিল যখন প্রতিটি দেশের বাজার তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। এ বিষয়কে নিশ্চিত করার জন্য 'গ্যাট' চুক্তির মধ্যে এমন নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে যা দ্বারা মার্কিন ও পশ্চিমা কোম্পানীগুলো তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে।

## গ্যাট চুক্তির ফলাফল

পূর্বে আমি আলোচনা করেছি, যায়নবাদী বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপের মোকাবেলায় আমেরিকাকে শক্তিশালী দেখতে চাচ্ছিল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল ইউরোপের অর্থনীতিকে লাগাম দেওয়া এবং আমেরিকার অর্থনীতিকে মজবুত ও সুসংহত করার সুযোগ সৃষ্টি করা। "গ্যাট" চুক্তিও যেহেতু এ প্রচেষ্টারই একটি অংশ ছিল, এজন্য আমেরিকার অর্থনীতি মজবুত ও সুসংহত হওয়া ছিল অনিবার্য।

গ্যাট চুক্তির ফলে যেহেতু প্রতিটি দেশ অন্য দেশে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারছিল এজন্য আমেরিকা প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি বাণিজ্য সেক্টরে স্বীয় শিল্প ও পণ্যসামগ্রীকে আন্তর্জাতিক বাজারে নামিয়ে দিল। ফলে ইউরোপীয় কোম্পানীর বিরাট লোকসান হলো। ১৯৯১-১৯৯২ সালে ইউরোপ তেল ও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন হ্রাস করতে বাধ্য হয়। এজন্য ইউরোপিয়ান দেশে পণ্যের উৎপাদন মুখ থুবড়ে পড়ে। আর আমেরিকা উল্লিখিত পণ্যের উৎপাদন বিপুল

১০৫। মাসিক আল বয়ান, সংখ্যা-১৭০।

পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে এবং কৃষিক্ষেত্রে ইউরোপকে ছাড়িয়ে গেছে। বরং আমেরিকা এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তার শস্য-পণ্যকে ইউরোপিয়ান দেশগুলোতেও এক্সপোর্ট করেছে এবং লাভের সাথে সাথে নিজেদের গবাদি পশুর জন্য ভূষিও সংগ্রহ করেছে। সেগুলোকে যে কোনো ধরনের ট্যাক্স হতে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন তখন বৃদ্ধি করেছে যখন গমের আন্তর্জাতিক মার্কেটের ৫০ শতাংশ তার দখলে ছিল। আর ইউরোপিয়ান দেশের প্রভাবাধীনে ছিল মাত্র ২০ শতাংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকার অন্ধ নেশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কোন কমতি আসেনি এবং আমেরিকা ইউরোপের উৎপাদন হ্রাস করাতে বাধ্য করেছে। কারণ আমেরিকা চাচ্ছিল, খাদ্যদ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর শুধু তাদেরই আধিপত্য থাকবে। অন্য কোনো দেশের অংশীদারিত্বকে সে কোনক্রমেই বরদাশত করবে না। গ্যাট চুক্তির ফলে ইউরোপের ওপর আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছিল। সে কারণেই মার্কিন কোম্পানীগুলো স্বয়ং ইউরোপেই তাদের স্থানীয় কোম্পানীর পরাজয় ঘটিয়েছে এবং ইউরোপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার দয়ার পাত্রে পরিণত হয়েছিল, এমন কি ১৯৬২ সাল থেকেই ইউরোপ আমেরিকার অনেক শিল্প ও উৎপাদনের ওপর থেকে ট্যাক্স সম্পূর্ণরূপে খতম করতে বাধ্য হয়েছিল। সে সকল কৃষি উৎপাদনের মধ্যে সয়াবিন শীর্ষস্থানে। যা মার্কিন কোম্পানীগুলো বছরের পর বছর ধরে ইউরোপে কোন ট্যাক্স ছাড়াই এক্সপোর্ট করে আসছে।

১৯৯৬-১৯৯৭ এর মধ্যে ইউরোপের কৃষিক্ষেত্রে অনেক সংশোধন হয়েছে। শস্য উৎপাদনের হারে তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। গম, চাল ও যবের উৎপাদন বিপুল পরিমাণ হতে লাগল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও আমেরিকা দুনিয়ার ১৬.৩ শতাংশ অন্যান্য শস্য ও ৬.১ শতাংশ গম উৎপাদন করে আর ইউরোপে হয় ৫ শতাংশ অন্যান্য শস্য ও ৬.১ শতাংশ গম উৎপাদন।

এমন কিছু বাণিজ্য সেক্টর আছে যার ওপর আমেরিকা বিশ্ব বাজারের দোহাই দিয়ে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার পরিকল্পনা হলো, বিশেষ কিছু বাণিজ্য সেক্টরের বিশ্ব বাজারে শুধু তারই দোকান থাকবে। এতে অন্য কেউ শরীক থাকবে না। গোটা দুনিয়ার যেখানেই সে সমস্ত পণ্যের প্রয়োজন পড়বে প্রতিষ্ঠান ও সরকার তার দিকেই তাকিয়ে থাকবে। এ ধরনের বাণিজ্য সেক্টরের মধ্যে ইস্পাত, গাড়ী, বিমান, যুদ্ধ জাহাজ, চুম্বক, ইলেকট্রনিকস, শিল্প, যন্ত্র কাপড় ইত্যাদি অন্ত

ভূক্ত আছে। মার্কিনীদের এই অভিলাষকে গ্যাট চুক্তি পূর্ণতার অনেক নিকটবর্তী করে দিয়েছে। উল্লিখিত ময়দানসমূহে মার্কিন কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুদের সংখ্যা পতনের পথে। আর মার্কিন কোম্পানী ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েই চলেছে। মার্কিন সরকারও তাদের হৃদয় খুলে সাহায্য-সহযোগিতা করছে যাতে মোটা অংকের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও স্বীয় স্বার্থের আনুকূল্যে রচিত আইন-কানুনের মাধ্যমে তার ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং জাহাজ প্রস্তুতকারী মার্কিন কোম্পানীকে সরকার ২০ কোটি ডলারের গ্রান্ট দিয়েছে। এমনিভাবে অন্য আর একটি জাহাজ প্রস্তুতকারী কোম্পানীকে সামরিক চুক্তির অধীনে ৩৩ থেকে ৪০ কোটি ডলারের সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৩ সালে ক্লিনটন প্রশাসন এমন কিছু কোম্পানীকে সাহায্য দিয়েছিল, যারা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাণিজ্য করে এবং কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় (কম্পিটিশন) অস্থির ছিল। ক্লিনটন প্রশাসনের এই সাহায্যকে তার মুখপত্র ম্যাকি কেন্টার মার্কিন কর্মচারীদের অবস্থা উন্নতিকরণের নাম দিয়েছিল, অথচ সরকারের পক্ষ থেকে এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতার উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, মার্কিন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলো উন্নত থেকে উন্নত শিল্প ও পণ্য তৈরি করবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে স্বীয় প্রতিপক্ষ কোম্পানীকে পরাজিত করে মার্কিন ইজারাদারি প্রতিষ্ঠা করবে। মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্রমবর্ধমান সাহায্যের ফলাফল এই যে, আজ জাহাজ তৈরির ক্ষেত্রে আমেরিকার অংশীদারিত্ব ৭০ শতাংশ আর যুদ্ধ জাহাজ তৈরির ক্ষেত্রে তো আমেরিকার মোকাবেলায় এমন কোনো দেশ নেই যার নিকট যুদ্ধ জাহাজের আন্তর্জাতিক বাজারে উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব আছে।[১০৬]

উল্লিখিত পরিসংখ্যান দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, "GATT" চুক্তির মাধ্যমে সবচে' বেশী মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছে। যদিও স্বাধীন বাণিজ্যের কারণে ইউরোপেরও কম ফায়দা হয়নি, কিন্তু বাণিজ্য ক্ষেত্রে মার্কিন আধিপত্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। গ্লোবালাইজেশনও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন বাণিজ্যের পতাকাবাহক। এজন্য 'গ্যাট' চুক্তি অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের জন্যও একটি ভিত্তি প্রমাণিত হলো। 'গ্যাট' চুক্তি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বাধীন ও মুক্ত বাণিজ্যের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এমন অনেক বাধাকে নির্মূল করেছে, যা বিদ্যামান থাকা অবস্থায় অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের কল্পনাও করা যেত না।

---

১০৬। আমেরিকা আল মুস্তাবাদ্দাহ পৃ. ৮২-৮৩।

## আন্তর্জাতিক নগদ ব্যবস্থা

আন্তর্জাতিক নগদ ব্যবস্থা মূলত কোন নির্ধারিত ব্যবস্থার নাম নয়, বরং তার সম্পর্ক প্রতিটি যুগের প্রচলিত নগদ বিনিময় ব্যবস্থার সাথে। কিন্তু বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই শব্দটি একটি বিশেষ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বলা হতো। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তার কারণে মার্কিন নোট ডলার যতটুকু মজবুত ও শক্তিশালী হয়েছে, তার প্রভাব আজও অবশিষ্ট রয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে "ডলার" আন্তর্জাতিক মুদ্রায় পরিণত হয়েছে এবং গোটা বিশ্ব এই নোট বা মুদ্রায় লেনদেন শুরু করে। ডলারের এই স্থায়ী শক্তি অর্জনের কারণে মার্কিন অর্থনীতি সব সময়ের জন্য মজবুত ও সুসংহত হয়েছে। কারণ বিশ্বে যখনই কোনো দেশ অন্য দেশের সাথে লেনদেন করেছে তখন থেকেই এই লেনদেন ডলারে শুরু হয়েছে। আর এর কারণে আমেরিকারও বিরাট ফায়দা হয়েছে। ফলে তার অর্থনীতি অতিশয় শক্তিশালী হয়েছে।

এমনিতেই প্রথম যুগে লোকদের মাঝে পণ্যের বদলায় পণ্য বিক্রয়ের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যাকে BARTER ও আরবীতে "মুকায়াযা" বলে। কিন্তু এই পদ্ধতির মধ্যে অনেক সমস্যা ছিল। এজন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বস্তুকে "ছামান" বা মূল্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন চামড়া গম ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তীতে জটিলতার প্রেক্ষিতে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মূল্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। অত:পর মুদ্রা ও নোট সৃষ্টি হলো এবং তার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় শুরু হলো।

তারপর এমন একটি যুগ আসল যখন লোকেরা স্বর্ণকারদের নিকট স্বর্ণ ও রৌপ্যের নোট আমানত হিসেবে রেখে দিত আর স্বর্ণকাররা তাকে আস্থার জন্য একটি রসিদ লিখে দিত। প্রয়োজনের সময় রসিদ দেখিয়ে স্বর্ণকার থেকে স্বর্ণ ফিরিয়ে নেয়া যেত। অত:পর ধীরে ধীরে লোকেরা স্বর্ণকারদের দেয়া রসিদের মাধ্যমেই বেচাকেনার কার্যক্রম শুরু করে দিল। এভাবে রসিদ "নোট"-এর রূপ ধারণ করল। এভাবেই প্রতিটি দেশের নোটের পশ্চাতে স্বর্ণকেই আসল মুদ্রামান ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। অত:পর ১৯২০ সালে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাজারে মন্দা দেখা দিল। ফলে সকল দেশ নোটের ওপর স্বর্ণ দেওয়া বন্ধ করে দিল। শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। কিন্তু সে সময় আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব মজবুত ও শক্তিশালী ছিল এবং তার নিকট স্বর্ণের বিপুল পরিমাণ ভান্ডার বিদ্যমান ছিল। এজন্য আমেরিকার

সহযোগিতায় ইউরোপের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য মার্কিন শহর ব্রিটোন উডস (BRETTON WOODS)- এ ১৯৪৪ সালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তার ঘটানো এবং নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা গঠন করা।[১০৭]

## ব্রিটোন উডস-এর নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা

১৯৩১ সালে স্বর্ণ ব্যবস্থার অবসান হয়েছিল, অতঃপর ব্রিটোন উডস এর সেই সম্মেলনে পরস্পর মত বিনিময়ের মাধ্যমে একটি নতুন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা BRETTON WOODS SYSTEM OF EXCHANGE RATE নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার সারমর্ম ছিল, এতদিন পর্যন্ত তো মৌলিকভাবে নোটের মূল্য স্বর্ণই ছিল কিন্তু প্রতিটি দেশের নোটের ওপর স্বর্ণ মিলত না। এজন্য এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিনিময় মূল্য ডলার কে সাব্যস্ত করা হলো। মার্কিন নোট ডলারকে স্বর্ণের মূল্যতুল্য ঘোষণা করা হলো। কারণ তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সুসংহত ছিল এবং সে প্রতি ডলারের ওপর স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে এক আউন্স স্বর্ণের পরিবর্তে ৩৫ ডলার দেওয়া হতো। পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলারের মূল্য বৃদ্ধি করে দিল যার ফলে প্রতি ৪৪ ডলারের মূল্য হতে লাগল এক "আউন্স" স্বর্ণ। যে কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমেরিকাকে ডলার দিয়ে তার কাছ থেকে স্বর্ণ নিতে পারত। কিন্তু কার্যত কেউ এ রকম করত না, বরং সকল দেশ ডলারেই লেনদেন করত। এভাবে ডলারই কেমন যেন স্বর্ণের স্থলাভিসিক্ত হয়ে গিয়েছিল! আর বাকী সকল দেশের নোট ডলারের সাতে সম্পৃক্ত ছিল।

এভাবে ব্রিটোন উডস কনফারেন্স মার্কিন নোটকে একটি আন্তর্জাতিক নোটে রূপান্তরিত করে দিল। মার্কিন গোপন পরিকল্পনাকরীদেরও উদ্দেশ্য ছিল, তাদের নোট আন্তর্জাতিক নোটে পরিণত হোক, যাতে বিশ্বের যে কোন কোণায় সংঘটিত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অন্য কারো উপকার হোক বা না হোক, কিন্তু আমেরিকার উপকার অবশ্যই হবে। সুতরাং যখন সেই সম্মেলন থেকে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেল, তখন ব্রিটোন উডস ব্যবস্থার অবসান হয়ে গেল।

---

১০৭। ইসলাম আওর জাদীদ মায়িশাত ওয়া তিজারত, পৃ. ৯৬।

উল্লিখিত ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল, কোন সম্পদশালী দেশ তার নোটের ওপর স্বর্ণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু কার্যত কেউ আমেরিকার কাছে স্বর্ণের দাবী করত না। অবশ্য ফ্রান্স আমেরিকার কাছে স্বর্ণের দাবী করেছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা ও ফ্রান্সের সম্পর্কের মাঝেও ফাটল দেখা দিল।

যখন ধীরে ধীরে আমেরিকার স্বর্ণ ভান্ডার হ্রাস পেতে লাগল, তখন ১৯৭১ সালে আমেরিকা স্বর্ণ দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসল। এই ঘোষণার ফলে ব্রিটোন উডস ব্যবস্থা নির্মূল হয়ে গেল।[১০৮] কিন্তু যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসল উদ্দেশ্য ছিল "ডলার"-কে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেওয়া, উক্ত কনফারেন্সের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেল। ব্রিটোন উডস ব্যবস্থার নির্মূল হওয়া সত্ত্বেও আজও ডলারের সে মর্যাদাই রয়েছে। এ দ্বারা ভালভাবে অনুমান করা যেতে পারে, নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মূলত অর্থনৈতিক ময়দানে মার্কিন নেতৃত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং আমেরিকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ডলারের ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত করা কি পরিমাণ গুরুত্ব রাখে তার অনুমান এভাবে করা যেতে পারে, বিভিন্ন মন্তব্যকারী ২০০৩ সালে ইরাকের ওপর মার্কিন আগ্রাসন ও দখলদারিত্বের একটি কারণ এটাও বর্ণনা করেছিলেন যে, সাদ্দাম হুসাইন প্রথম ব্যক্তি যিনি তেলকে ডলারের পরিবর্তে ইউরোপিয়ান নোট "ইউরো"-এর বিনিময়ে বিক্রি করা শুরু করেন। সাদ্দাম হুসাইনের এই পদক্ষেপ দ্বারা অতর্কিতভাবে ডলারের মোকাবেলায় ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তখন আমেরিকা এই বিপদের আশংকা করছিল যে, যদি তেল উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশও ইরাকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে তাহলে ডলারের কোন মর্যাদা ও গুরুত্বই বাকী থাকবে না, বরং এর পরিবর্তে "ইউরো" আন্তর্জাতিক নোটে পরিণত হবে। সুতরাং ইরাক আগ্রাসনের পরিকল্পনা তৈরি করা হলো এবং রাসায়নিক ও মানব বিধ্বংসী অস্ত্রের অজুহাত খাড়া করে ইরাক দখল করে নিল এবং সাদ্দাম হুসাইনের সিংহাসন উল্টে দেওয়া হলো- যাতে বাঁশও না থাকে, বাঁশীও না বাজে।

ব্রিটোন উড্স সম্মেলনে যেহেতু স্বাধীন, মুক্ত বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে, এজন্য ব্রিটোন উড্স সম্মেলনে দুইটি প্রতিষ্ঠান বা

১০৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

সংস্থা গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যার অধীনে বিশ্ব বাণিজ্যের বিস্তার ও বিকাশ ঘটানো যায় এবং অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের জন্য রাস্তা সুগম করা যায়। সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথমটি হলো "ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড" বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) আর দ্বিতীয়টি হলো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা বিশ্ব ব্যাংক। আমেরিকা যেমনিভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথমত লীগ অফ নেশনস ও দ্বিতীয়ত জাতিসংঘের কর্তৃত্বকে খর্ব করেছে ঠিক তেমনিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সে স্বীয় পলিসিকে গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত করেছে, নিম্নে আমি এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করছি:

## আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল

ব্রিটোন উড্স সম্মেলনে উক্ত সংস্থা গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ঠিক, কিন্তু তার চার বছর পর ১৯৪৮ সালে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটিকে ইংরেজীতে International Monetary Fund এবং আরবীতে সনদুকুন-নকদি আদ্দুয়ালী বলা হয়। তবে সহজে সংক্ষেপে একে আই. এম. এফ. ও বলা হয়। প্রতিটি দেশে যেমনিভাবে সকল ব্যাংকের একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে তদ্রূপ সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এই প্রতিষ্ঠান। কেমন যেন এটা গোটা বিশ্বের একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা বিভিন্ন দেশকে সাময়িক পরিশোধযোগ্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এই সংস্থা যে কোন দেশের মুদ্রার ওঠা-নামার ক্ষেত্রেও প্রভাব সৃষ্টির শক্তি রাখে।

এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি দেশের "একটি কোটা" থাকে, যা সে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হার দেখে ঠিক করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এক বিলিয়ন ডলারের হয়েছে, তার মধ্যে সে দেশের অংশীদারিত্ব রয়েছে পাঁচ কোটি ডলারের। সে মতে এই প্রতিষ্ঠানে সে দেশের কোটা হবে ৫ শতাংশ। আই. এম. এফ.-এর এই মূলনীতি দ্বারা ভালভাবেই অনুমান করা যায়, তার উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মুক্ত অর্থ ব্যবস্থাকে বিকাশ দান করা। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনুযায়ী অংশীদার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান তাকে ঋণ দেবে না। এজন্য নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এই প্রতিষ্ঠানও বিশ্বায়নের বিশাল বড় হাতিয়ার। উপরন্তু আই. এম. এফ. যদিও একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু বাস্তবে তা অর্ধ মার্কিনীও

বটে! এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে হলো যে কোনভাবে বিশ্বে মার্কিন ইজারাদারী সংরক্ষণ করা। আই. এম. এফ.- এর সদস্য প্রায় ১৪০টি দেশ। এই সংস্থার পলিসি ভোট দ্বারা নির্ধারিত হয় কিন্তু পোলিং সংখ্যা হিসাবে হয় না, বরং "কোটার" ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যার কোটা বেশী তার ভোটও বেশী। সে মতে এই প্রতিষ্ঠানে আমেরিকার প্রায় ২৩% ভোটের অধিকার রয়েছে এবং এছাড়াও জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মত তার "ভেটো" পাওয়ারও রয়েছে। এজন্য আই. এম. এফ.'র উত্থাপিত কোন এজেন্ডা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না তা মার্কিন রাজনীতি ও অর্থনীতির চক অনুযায়ী হবে। কোন দেশকে আই. এম. এফ.- এর মাধ্যমে ঋণ সে সময়ই দেওয়া হয় যখন তার ঋণ প্রদান মার্কিন স্বার্থের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ না হবে। অন্যথায় সে দেশকে ঋণ প্রদান করা হবে না। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান যেহেতু যে কোন দেশের মুদ্রার ওপর প্রভাব ফেলার শক্তি রাখে, এজন্য এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে একটি এও যে, ডলারের মান ও পজিশন সংরক্ষণ করা হবে এবং তার মূল্যকে কোন অবস্থাতেই নিম্নগামী ও পতন হতে দেওয়া যাবে না। সুতরাং বিশ্ব দেখেছে, বিগত কয়েক বছরে মার্কিন অর্থনীতি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ডলারের মূল্যের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আসেনি। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা মূলত এই প্রতিষ্ঠানেরই অবদান। এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা আমেরিকার সবচে' বড় দ্বিতীয় ফায়দা যেটা হয়েছে তা হলো, আই. এম. এফ.-এর সকল লেনদেন "ডলারে" হওয়ার ভিত্তিতে মার্কিন মুদ্রা একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রাতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ১৯৭৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরাসরি "ডলারে" লেনদেন করার অনুমতি প্রদান করেছে। যেরূপ ওপরে আলোচনা করেছি যে, বিশ্বায়ন মূলত আমেরিকায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য মার্কিন ইজারাদারি ও আধিপত্য বিস্তার ও বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান একটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি।[১০৯]

ব্রিটোন উড্স সম্মেলনে দ্বিতীয় যে সংস্থাটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তার নাম International Bank for Reconstruction and Development, সংক্ষেপে যাকে বলা হয় (IBRD)। আরবীতে এই প্রতিষ্ঠানকে "আল বানকুদ্দুয়ালী লিল ইনশা ওয়াততামীর" বলা হয়। সহজের জন্য সংক্ষেপে বলা হয় (World Bank) বিশ্ব ব্যাংক। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো, সদস্য দেশগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই

১০৯। আমেরিকা আল মুস্তাবাদ্দাহ, পৃ. ৬৫।

প্রতিষ্ঠানও আই. এম. এফ.-এর মত জাতীয় ও দেশীয় অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে রূপান্তর করার পথে ধাবমান। যেমনিভাবে আই. এম. এফ. বিশ্বায়নের জন্য স্বাধীন বাণিজ্যিক বিকাশ দানের প্রবক্তা, তেমনিভাবে বিশ্ব ব্যাংকও মুক্ত বাণিজ্যের পতাকাবাহক। পার্থক্য এতটুকু, আই. এম. এফ.-এর পরিকল্পনা খুব দ্রুত বাস্তব রূপ ধারণ করে নেয়। আর বিশ্ব ব্যাংকের পরিকল্পনা দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে থাকে। আই. এম. এফ. স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে যার মেয়াদ ৩ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত হয়। আর বিশ্ব ব্যাংকের মেয়াদ ১৫ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংস্থা বিভিন্ন প্রোজেক্টের জন্য ঋণ প্রদান করেছে। যেমন সড়ক, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্মাণ করা। অত:পর ১৯৬০ সালের পর সাধারণ ঋণ দেওয়াও শুরু করে।[১১০]

আই. এম. এফ.-এর মত এই প্রতিষ্ঠানের পলিসিও সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেসব পলিসি মার্কিনীদের মর্জি অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়। কারণ ভোট সদস্য দেশগুলোর সংখ্যা অনুপাতে হয় না, বরং "কোটা" হিসেবে হয়। যেমনিভাবে আমেরিকার "কোটা" আই. এম. এফ.- এ সবচেয়ে বেশী, তেমনিভাবে বিশ্ব ব্যাংকেও তার কোটা সবচেয়ে বেশী। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কেবল সেই পলিসিই গ্রহণযোগ্য হতে পারে যা মার্কিন স্বার্থ অনুযায়ী হবে। আমেরিকা ও জায়নবাদী স্বার্থবিরোধী যে কোন পরিকল্পনা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। আই. এম. এফ. ও বিশ্ব ব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের জন্য ভিততুল্য। এসব প্রতিষ্ঠান মুক্ত বাণিজ্যকে সীমাহীন বিস্তার ঘটিয়েছে এবং স্বীয় পলিসির মাধ্যমে সরকারসমূহকে দেশীয় অর্থনীতি হতে বেদখল করে প্রতিটি দেশের অর্থনীতিকে কোম্পানীর হাতে তুলে দিয়েছে। ঋণ গ্রহণেচ্ছু দেশসমূহ বাধ্য হয়ে বহুজাতিক কোম্পানীর জন্য স্বীয় দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠনগুলোর তৈরিকৃত আইন-কানুন ও নীতিমালা থেকে আমেরিকা সর্বদাই নিজেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র রেখেছে। মিলনের ধারণা ছিল, স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবস্থা দ্বারা সে দেশই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হতে পারবে যে দেশ এক্সপোর্টের প্রতি বেশী দৃষ্টি দেবে এবং ইমপোর্টের প্রতি কম গুরুত্ব দেবে। নিজের শিল্প ও পণ্য বেশী মাত্রায় বিদেশে রফতানী করবে এবং বিদেশী শিল্প খুব কম আমদানী করবে। এজন্য মার্কিন কোম্পানীগুলো স্বীয় বাণিজ্য তৎপরতাকে বিশ্ব মানচিত্রের ওপর অধিক বিস্তার ঘটানোর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে

---

১১০ । ইসলাম আওর জাদীদ মাসিয়াত ওয়া তিজারাত, পৃ. ১০১, বিচারপতি তকী উসমানী প্রনীত।

এবং এ রাস্তায় তারা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণও করে ফেলেছে। আমেরিকা আজ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী এবং উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমন এক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যার স্থান সম্ভবত অন্য কেউ দখল করতে পারবে না।[১১১]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন নেতৃত্ব ও উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর তার আধিপত্যের ফলাফল এই যে, আমেরিকা তার যে পলিসিই বাস্তবায়ন করতে চায় সহজেই তা করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো মার্কিন পলিসি বাস্তবায়নে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেসব দেশ ইহুদীদের প্রতি নমনীয় মনোভাব রাখে এবং মার্কিনীদের অন্ধ অনুসরণ করে তারা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার হিসেবে খুব সহজ হারে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু যে সমস্ত রাষ্ট্র ইহুদী ও মার্কিন পরিকল্পনার সামনে মুখ খোলার সাহস দেখায় তারা স্বীয় দেশের নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য ঐ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। মার্কিনীদের পূর্ণ ইজারাদারির কারণে এ অনুমান করা মোটেও কঠিন নয় যে, এ সকল প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নীতি নির্ধারণে কত গভীর প্রভাব রাখে!

## অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় নকীব

সকল দেশের অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যত বড়ই গুরুত্ব থাকুক না কেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপারে কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থনীতিবিদদের মাঝে দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। কারো কারো ধারণা ছিল, সকল দেশকে তার নিজস্ব উৎপাদন ও আমদানীর ওপরই ক্ষান্ত থাকা উচিত। আন্ত র্জাতিক বাণিজ্যের মোটেই প্রয়োজন নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা ও তার প্রতিপক্ষের মাঝে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে ধারাবাহিক লড়াই চলে আসছিল। ফলে একের ওপর থেকে অপরের ভরসা ও আস্থা উঠে গিয়েছিল, অথচ "আস্থা" হলো বাণিজ্যের মৌলিক উপাদান। এজন্য তাদের জোর দাবী ছিল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না হওয়া উচিত। এর মোকাবেলায় দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য ছিল "আন্ত র্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা প্রতিটি দেশের নাগরিক সাম্যের মূলনীতির আলোকে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।"

---

১১১ । আমিরেকা আল- মুস্তাবাদ্দাহ্, পৃষ্ঠা ৬৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (যে যুদ্ধে আমেরিকা ও তার মিত্রবাহিনী বিজয়ী হয়) বিজয়ী দেশের জন্য বিরাট সুবর্ণ সুযোগ ছিল যে, তারা স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্য দেশের ওপর চাপিয়ে দেবে এবং স্বীয় পলিসি অন্যের ওপর বাস্তবায়ন করবে। সুতরাং তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠায় জোরালো ওকালতি করে এবং তার জন্য রাস্তা সুগমকারী মিডিয়াকেও ব্যবহার করে। সুতরাং তারা "গ্যাট" চুক্তি, আন্তর্জাতিক নগদ ব্যবস্থা, বিশ্ব ব্যাংক আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময় একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যার নাম দেয়া হয় "ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন।"[১১২]

এটা ভিন্ন কথা যে, সে সময় এই সংগঠন বাস্তবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, বরং ১৯৯৩-এর ১৫ই ডিসেম্বর "উগাই" সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবী তোলা হয়। অত:পর ১৯৯৪-এর এপ্রিলে মরক্কো কনফারেন্সে শেষবারের মত এই বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত জানুয়ারী ১৯৯৫ সালে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১১৩]

বিশ্বায়নের বিকাশ ও বিস্তারের প্রকাশ্য কার্যক্রম বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে শুরু হয়। সেই হিসেবে "ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন"-এর প্রতিষ্ঠা এ ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা, সবচেয়ে বেশী সহায়ক এবং বিশ্বায়নের জন্য সবচেয়ে বেশী রাস্তা সুগমকারী। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে, "ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (W.T.O.) সার্বজনীন বাণিজ্য ব্যবস্থার একটি মৌলিক ও আইনগত গণ্ডি, যা ঐ সমস্ত চুক্তি নিশ্চিত করে, যার আলোকে বিভিন্ন সরকার স্থানীয় ও দেশীয় বাণিজ্য কিভাবে পরিচালনা করবে তার রূপরেখা পেশ করা হবে।"[১১৪] এই সংজ্ঞার আলোকে একথা ভাল করেই অনুমান করা যায়, "ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন" প্রতিটি দেশের স্থানীয় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করবে, সে প্রতিষ্ঠানের এ বিষয়ও নির্ধারণ করার অধিকার থাকবে যে, কোন দেশ কি পদ্ধতিতে বাণিজ্য পরিচালনা করবে। স্থানীয় শিল্প ও উৎপাদনে কি পরিমাণ ট্যাক্স ধরা হবে এবং বিদেশী আমদানীর মোকাবেলায় স্থানীয় পণ্যের মূল্য কি পরিমাণ নির্ধারণ করবে।

---

১১২। প্রবন্ধ মুনাযযামাতুত তিজারাতিল আলমিয়াহ-ওয়াল আওলামাতুল ইকতিসাদিয়াহ, ড. মুহাম্মদ বিন মাসউদ প্রনীত।

১১৩। প্রাগুক্ত।

১১৪। প্রাগুক্ত।

## সংগঠনের উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনের ইশতেহারে নিম্নবর্ণিত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ রয়েছেঃ

(১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা।

(২) প্রতি প্রকারের বিধি-নিষেধ হতে মুক্ত বাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তার ঘটানো। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লিখিত উদ্দেশ্যদ্বয় বড় গুরুত্বের অধিকারী বরং একথা বললে ভুল হবে না, এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে এই দুটি উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতেই হয়েছে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যকে বাস্তবতার পোশাক পরানোর জন্য "ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন" দুইটি পলিসি নির্ধারণ করেছে এবং সকল সদস্যদেশকে তা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করা হয়েছে।

তন্মধ্যে প্রথম পলিসি হলো, সরকারগুলো নিজ দেশের স্থানীয় শিল্পকে কখনোই সাহায্য করবে না, বরং সে সমস্ত শিল্প ও পণ্যকে কোম্পানীর ওপর ছেড়ে দেবে। এখন কোম্পানী চায় তার মান উন্নয়ন করুক কিংবা উন্নয়ন না করুক, এটা তার ইচ্ছা।

দ্বিতীয় পলিসি হলো, বিদেশে এক্সপোর্ট হওয়া পণ্যের সরকারী পর্যায়ে কোন সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে না, বরং এক্সপোর্ট হওয়া পণ্যসামগ্রীর কী মান নির্ধারণ করা হবে তা কোম্পানীর উপরই বর্তাবে।[১১৫]

এই দুই পলিসির মাধ্যমে W.T.O. -এর উদ্দেশ্য ছিল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রসমূহের মাঝে হবে না, বরং কোম্পানীর মাঝে হবে। কারণ কোম্পানীর প্রতিযোগিতা যদি সরকারের সাথে হয় তাহলে সরকারের অসংখ্য উপকরণের মালিক হওয়ার ভিত্তিতে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যখন সরকারকেই রাস্তা হতে দূর করে দেওয়া হয়েছে তখন এমন প্রতিযোগিতা শুধু কোম্পানীসমূহের মাঝেই হবে যার মধ্যে অনুন্নত দেশের কোম্পানীর ওপর পাশ্চাত্য ও মার্কিন কোম্পানীর বিজয় নিশ্চিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতেও এই সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলতে দেখা গেছে। প্রাইভেটাইজেশন ও ব্যক্তিমালিকানাধীন করণের নামে সরকার অনেক সেক্টরকে প্রাইভেট কোম্পানীর কাছে অর্পণ করে দিয়েছে। এ দ্বারা জনগণের উপকার হোক বা না হোক কিন্তু এতটুকু তো অবশ্যই হবে যে, জনগণের উপার্জনের অর্ধেক এখন উন্নত বিশ্বে বসে থাকা কোম্পানী মালিকদের পকেটে যাবে।

---

১১৫। আত তিজারাহ ফিল মোস্তাকবিল, পৃ. ২১।

## নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনের ভূমিকা

বিশ্বের সমগ্র আন্তর্জাতিক সংগঠন, চায় তা যে কোনো ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্ক রাখুক, মার্কিন ও জায়নবাদীদের বলয়ের মধ্যে রয়েছে। জাতিসংঘ থেকে শুরু করে আই. এম. এফ. ও বিশ্ব ব্যাংক পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের একই অবস্থা। "ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন"ও মার্কিন স্বার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষক এবং মার্কিন নীতি বাস্তবায়নে জোরদার ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থার চার্টারের পঞ্চম উপধারায় উল্লেখ রয়েছে, সকল দেশ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ও বিশ্ব ব্যাংকের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করবে। এই বাক্যে যদিও এমন বিশেষ কোনো ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়নি যে ক্ষেত্রে সবাই মিলে সহযোগিতা করবে কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, উল্লিখিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে সহযোগিতা আন্ত র্জাতিক নীতি তৈরির সকল ক্ষেত্রে হয়ে আসছে। আজ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ আই. এম. এফ. ও বিশ্ব ব্যাংকের কাছে ঋণী কিংবা তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা রাখে। পশ্চিমা জগত যখন কোনো পলিসি তৈরি করে তখন সেই পলিসির সাথে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঋণ কিংবা সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে তাদেরকে পলিসির স্বপক্ষে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা চালায়, যাতে তার তৈরিকৃত পলিসি খুব সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারে। এজন্য নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, পশ্চিমা শাসকবর্গ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে "ট্রাম্প কার্ড" হিসেবে ব্যবহার করে।

## সংগঠনের প্রশাসনিক অবকাঠামো

জাতিসংঘের মত "ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন" এরও একটি জেনারেল বডি রয়েছে যার মধ্যে সকল সদস্য দেশ অংশ গ্রহণ করে। তার সাধারণ এ্যাসেম্বলীর মিটিং প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর হয়ে থাকে। যে মিটিং- এ সংগঠন সম্পর্কীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী প্রস্তাবাবলী পাস করা হয়, কোনো দেশকে সদস্য বানানো কিংবা কাউকে শাস্তিস্বরূপ সংগঠনের সদস্যপদ বাতিল করা ইত্যাদি। এসব কিছু এই জেনারেল এ্যাসেম্বলীরই কাজ। কিন্তু এই এ্যাসেম্বলীতেও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন সংস্থার মত আমেরিকারই ছাপ রয়েছে। কখনো যদি সংগঠনের অন্য সদস্যগণ এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা মার্কিন স্বার্থবিরোধী

তাহলে আমেরিকা খুব সহজেই না মঞ্জুর করে দেয়। এমনিভাবে সংগঠনের নীতিবহির্ভূত কোন কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার কারণে কোন সদস্য দেশকে শাস্তি দেওয়া হলেও কিন্তু আমেরিকাকে এই শাস্তি হতে বাদ রাখা হয়। ১৫ই জুলাই, ২০০৩ সালে মার্কিন সরকার W. T. O.- এর একটি সিদ্ধান্ত এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল যে, এর ফলে মার্কিন অর্থনীতি প্রভাবিত হতে পারে।

W. T. O.- এর জেনারেল এ্যাসেম্বলীর অধীনে দ্বিতীয় আরেকটি সাধারণ কমিটি রয়েছে, যে কমিটি সংগঠনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের খোঁজ খবর নির্ণয়ের সাথে সাথে তার দায়িত্ব হলো, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওঠা-নামার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং জেনারেল এ্যাসেম্বলীর মাধ্যমে পাসকৃত সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়ন করা।

## ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশনঃ একটি বিশ্লেষণ

ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন- এর ভিত যে নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত তা অধ্যয়ন করার পর কোনো সচেতন মানুষ একথা বলতে সামান্যও দ্বিধা করবেন না যে, এই সংগঠন একটি পক্ষপাতমূলক সংগঠন, যার সাথে পাশ্চাত্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এই সংগঠন অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা সুসংহত করতে কোনই সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে না এবং না এসব কিছু তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে।

W. T. O.- এর দাবী হলো, তার উদ্দেশ্য মুক্ত বাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তার ঘটানো এবং সকল ব্যবসায়ী ও বণিকের জন্য সকল দেশের বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া। অথচ এই বাণিজ্যিক সংগঠন প্রকৃতপ্রস্তাবে অনুন্নত দেশের কাছে তো তার বাণিজ্য দ্বার উন্মুক্ত করার দাবী করে। কিন্তু তার নেতৃবর্গ পাশ্চাত্য দেশের বাণিজ্য দ্বারে পাহারা বসিয়ে রেখেছে এবং এমন আইন তৈরি করে রেখেছে যাতে তৃতীয় বিশ্বের কোন কোম্পানী ইউরোপ ও আমেরিকায় ঢুকতে না পারে! মুক্ত বাণিজ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির যে কোনো স্থানে চাকরি ও কাজ করার অনুমতি হওয়া উচিত। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো প্রাচ্যের কর্মঠ ও মেধাবী যুবকদের লোভ দেখিয়ে স্বীয় দেশে টেনে আনে, অথচ এই যুবকগুলো নিজ দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও বিনির্মাণে মেরুদণ্ডের মত কাজে লাগতে পারে। আর অবশিষ্ট মানুষগুলোর সেসব দেশে প্রবেশেরও অনুমতি নেই। ভারতের সাবেক অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহ ২৫ জানুয়ারী ২০০১ সালে "ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম"-এর অধিবেশনে বক্তৃতাকালে বলেছিলেন, "বিশ্বায়ন আমাদের জন্য একটি পরাজয় ও ন্যায়-বর্জিত কাজ, যার

মূল উদ্দেশ্য উন্নত দেশগুলোর বাজার সংরক্ষণ করা। যেভাবে তাদের বাজার সংরক্ষিত হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, তারা বিশ্বায়নকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা ইমিগ্রেশন (দেশত্যাগ) নীতিকে এমনভাবে তৈরি করছে যা দ্বারা উন্নয়নশীল দেশের মেধাবী ও কর্মঠ জনশক্তিকে লোভ দেখিয়ে স্বীয় দেশে নিয়ে আসছে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে অনুন্নত বিশ্ব কর্মঠ ও মেধাবী জনশক্তির স্বল্পতা খুব তীব্রভাবে অনুভব করবে।"[১১৬] বব সাটক্লিফ (Bob Sutkliff) এই অভিযোগ বাস্তব আখ্যা দিয়ে স্বীয় গ্রন্থ (Freedom to man in the age of Globalization)- এ লেখেন, "দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো স্বীয় মান উন্নতকরণের জন্য উন্নত দেশগুলোর ইমিগ্রেশন নীতির ওপর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের কর্মঠ, কর্মচঞ্চল ও মেধাবী জনশক্তি সম্পদশালী দেশের দিকে রুখ করে এবং সেখানে অর্থ সম্পদের সহজ উপায় ও মাধ্যম অনুসন্ধান করে।"[১১৭]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনের বক্তব্য হলো, এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ব্যবসায়ীদের মাঝে ইনসাফপূর্ণ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে বাজারে এই প্রতিযোগিতা হয় সেখানে এক পক্ষ অত্যন্ত শক্তিশালী আর অপর পক্ষ অত্যন্ত দুর্বল। এমন প্রতিযোগিতাকে কি ন্যায়সঙ্গত বলা যায়? এই সংগঠনের দাবী, তার উদ্দেশ্য বাণিজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক একক নীতিমালা, আইন-কানুন ও মূল্যবোধকে বিস্তার করা। কিন্তু প্রশ্ন, এই আইন ও নীতিমালার প্রণয়নকারী কে? কে এই নীতিমালা ও মূল্যবোধকে বিশ্বজনীনের মর্যাদাদাতা? এ প্রশ্নের উত্তর পাশ্চাত্য ও উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশগুলো ছাড়া আর কিছু নয়। উন্নয়নশীল দেশের দায়িত্ব তো শুধু এতটুকু যে, তারা সে সকল আইন-কানুন ও নীতিমালার সামনে শির নত করে দেবে এবং নীরবে তা মেনে নেবে।

সংগঠনের নেতৃবর্গের বক্তব্য হলো, এই অর্গানাইজেশন মূলত সকল দেশের মাঝে আলোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোম্পানীর মাঝে আলোচনা কিভাবে সম্ভব? কারণ উভয় পক্ষের মাঝে বস্তুগত দিক দিয়ে এ পরিমাণ পার্থক্য যে পরিমাণ পার্থক্য আসমান-যমীনের মাঝে। এই সমস্ত কোম্পানীর মাঝে বস্তুগত দিক দিয়ে এত ব্যবধান যে, তা থাকা অবস্থায় উভয়ের মাঝে আলোচনা ও মত বিনিময়ের কল্পনাই অসম্ভব।

---

১১৬। দৈনিক টাইম অব ইন্ডিয়া (ইংরেজী), ২৬ জানুয়ারী' ২০০১ আখেফ সুহাইল সিদ্দিকী দেওবন্দ লিখিত প্রবন্ধ Globalization from the persepective of Islam Modernity- এর সৌজন্যে।

১১৭। প্রাগুক্ত।

কারণ কিছু কিছু মার্কিন কোম্পানীর বাজেট অনেক উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় বাজেট হতেও বেশী। এই সংগঠন সম্পর্কে সাধারণ ধারনা, এটা বাণিজ্য বিভেদ মেটানোর জন্য একটি আদালতের মত। কিন্তু সংগঠন ও তার বিচারকদের নিরপেক্ষতার দায়িত্ব কে নেবে?

কে নিশ্চয়তা দেবে যে, অর্গানাইজেশনের নেতৃবৃন্দ, যাদের সবাই পশ্চিমা তারা পক্ষপাত দুষ্ট নয়?[১১৮] এ সকল প্রশ্ন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় এই সংগঠন, যা অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় নকীব ও প্রবক্তা এবং এ পথে পশ্চিমা শক্তির সবচেয়ে বড় সহায়ক; কোনোভাবেই ন্যায় ও নিরপেক্ষতার দাবী করতে পারে না, বরং তার মৌলিক চার্টারে এতটুকু পরিবর্তন-পরিবর্ধন অনিবার্য যে, তার উদ্দেশ্য একই বাজারে ধনী ও গরীব দেশের মাঝে প্রতিযোগিতা করানো, যাতে করে এই প্রতিযোগিতা সমান্তরাল না হয়। ফলে সম্পদশালী দেশের সম্পদ আরো বৃদ্ধি হবে, দরিদ্র দেশগুলোর দারিদ্র্য আরো বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো সর্বদা উন্নয়নের স্বপ্নই দেখতে থাকবে। আর উন্নত বিশ্ব বিদ্যুৎ গতিতে উন্নয়নের সকল রাস্তা অতিক্রম করে চলবে। তৃতীয় বিশ্বের যাত্রা হবে পাশ্চাত্যের দিকে আর পশ্চিমা বিশ্বের সফর হবে সামনের দিকে। পশ্চিমারা তার এই সফরে দরিদ্র দেশের বাসিন্দাদের রুজি-রুটির সাথে সাথে তাদের রক্ত পর্যন্ত চুষে খাচ্ছে।

## মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী বিশ্বের সম্পদের একচ্ছত্র মালিক

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে বিকাশ দানের জন্য পশ্চিমা জগত ও আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির শ্লোগান শুরু করেছে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যেমনিভাবে বিভিন্ন দেশের মাঝে চুক্তি করানো হয়েছে তেমনিভাবে মুক্ত বাণিজ্যিকে গোটা বিশ্বে বিকশিত করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা ওপরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ও চুক্তিসমূহ স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে কি পরিমাণ সফলকাম হয়েছে? আন্তর্জাতিক মুক্ত বাণিজ্যের কতটুকু বিস্তার ও বিকাশ ঘটেছে? মুক্ত বাণিজ্যের ফলে কার উপকার হয়েছে আর কার লোকসান হয়েছে?

---

১১৮। এ মাসিক আল বয়ান (আরবী), সংখ্যা-১৭০

পশ্চিমা জগত অর্ধ শতাব্দী পূর্বে মুক্ত বাণিজ্যের যেই শ্লোগান চাঙ্গা করেছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল এক দেশের কোম্পানী অপর যে কোনো দেশে বিনিয়োগ করবে, কারখানার প্রতিষ্ঠা করবে, শিল্প তৈরি করবে এবং সেখানে বিক্রি করবে। এই বিদেশী ও সরাসরি বিনিয়োগকে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (Foreign Direct Investement) বলে। সহজের জন্য সংক্ষেপে FDI- ও বলা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে FDI পুঁজিবাদী দেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল অর্থাৎ এক পুঁজিবাদী দেশ অপর পুঁজিবাদী দেশে বিনিয়োগ করবে এবং স্বীয় অর্থনীতি মজবুত ও শক্তিশালী করবে। এটি এজন্য করা হয়েছে যে, অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যে GATT (গ্যাট) চুক্তি হয়েছিল, তার সাথে পুঁজিবাদী দেশগুলোই সংশ্লিষ্ট ছিল। সাথে সাথে সে সকল প্রতিষ্ঠান যা মুক্ত অর্থনীতিকে বিকাশ দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ধীরে ধীরে স্বীয় নীতি ও পলিসি অন্য দেশের ওপর চাপিয়ে দিতে পারত। এজন্য কয়েক বছর পর্যন্ত FDI শুধু পুঁজিবাদী দেশে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং FDI-এর মাধ্যমে সংগঠিত ক্ষতিসমূহের অনুমান সে সময়ের বাণিজ্যিক অবস্থা দেখে করা সম্ভব নয়।

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের সূচনা পর্বে, পশ্চিমা, আমেরিকা ও জাপানের কোম্পানীগুলো উন্নয়নশীল দেশের দিকে বিপুল আকারে গতি ফেরায় এবং সেখানে বিনিয়োগ করে। স্বীয় শিল্প ও পণ্য সে সব দেশের বাজারে বিক্রি করে। কিন্ত এ সমস্ত কোম্পানীর কর্ম পদ্ধতি পুঁজিবাদী দেশ হতে ভিন্ন ছিল। বিদেশী কোম্পানীর বিনিয়োগ দ্বারা পুঁজিবাদী দেশের তো ফায়দা হয়েছিল ঠিক কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার সম্পদ কুক্ষিগত করা। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার প্রসিদ্ধ কার কোম্পানী জেনারেল মোটর্স একই সময় এশিয়ান দেশ ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও তিউনিসিয়ার সাথে সাথে কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও জার্মানীতেও বিনিয়োগ করেছে। এই বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) নিঃসন্দেহে সে সকল দেশের অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলবে। কিন্তু উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই প্রভাব ফেলা লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। আর এশিয়ান দেশগুলোর ক্ষেত্রে তা খুব ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। কারণ কানাডা, নিউজিল্যান্ড, জার্মানীতে বিনিয়োগ করার ফলে জেনারেল মোটর্স যে মুনাফা অর্জন করবে, তা সাধারণত সে সব দেশেই অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, তিউনিসিয়ায় বিনিয়োগ দ্বারা যে মুনাফা অর্জিত হবে তার বেশীর ভাগ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হবে। কিংবা এই মুনাফা ও লাভকে দ্বিতীয়বার পুঁজির রূপ দিয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক স্টক এক্সচেঞ্জে খাটানো হবে।

অত:পর এর দ্বারাও মুনাফা অর্জন করা হবে। কিন্তু সে সব দেশের উন্নয়নে এই বিদেশী বিনিয়োগ কখনোই কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে না, যেখানে সে মুনাফা অর্জন করেছে।[১১৯]

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, আই. এম. এফ. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার মত সংগঠনসমূহের নীতি ও পলিসির ভিত্তিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহ স্বীয় দ্বার বিদেশী কোম্পানীর জন্য উন্মুক্ত করতে বাধ্য। এ সকল কোম্পানী সেখানে সরাসরি বিনিয়োগ করছে এবং সেখানর সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। তার অনুমান এভাবে করা যেতে পারে, ১৯৭০ সালে FDI এর গ্রাফ উন্নত দেশে শুধু ৫০ মিলিয়ন ছিল, যা ১৯৮৮ সালে ১৭০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে এই গ্রাফ শুধু ২০ মিলিয়ন ছিল যা ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত শুধু ১০০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্তই পৌঁছে, অথচ ১৯৯৫ সালে উন্নত দেশগুলোতে ২০০ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশী ছিল।[১২০] FDI দ্বারা উন্নত দেশগুলোর কতটুকু উপকার হয়েছে, উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে তা ভালভাবেই জানা যায়। ১৯৭০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত তার গ্রাফে অত্যধিক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে অথচ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এই সময়ের মাঝে স্বল্প মুনাফা ও লাভের ওপরেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। বিগত শতাব্দীর ৯০-এর দশকের সূচনাতে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার, যা প্রায় ২ লাখ ৮০ হাজার ছোট ছোট কোম্পানী ভেঙ্গে গঠিত হয়েছিল। ৩৭ হাজার কোম্পানী অর্থাৎ ৮২ শতাংশ কোম্পানী ১৪টি উন্নত দেশের এবং ৯০ শতাংশ কোম্পানীর হেড কোয়ার্টার সেসব দেশেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।[১২১] শুধু ১০ শতাংশ কোম্পানী এমন ছিল যা ১৪টি উন্নত দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশের ছিল, অথচ ৯০ শতাংশ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী গোটা বিশ্বে বাণিজ্য করে শুধু ১৪টি উন্নত দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করত। এর ফলে সৃষ্টি হওয়া ভারসাম্যহীনতার অনুমান সহজেই করা যেতে পারে।

## বিশ্ব ভূখণ্ডে স্বাধীন বাণিজ্য

১৪টি উন্নত দেশের ৩৭ হাজার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী যেভাবে মুক্ত বাণিজ্য দ্বারা ফায়দা লুটছে এবং অন্যান্য দেশে যেভাবে সরাসরি বিনিয়োগ (FDI)

---

১১৯। মা-হিয়াল আওলামাহ, ড. সাদেক জালালুল আযম, পৃ. ১৫৩।

১২০। Globalization in Question, পৃ. ৭২ ড. আতেফ সুহাইল সিদ্দিকী দেওবন্দ লিখিত Globalization from the persepective of Islam Modernity- এর সৌজন্যে।

১২১। আল আওলামাহ পল হেরষ্ট গ্রাহাম হাকার্সন কৃত, (অনুবাদ) ড. ফাতেহ আব্দুল জাব্বার, পৃষ্ঠ-১০৪।

করেছে এবং করে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে প্রসিদ্ধ অর্থনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন "ইকোনোমিস্ট" এ বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, "সত্তরের দশকের সূচনালগ্নে FDI-তে প্রবৃদ্ধি ঘটে যা ৮০'র দশক আসতে আসতেই আকাশ ছুঁই ছুঁই অবস্থায় উপনীত হয়।" তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে কোটি কোটি ডলারের বিনিয়োগ করা হয়েছে। আজ সেই বিদেশী বিনিয়োগ FDI- এর গতি পূর্বের চেয়ে তিন গুণ বেশী তীব্র। ১৯৯৬ সালে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলো FDI- এর কারণে এশিয়ান দেশসমূহে ১০০ কোটি ডলারের মুনাফা অর্জন করেছে এবং একই বছরে ল্যাটিন আমেরিকা হতে ১৩৯ কোটি ডলারের মুনাফা অর্জন করেছে।[১২২]

১৯৯৭ সালে ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, "১৯৯১ সালে ৩২ ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করা হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানী এ বছরই ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য করেছে। ১৯৯৬ সালে ৫.২ ট্রিলিয়ন ডলারের বিদেশী বিনিয়োগ করা হয়েছে যার ৮ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশের অংশীদারিত্ব ছিল।"[১২৩]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮০ শতাংশ বাণিজ্যই বহুজাতিক কোম্পানীগুলো করে থাকে, যারা গোটা বিশ্ব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ সমস্ত কোম্পানী দ্বারা আমেরিকার কতটুকু ফায়দা হয় তার অনুমান এভাবে করা যেতে পারে, আমেরিকার ১০০ বড় বড় কোম্পানী (যারা গোটা বিশ্বের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশের মালিক) ১৯৯৫ সালে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের মুনাফা অর্জন করেছে, এর জন্য তারা ৬ মিলিয়ন (৬০ লাখ) শ্রমিক খাটিয়েছে। মুনাফার ৬০ শতাংশ শিল্পের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে এবং ৩৭ শতাংশ সার্ভিস (সেবা)-এর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।[১২৪] ১৯৯০ সালে চীন বিদেশী বিনিয়োগের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় চিত্তাকর্ষক দেশে পরিণত হয়। সুতরাং ১৯৯৩ সালে চীনের প্রায় ৮০ হাজার প্রজেক্ট বিদেশী কোম্পানী সম্পন্ন করেছে। ১৯৯৫সাল পর্যন্ত চীনে বিদেশী বিনিয়োগ ৩৫ কোটি ডলারে এসে দাঁড়ায়।[১২৫] চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থনৈতিক সহায়তাকারী কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী এক বিবৃতিতে বলেন, "১৯৯৬ সালে

---

১২২। প্রগুক্ত, পৃ. ২৭।

১২৩। আল আওলামাহ পল হেরষ্ট গ্রাহাম হাকার্সন কৃত, পৃষ্ঠ-১০৫।

১২৪। প্রগুক্ত।

১২৫। মাসিক New Left Review London, সংখ্যা ২২২ মার্চ-এপ্রিল ১৯৯৭, প্রবন্ধকার রিচার্ড স্মার্থ।

চীনে বিদেশী বিনিয়োগ ৪৫ কোটি ডলারে এসে দাঁড়ায়। ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে এই পরিমাণ আরো বৃদ্ধি হতে পারে। এজন্য আজ চীন বিদেশী বিনিয়োগের জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় দেশে পরিণত হয়েছে। তার একটি কারণ হলো, এখানে খুব স্বল্প পারিশ্রমিকে শ্রমিকগোষ্ঠীকে তুষ্ট করা যায়। আমার আশংকা, আগামী ৩০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত সেখানে এ অবস্থাই বিরাজ করবে।[১২৬] জাপানও সে সকল দেশের শীর্ষ তালিকায় রয়েছে যার কোম্পানী গোটা বিশ্বের সম্পদের ওপর ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত করে আছে এবং অন্যান্য দেশে বিনিয়োগ করে সেখানের জনগণের উপার্জন বণ্টন করে যাচ্ছে। এক রিপোর্ট অনুযায়ী জাপানের বহুজাতিক কোম্পানী ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত সাত বছরে শুধু এশিয়ান দেশসমূহ হতে ১৪৭ কোটি ডলারের মুনাফা অর্জন করেছে।

এশিয়ান দেশসমূহে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জাপান আমেরিকার স্থান দখল করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাপানী কোম্পানী এশিয়াতে সবচেয়ে বেশী বিনিয়োগ করে আমেরিকাকেও পেছনে ঠেলে দিয়েছে।[১২৭]

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ FDI -এর মাধ্যমে বিকশিত হচ্ছে, কিন্তু FDI- এর ওপর রয়েছে আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপানের ইজারাদারি। বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা সে সকল দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও সুসংহত করছে এবং বহুজাতিক কোম্পানীর মালিকেরা স্বীয় পকেট ভরছে। FDI -এর খুব অল্প অংশ দ্বারা ঐ সকল দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশের কোম্পানীসমূহ মুনাফা অর্জন করতে পারে। এক অনুমান অনুযায়ী গোটা বিশ্বের ৭৪.৯ শতাংশ উৎপাদনের ওপর আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুতরাং বিশ্বের শুধু মাত্র ৩০ শতাংশ মানুষ গোটা বিশ্বের ৮৪ শতাংশ সম্পদ হতে ফায়দা লুটে নিচ্ছে। অপর পক্ষে ৪৫ থেকে ৭০ শতাংশ লোকের আন্তর্জাতিক সম্পদের শুধু ১৬ শতাংশই ভাগ্যে জুটছে। অন্য ভাষায় পৃথিবী প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জনগণ আন্তর্জাতিক সম্পদ হতে বঞ্চিত। কেমন যেন তারা এই পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে অন্য কোনো জগতে বাস করছে।[১২৮]

---

১২৬। The International Herald Tribune, ১ সেপ্টেম্বর'১৯৯৭ইং।

১২৭। মা-হিয়াল আওলামাহ, ড. সাদেক জালালুল আযম,পৃ. ১৫৭।

১২৮। মাল আওলামাহ হেরাষ্ট ও থামসোনকৃত, পৃ. ১১৩।

এই বিস্তারিত আলোচনার পর বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য ও ফলাফলে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না, বরং দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বায়ন পশ্চিম ও মার্কিন কোম্পানীকে অনেক কিছু দিয়েছে। আর গোটা বিশ্ব হতে অনেক কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। জাপান ছাড়া অপরাপর এশিয়ান দেশসমূহের জনগণ বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে স্বীয় রক্তের বিনিময়ে কষ্টার্জিত সম্পদ কিছু বিদেশীর ঝুলি ভরে যাচ্ছে। আর সরকারসমূহ কোথাও বাধ্য হয়ে আর কোথাও উন্নতির লোভে বহুজাতিক কোম্পানীর প্রতি উদারতা দেখাচ্ছে।

## বহুজাতিক কোম্পানীর সম্প্রসারণ

মানুষ যখন বাজারে কোন বিদেশী পণ্য ক্রয় করতে যায়, তখন সে দোকানদারের কাছে প্রশ্ন করে, এই পণ্য ফ্রান্সের না ইটালীর, জার্মানীর না আমেরিকার? তখন সে উক্ত পণ্যের গায়ে দেখে, লেখা আছে Made in USA কিংবা Made in Germany কিংবা Made in Japan। কারণ প্রতি দেশের বিশেষ কোন ক্ষেত্রে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকে যার কারণে লোকেরা সেখানকার পণ্য বেশী পছন্দ করে এবং সে দেশের নাম দেখে ক্রয় করে। কিন্তু বিশ্বায়ন বাস্তবায়নের পর এ ধরনের যাচাই-বাছাই, অনুসন্ধান ও প্রশ্নের কোন গুরুত্ব থাকবে না, বরং তখন দোকানদারকে অনেকটা এভাবে প্রশ্ন করা হবে, এই পণ্য আই. বি. এম. কোম্পানীর প্রস্তুতকৃত না পুমা কোম্পানীর প্রস্তুতকৃত? পণ্যের গায়ে কোন দেশের নামের পরিবর্তে Made by IBM কিংবা Made by TOSHIBA লেখা থাকবে। এটা ভিন্ন কথা, পণ্য ও শিল্প হতে দেশের নাম মুছে যাওয়া সত্ত্বেও এ সকল কোম্পানী স্বীয় দেশের অর্থনীতি মজবুত, শক্তিশালী ও সুসংহত করতে থাকবে। কিন্তু এটাও বাস্তবতা যে, বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এত সম্প্রসারিত হয়ে যাবে যে, তাদেরকে কোন দেশের বা কোন রাষ্ট্রের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা কঠিন হয়ে যাবে, বরং অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলে তাদের কারখানা হবে। একটি পণ্যের সকল স্তর অতিক্রম করতে কয়েকটি দেশের শ্রমিক অংশ গ্রহণ করবে, বরং এই ধারাবাহিকতা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। সুতরাং কম্পিউটার তৈরির সবচেয়ে বড় ও প্রসিদ্ধ কোম্পানী IBM- এর সম্প্রসারণের অনুমান এভাবে করা যেতে পারে যে, কম্পিউটার তৈরির সবচেয়ে প্রাথমিক স্তর মার্কিন প্রদেশ ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত কোম্পানীর সদর দপ্তরে অতিক্রান্ত হয়। সেখানে কম্পিউটারের মডেল, তার গঠন ও তার ওপর কত বাজেট আসতে পারে

সব কিছুর সিদ্ধান্ত সেখানে গ্রহণ করা হয়। কম্পিউটারের বহিরাগত অবকাঠামো ব্রাজিলে অবস্থিত IBM কোম্পানীর কারখানায় তৈরি করা হয়। আর তার বড় বড় পার্টস আর্জেন্টিনায় তৈরি করা হয় এবং ছোট ছোট পার্টস তাইওয়ান, থাইল্যান্ড ও সিংগাপুরে অবস্থিত IBM- এর কারখানায় তৈরি করা হয়। সবশেষে সকল যন্ত্রাংশকে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত কোম্পানীর ওয়ার্কশপে পরস্পর জোড়া লাগানো হয়। আর এভাবেই কম্পিউটার তৈরির চূড়ান্ত স্তর অতিক্রান্ত হয়। এ আলোচনা দ্বারা কোম্পানীর বিস্ময়কর সম্প্রসারণের অনুমান খুব সহজে ও ভাল করেই করা যায়।[১২৯]

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের প্রথম মেয়াদকালে শ্রমমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত রবার্ট রচের বক্তব্য হলো, টেলিফোন ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তু প্রস্তুতকারী মার্কিন কোম্পানী Bel South (বেল সাউথ)-এর মালিকানাধীন শিল্প মিল-কলকারখানা বিশেষ উর্ধ্বে দেশসমূহে রয়েছে। সেখানে এই কোম্পানীর পণ্যও শিল্প প্রস্তুত করা হয়। সে সকল দেশের মধ্যে ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, তাইওয়ান, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন উল্লেখযোগ্য। এমনিভাবে দ্বিতীয় আরেকটি মার্কিন কোম্পানী WHIRL POOL যার হেড কোয়ার্টার আমেরিকাতেই রয়েছে, তার অধিকাংশ মিল, কলকারখানা, ইন্ডাস্ট্রিজ মেক্সিকোতে রয়েছে। ৪৫টি দেশে বিস্তৃত কোম্পানীর কারখানাসমূহে ৪৫ হাজারের উর্ধ্বে লোক কাজ করে। আর SEGATE (সিগেট) নামে দ্বিতীয় আরেকটি মার্কিন কোম্পানীর সদর দফতর মার্কিন প্রদেশ ক্যালিফোর্নিয়াতে অবস্থিত। এই কোম্পানী ১৯৯০ সালে ৪০ হাজার কর্মচারী নিয়োগ দেয় যার মধ্যে ২৭ হাজার এশিয়া থেকে। শুধু সিংগাপুরেই প্রায় ২০০ বহুজাতিক কোম্পানীর কারখানা রয়েছে। যেখানে এক লাখের উর্ধ্বে মানুষ কাজ করে। সে সমস্ত কারখানা হতে ইলেকট্রনিক পণ্যসামগ্রী গোটা বিশ্বে সাপ্লাই করা হয়। মার্কিন কোম্পানী IBM (যার আলোচনা কিছুক্ষণ পূর্বে করেছি)- এর ৪০ শতাংশ কর্মচারী ১৯৯৫ সালে বিদেশী ছিল, অর্থাৎ অমার্কিনী ছিল, অথচ এটা মার্কিন কোম্পানী। বিদেশী কর্মচারীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।[১৩০] অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে বহুজাতিক কোম্পানীর সীমাহীন সম্প্রসারণের সংবাদ জানার জন্য একথা জেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে, প্রসিদ্ধ মার্কিন কার কোম্পানী

---

১২৯। মা-হিয়াল আওলামাহ, ড. সাদেক জালালুল আযম প্রণীত,পৃ. ১৬১।

১৩০। The Work of nations, রাব্রিট রচ প্রণীত, পৃ. ১২১।

জেনারেল মোটর্স এর তৈরি করা পোন্টিয়াক গাড়ী বিশ্বের যে কোন কোণায় যদি কেউ ১০ হাজার ডলারে ক্রয় করে, তাহলে তার বন্টন অনেকটা এভাবে হবে যে, ৩ হাজার ডলার কোরিয়াতে পার্টস ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী কর্মচারীদের বেতনে ব্যয় হবে। ৭৫০ ডলার জাপানে প্রস্তুত হওয়া ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির মূল হিসেবে জাপানে স্থানান্তরিত হবে। ৭৫০ ডলার জার্মানীতে মডেল তৈরি ইত্যাদির কারণে সেখানকার ইঞ্জিনিয়ারদের দেওয়া হবে। ৪০০ ডলার সিংগাপুর ও তাইওয়ানের স্থানান্তরিত হবে। কারণ সেখানে গাড়ীর ক্ষুদ্রাংশ তৈরি করা হয়। ২৫০ ডলার ব্রিটেনকে মার্কেটিং ও বিজ্ঞাপন খরচ হিসেবে দেওয়া হবে। ৫০০ ডলার আয়ারল্যান্ড ও বার্বাডোস উপদ্বীপে অবস্থিত কোম্পানীর দফতরের কর্মচারীদের মাঝে বন্টন করা হবে, যারা গাড়ীর কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। আর অবশিষ্ট 8 হাজার ডলার কোম্পানীর কেন্দ্রীয় দফতরে (যা আমেরিকার প্রসিদ্ধ শহর ডেট্রয়েটে অবস্থিত) পৌঁছবে। যেখান থেকে এই পুরো কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোম্পানীর কারখানা পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা হয়।[১৩১] উল্লিখিত বিশ্লেষণ দ্বারা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী বা বহুজাতিক কোম্পানীর সীমাহীন সম্প্রসারণের বিস্ময়কর দিক সামনে আসে, কিছু কিছু কোম্পানীর বার্ষিক বাণিজ্য অনেক দেশের জাতীয় বাজেট হতেও বেশী। সুতরাং জেনারেল মোটর্স-এর বাৎসরিক বাণিজ্য সুইজারল্যান্ড, পাকিস্তানসহ গোটা দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় বাজেট থেকেও বেশী। তেল কোম্পানী শেল-এর বাৎসরিক বাণিজ্য ইরান ও তুরস্কের জাতীয় বাজেট থেকে বেশী। মার্কিন টায়ার কোম্পানী Good Year (গুড ইয়ার)-এর বার্ষিক বাণিজ্য সৌদি আরবের জাতীয় বাজেট থেকে বেশী। এই বিশ্লেষণ ও তুলনা প্রায় ১০ বছর পূর্বে করা হয়েছিল। আর আজ যখন সমস্ত কোম্পানী অনেক বেশী সম্প্রসারিত হয়েছে তখন তাদের বার্ষিক বাণিজ্য কোন কোন দেশের বাজেট থেকে বেশী, তার অনুমান মোটেই কঠিন নয়।[১৩২]

যে সকল দেশের আলোচনা ওপরে করা হয়েছে তাদের বাণিজ্য অনেক সীমিত। কিন্তু এ সকল কোম্পানী যে সমস্ত দেশের সাথে সম্পৃক্ত, তারা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, জাতীয় কিংবা সাংস্কৃতিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ

---

১৩১। প্রাগুক্ত

১৩২। মা-হিয়াল আওলামাহ, ড. সাদেক জালালুল আযম, পৃ. ১৬৪।

নয়, বরং তারা গোটা বিশ্বে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করে বেড়ায় এবং নিজেদের হাজারো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর মাধ্যমে সীমাহীন মুনাফা অর্জন করে যাচ্ছে, এ জন্য একটি কোম্পানীর বার্ষিক বাণিজ্য কয়েকটি দেশের বাজেট থেকেও বেশী তখন সে সমস্ত উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশের ধন-সম্পদের কল্পনাও সম্ভব নয়।

## সম্প্রসারণ ও সাম্রজ্য বিস্তারের জন্য বহুজাতিক কোম্পানীর কর্ম পদ্ধতি

ওপরে উপস্থাপিত পরিসংখ্যান দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, বহুজাতিক কোম্পানীসমূহ বিশ্বের ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক এবং বিশ্বের তাবৎ মানুষের রুজি-রুটি গ্রাস করার পেছনে তাদের কালো হাতের ভয়াল থাবা বিস্তৃত। তাদের মালিকরা ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় শহরে অবস্থিত সুরম্য অট্টালিকায় বসে অঢেল ধন-সম্পদের স্তূপ ও পাহাড় গণনা করার সময় পাচ্ছে না। এসব সত্ত্বেও সম্পদের প্রতি তাদের লোভ ও নেশা এত বেশি পরিমাণ যে, তারা স্বীয় কোম্পানীকে আরো বেশী সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করছে। কেমন যেন তাদের জীবনের উদ্দেশ্য অর্থ-সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সমস্ত কোম্পানী দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে স্বয়ং নিজেরা তো ব্যবসা করছেই, তাছাড়াও যেখানে তাদের বাণিজ্য করা অনেকটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় সেখানে তারা অন্যান্য কোম্পানীর সাথে শেয়ার হয়। যা কখনো স্থায়ী হয় আর কখনো অস্থায়ী ও সাময়িক হয়। কিংবা বহুজাতিক কোম্পানী নিজের তুলনায় ছোট ছোট কোম্পানীকে কিনে নেয় এবং নিজেদের শিল্প ও পণ্যের সাথে তাদের শিল্পকেও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে। নিম্নে আমি এ ধরনের কোম্পানীর কিছু কর্ম পদ্ধতি তুলে ধরছি।

### ১। কয়েকটি কোম্পানী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াঃ

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর একটি পদ্ধতি হলো, দুই কিংবা দু'য়ের অধিক কোম্পানী একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে তাদের মালিকরা একে অপরের অংশীদার হয়ে যায়। এভাবে কয়েকটি ছোট ছোট কোম্পানী মিলে একটি বড় কোম্পানীর রূপ ধারণ করে কিংবা বড় কোম্পানী আরো বেশি বড় হয়ে যায়।

এই একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য, দুনিয়ার কোন জায়গা যেন এমন না থাকে যেখানে কোম্পানীর পণ্য ও শিল্প পৌঁছেনি কিংবা কোম্পানীর পণ্য ও শিল্প যদি না থাকে, বরং তার কাজ হলো সেবা প্রদান করা, তাহলে তার

সীমারেখা ও গণ্ডি যেন আরো ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়। সে মতে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ (ব্রিটিশ উড়োজাহাজ কোম্পানী) ও আমেরিকান এয়ারলাইন্স একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করছে, যাতে তাদের ঐক্য বিশ্বে আকাশ ভ্রমনে সবচেয়ে বেশী সেবা প্রদান করতে পারে, অথচ এই কোম্পানীদ্বয় এখনও স্বীয় কর্মক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানে রয়েছে। এমনিভাবে পেট্রোলের প্রসিদ্ধ দুটি কোম্পানী বৃটিশ পেট্রোলিয়াম ও উমোকোও একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধু 'উমোকো' কোম্পানীরই সমস্ত সম্পদের মূল ৫৩ কোটি ডলারের বেশী।এই বিলীন ও মিলে যাওয়ার কারণে কোম্পানীর ৬.৪ কোটি ডলারের মুনাফা হয়েছে এবং শেল ও অক্সিন-এর ঐক্যের পর এই কোম্পানী দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে। উপরন্তু এর মিলে যাওয়ার কারণে কোম্পানীর মালিকানায় ১৮ হাজার ব্যারেলের গুদাম অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এজন্য কোম্পানীর চেয়ারম্যান আশা প্রকাশ করেছেন, পেট্রোলের ক্ষেত্রে তার কোম্পানী প্রথম নাম্বারে আসতে পারে।[১৩৩] এমনিভাবে মে ১৯৯৮ সালে মার্সিডিজ প্রস্তুতকারী কোম্পানী ডিমলার্বেঞ্চ ঘোষণা করেছে, সে মার্কিন কার কোম্পানী ক্রাইসলার-এর সাথে বিলীন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করছে। যাতে তাদের ঐক্য বিশ্বের সর্ববৃহৎ গাড়ি প্রস্তুতকারক কোম্পানীর রূপ ধারণ করে জনসমক্ষে আসতে পারে এবং মালিকদের পূর্বের তুলনায় বেশী মুনাফা অর্জিত হয়।[১৩৪] শুধু একটি দৃষ্টান্তই এমন পাওয়া যায়, কয়েকটি কোম্পানীর মাঝে শুধু ইতিবাচক উদ্দেশ্যে ঐক্য হয়েছে। সুতরাং দক্ষিণ কোরিয়াতে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হনীল ব্যাংক ও কমার্শিয়াল ব্যাংক অব কোরিয়ার পরস্পরের মধ্যে ঐক্য হয়। হনীল ব্যাংকের চেয়ারম্যান লীকুওয়ান বলেন, আমরা দুইটি ব্যাংককে পরস্পরে বিলীন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। যাতে আমাদের ব্যাংক দেশের সর্ববৃহৎ ব্যাংকে পরিণত হয় এবং বিদেশী ব্যাংকের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে।[১৩৫]

সম্প্রসারণ ও অধিকতর সম্পদ একত্র করার নেশায় ইউনিয়ন ব্যাংক অব সুইজারল্যান্ড ও সুইস ব্যাংক অব কোরব একে অপরের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করছে, যাতে জাপানের টোকিও ব্যাংকের পর এই ঐক্য দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম

---

১৩৩। আল-ইত্তেহাদ ২.

১৩৪। দৈনিক আল আহরাম, কায়রো ৮/৫/১৯৯৮ইং।

১৩৫। দৈনিক আদ দিয়ার, ১/৮/১৯৯৮ইং।

ব্যাংকে পরিণত হতে পারে।[১৩৬] এমন কিছু প্রচেষ্টা ল্যান্ডেল মোতেড ইন্স্যুরেন্স ও বর্ভোস মোতেড ইন্স্যুরেন্স- এর মাঝেও হয়েছে, যাতে এই ঐক্য বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে পরিণত হয়।[১৩৭] সম্প্রসারণের এই রাস্তা কানাডার দুটি ব্যাংকও গ্রহণ করেছে। রয়েল ব্যাংক অব কানাডা ও ব্যাংক অব মন্ট্রিয়াল-এর মাঝে ঐক্য হয়েছে। এই ঐক্যের ফলে গঠিত ব্যাংক কানাডা সর্ববৃহৎ ব্যাংকে পরিণত হয়েছে।

### ২। সাময়িক বিলীন হওয়া

অনেক সময় উদ্ভূত পরিস্থিতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কোম্পানী পরস্পরের মধ্যে সাময়িকভাবে বিলীন হয়ে যায়। এই সংমিশ্রণ কোন বিশেষ পণ্য তৈরি কিংবা কোন বিশেষ প্রজেক্ট পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। এই কর্ম পদ্ধতির উদ্দেশ্যও কোম্পানীর সম্প্রসারণ করা এবং অধিকতর মুনাফা অর্জন করা। সুতরাং বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী ব্যক্তি বিল গেটস- এর কোম্পানী মাইক্রোসফ্‌ট-এর একটি প্রজেক্টে কাজের জন্য আমেরিকার ১৫টি তথ্য কোম্পানীর মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে যার মধ্যে প্রসিদ্ধ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী মটোরোলা ছাড়াও লরেল স্পীচ কমিউনিকেশন ও টেল এস্কও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য এমন টেকনোলজি প্রস্তুত করা যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি, চায় সে বিশ্বের যে কোন স্থানেই থাকুক তার ও এন্টিনার সাহায্য ছাড়াই অন্য ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারে। লরেল কোম্পানী এই যোগাযোগের মূল্য প্রতি মিনিট ৩ ডলার নির্ধারণ করেছে।[১৩৮]

### ৩। অন্য কোম্পানীর লোগো কিংবা নাম ব্যবহার

কখনো এমন হয়, এক কোম্পানী বিশেষ কোন পণ্যের প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রাখে, কিন্তু প্রতিযোগিতার কারণে তার জন্য এটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না অথবা তার জন্য পণ্যের প্রডাকশন তো সম্ভব কিন্তু সে এই বিশেষ পণ্যের জন্য নিয়মতান্ত্রিক কোন কারখানা প্রতিষ্ঠা করা ভাল মনে করে না অথবা কোন বিশেষ কোম্পানী কোন বিশেষ পণ্যের প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। আর সেই পণ্য কোম্পানীর নামেই চলে। এ সকল ক্ষেত্রে এক কোম্পানী অপর কোম্পানীর নাম ব্যবহারের অধিকার ক্রয় করে নেয় এবং পণ্যকে সেই কোম্পানীর নামেই বাজারজাত করে, অথচ এই পণ্য সেই কোম্পানীর নয়, যার নাম পড়ে লোকজন

---

১৩৬। দৈনিক আল হায়াত (লন্ডন) ৫/২/১৯৯৮ইং

১৩৭। দৈনিক আল কব্‌স, কুয়েত, ২৯/৮/১৯৯৮ইং

১৩৮। দৈনিক আল কব্‌স, কুয়েত, ৪/৯/১৯৯৮ইং।

পণ্য ক্রয় করে। সম্প্রসারণের এই পদ্ধতি গাড়ী, জাহাজ, বিমান ও কম্পিউটারের ক্ষেত্রে বেশী গ্রহণ করা হয়। এ ধরণের একটি চুক্তি দুইটি মোবাইল কোম্পানী নোকিয়া ও কর্পোরেশন ডিজিটাল-এর মাঝে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই চুক্তির আলোকে দ্বিতীয় কোম্পানী ভাঙ্গাবিলার GSM-৯০০ নামক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং নোকিয়া কোম্পানীর নাম ব্যবহার করার অনুমতি থাকবে।[১৩৯]

**৪। প্রতিপক্ষকে রাস্তা হতে নির্মূল করার জন্য পরস্পরে বিলীন হওয়া**

আবার কখনো কোন কোম্পানী অন্য কোম্পানীর মধ্যে বিলীন হয়ে যায় কিংবা অন্য কোম্পানীকে ক্রয় করে নেয়। উদ্দেশ্য, বাজারে তার প্রতিযোগীদের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং একাই অধিক সম্পদ কুক্ষিগত করতে পারবে। প্রসিদ্ধ কার কোম্পানী B M W. বিশ্বের সবচেয়ে দামী কার প্রস্তুতকারী কোম্পানী রোলস রয়েসকে ক্রয় করে নিয়েছিল। এই কোম্পানীকে ক্রয় করার জন্য দ্বিতীয় আরেকটি কার কোম্পানী ফোলেক্সফাইনও আগ্রহী ছিল।

কিন্তু সে রোলস রায়েসকে ক্রয় করতে পারেনি। B M W. এর উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, মানুষ চায় রোলস রয়েস- এর প্রস্তুতকৃত গাড়ী ক্রয় করুক কিংবা B M W এর প্রস্তুতকৃত দামী গাড়ী ক্রয় করুক, উভয় অবস্থাতেই পয়সা একই পকেটে যাবে।[১৪০] টেলিফোনের ক্ষেত্রে আমেরিকার সবচেয়ে বড় কোম্পানী Bell Atlantic Corporation (বেল আটলান্টিক কর্পোরেশন) ঘোষণা দিয়েছিল যে, সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী G. T. E. Corporation (জি. টি. ই. কর্পোরেশন) ৫২.৮ বিলিয়ন ডলারে ক্রয় করবে। এই ঐক্যের ফলে এমন একটি বিশাল কোম্পানীর অস্তিত্ব লাভ হবে, যার নিয়ন্ত্রণ গোটা আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ পরিবারের টেলিফোনের ওপর পড়বে।[১৪১]

এ ধরনের পদক্ষেপ ইন্স্যুরেন্সের প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক কোম্পানী Bertshire hathway- ও গ্রহণ করেছিল। এই কোম্পানী ময়দান থেকে তার প্রতিপক্ষকে দূর করার জন্য আরেকটি আন্তর্জাতিক বড় কোম্পানী ENERGY RECORPORATION (এনার্জি রিকর্পোরেশন) ক্রয় করে নেয় এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

---

১৩৯। মাসিক আস-সাফাদাহ আলমিয়াহ, কুয়েত সংখ্যা-৮৫, ১৯৯৭ইং

১৪০। দৈনিক আল আহরাম কায়রো, ৫/৮/১৯৯৮ইং

১৪১। দৈনিক আদ দিয়ার বৈরুত, ৩০/৮/১৯৯৮ইং

## ৫। পতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিলীন হওয়া

অনেক সময় কোন কোম্পানী, বিশেষ করে ছোট কোম্পানী আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যর্থ হয়ে যায় এবং প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। তখন মালিকরা কোম্পানীকে পতনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কোন বড় কোম্পানীর সাথে অংশীদার হয়ে যায়। এই অংশীদারিত্বের ফলে যেমনিভাবে ছোট কোম্পানীর অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া নিরাপদ হয়ে যায়, তেমনিভাবে বড় কোম্পানী আরো সম্প্রসারিত হয়ে যায়। সে মতে আমেরিকার হোটেল কোম্পানী Felcor Sute (ফেলকর স্যুট)-কে অপর আরেকটি কোম্পানী Bristal Hotel (ব্রিস্টল হোটেল)- এর সাথে একীভূত করতে বাধ্য হয়, যাতে সে নিজেকে বাজারে টিকিয়ে রাখতে পারে।

এই ঐক্যের কারণে ২৪ মার্চ ১৯৯৮ সালে একটি নতুন কোম্পানী Felcor Lodgig Trust- এর নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং হোটেল ও প্রোপার্টির (সম্পদ) ক্ষেত্রে আমেরিকার সবচেয়ে বড় কোম্পানী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।[১৪২] এমনভাবে মার্কিন শহর সেন্টলুইস-এ বিদ্যুৎ তার প্রস্তুতকারী কোম্পানী Berg Electronics (বার্জ ইলেকট্রনিক্স) ঘোষণা দিয়েছে, সে ফরাসী কোম্পানী Framatome Connectors International ফ্রেমাটোম কানেকটরস ইন্টারন্যাশনাল)-এর সাথে ১.৮৫ বিলিয়ন ডলারের বিনময়ে একীভূত হচ্ছে। বিনিময় দেওয়ার সাথে সাথে ফ্রেমাটোম কোম্পানী বার্জ ইলেকট্রনিক্স-এর দায়িত্বে পরিশোধযোগ্য ঋণও থাকবে।

এটা এমন কর্ম পদ্ধতি যা কার্যকর করার মাধ্যমে পূর্ব হতেই বদহজমীর শিকার কোম্পানীগুলো আরো বেশী সম্প্রসারিত হয় এবং স্বীয় কার্যসীমা বিস্তৃত করে। তাদের প্রচেষ্টা হলো, কোনভাবে সে ঐ সমস্ত জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যেখানে তার শিল্প ও পণ্য এখনো পৌঁছেনি, অথচ বহুজাতিক কোম্পানী পরস্পর একীভূত হওয়া দ্বারা সম্পদ ১০ ব্যক্তি হতে গুটিয়ে ৫ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে অনেক অনিষ্ট ও কুফল দেখা দেয়। সেগুলোকে আমি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচনা করছিঃ

১। বহুজাতিক কোম্পানী একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার কারণে ছোট ছোট কোম্পানীর অবসান ঘটে। ফলে সমাজে শুধু দুই শ্রেণীর লোক থেকে

---

১৪২। দৈনিক আল-কব্‌স, কুয়েত ৩১/৮/১৯৯৮ইং।

যায়। (ক) সীমাহীন সম্পদশালী ও (খ) সীমাহীন দরিদ্র, মিডেল ক্লাস অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

২। বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায় এবং লোকদের মাঝে বেকারের সংখ্যা ব্যাপক হয়ে যায়। এই হার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আরো বেশী বৃদ্ধি পায় যাদের শুধু ব্যয়ই হয় উৎপাদন ও পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা নেই।

৩। নতুন শিল্পপতিদের সামনে সকল দরজা রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সে বাণিজ্য পরিত্যাগ করে চাকুরী করতে বাধ্য হয়।

৪। একীভূত হওয়ার ফলে কোন বিশেষ পণ্যের প্রস্তুতকারী কেবল এক কোম্পানীই ময়দানে থেকে যায়। ফলে লোকদের সেই কোম্পানীর পণ্য ক্রয় করা ছাড়া আর উপায়ই থাকে না। চায় কোম্পানী পণ্যের মান উন্নত করুক কিংবা নিু করুক, মূল্য বৃদ্ধি করুক কিংবা হ্রাস করুক।

বহুজাতিক কোম্পানীর অসাধারণ বিস্তার ও সম্প্রসারণকে দেখে এখানে না বোঝার আর কোন অবকাশ থাকে না যে, আন্তর্জাতিক ধন-সম্পদ, যা সবার যৌথ সম্পদ ও পুঁজি তা কেবল শতকরা কয়েকজন লোকের দখলেই চলে যায়। আর ৮০শতাংশ লোক তা হতে বঞ্চিত থাকে। জায়নিস্টদের ইঙ্গিতে পরিচালিত পশ্চিমা শক্তিবর্গ অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে এজন্যই সমর্থন করে যাতে তাদের কোম্পনী অধিক সম্পদ উপার্জন ও স্বীয় দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার সুযোগ পায় ও ধন-সম্পদের রাস্তায় বহুজাতিক কোম্পানীর মালিকেরা (যাদের অধিকাংশ জায়নিস্ট) স্বীয় পূর্বপুরুষদের প্রটোকলগুলো বাস্তব রূপ দিতে পারে এবং বিশাল ইসরাইল প্রতিষ্ঠার সেই পুরাতন স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পারে। কিন্তু আফসোস! উন্নয়নশীল দেশগুলোর সে সকল নেতার ওপর, যারা স্বীয় জনগণের গলায় ছুরি রেখে বিদেশী কোম্পানীকে অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানায় এবং সব বাস্তবতা জানা সত্ত্বেও তারা নিজেরা নিজেদেরকে একথা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, তাদের দেশে বহুজাতির কোম্পানীর আগমন অর্থনৈতিকভাবে দেশকে সুসংহত ও সমৃদ্ধিশালী করবে। তাদের মতো এ সকল কোম্পানীর উদ্দেশ্য হলো উন্নত দেশগুলোর মত উন্নয়নশীল দেশগুলোও সামনে অগ্রসর হবে এবং উন্নয়নের সুউঁচ্চ চূড়ায় আরোহণ করবে, অথচ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার জন্য এটা উচিত ছিল যে, উন্নত দেশগুলো তাদের কোম্পানী দরিদ্র দেশে কায়েম করতঃ মুনাফা অর্জনের পরও সে সমস্ত দেশেই থেকে যাবে। আর ব্যবসায়ীরা অন্য দেশের দিকে

দৃষ্টি ফিরাবে। কিন্তু এর উল্টো উন্নত দেশের সম্প্রসারণবাদী কোম্পানীগুলো উন্নয়নশীল দেশের স্থানীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে এবং সেখানকার দ্ররিদ্র জনগণের কষ্টার্জিত রুজি-রুটির প্রতিও লোলুপদৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের স্বরূপ।[১৪৩]

## অর্থনৈতিক বিশ্বায়নঃ ভয়াবহ ও ক্ষতিকর বিষয়াবলী

অর্থনৈতিক গোবালইজেশন স্বাধীন অর্থনীতি ও মুক্ত বাণিজ্যের বিস্তার ও বিকাশ ঘটানোর সাথে সাথে অনেক ক্ষতিকর ও ভয়াবহ বিষয়াবলীও সাথে করে নিয়ে এসেছে। যদিও বিশ্বায়নের নীতি নির্ধারকরা অবিরামভাবে এই প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে যে, বিশ্বায়ন বাস্তবায়ন হলে গোটা পৃথিবীতে একতা ও সমতার জাগরণ সৃষ্টি হবে এবং প্রাচ্যেও সে সমস্ত পণ্য হস্তগত হবে যা পশ্চিমা দেশে সহজলভ্য। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দূরত্বের অবসান ঘটবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সহজেই বিশ্বের বিভিন্ন উদ্ভাবিত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি দ্বারা উপকৃত হবে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন দ্বারা যে সমস্ত ভয়াবহতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা পশ্চিমা জগতের সে সমস্ত দাবীর ওপর শুধু প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নই লাগিয়ে দেয়নি, বরং তা প্রমান করে দিয়েছে। বিশ্বায়ন নিয়ে নিরপেক্ষ বিশেষণকারীরা ভালভাবেই বুঝে গেছে, পশ্চিমা জগতের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের উপকারিতার প্রচার-প্রসার প্রোপাগান্ডা ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। নিম্নে তারই কিছু ভয়াবহতা চিহ্নিত করা হচ্ছেঃ

(১) অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর বিষয় এই যে, গোটা বিশ্বের সম্পদ গুটিয়ে সামান্য কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। গোটা পৃথিবীতে ৩৫৮ জন ব্যক্তি এমন রয়েছেন, যাদের সম্পদ বিশ্বের অর্ধেক জনগণের সম্পদের সম-পরিমাণ ও বিশ্বের ২০ শতাংশ রাষ্ট্রের পুরা দুনিয়ার ৮৫ শতাংশ উৎপাদন এবং ৮৪ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রন রয়েছে, অথচ সে সমস্ত দেশের নাগরিকরা ৮৫ শতাংশ আন্তর্জাতিক খাদ্যভান্ডার থেকে উপকৃত হয় আর অন্যান্য দেশের জনগণ এক মুঠো খাবার হতে বঞ্চিত থাকে কিংবা তাদের নিকট পর্যন্ত খুব কমই খাদ্য-দ্রব্য পৌঁছায়, বরং শুধু ১৯.৫ শতাংশ বিনিয়োগের মুনাফা ও এক শতাংশ থেকেও কম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত

---

১৪৩। প্রবন্ধ- Globalization From The perspective of Islam and Modernity আতেফ সুহাইল সিদ্দিকী দেওবন্দ।

আমদানী সে সকল দেশের অংশ আসে যেখানে বিশ্বের ৮২ শতাংশ লোক বসবাস করে।[১৪৪]

(২) উন্নয়নশীল দেশের জন্য অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট বিপদ হলো, বহুজাতিক কোম্পানীর ইজারাদারি যার মাধ্যমে উন্নত বিশ্ব দরিদ্র বিশ্বকে অধীন বানিয়ে নেবে এবং তাদের ওপর স্বীয় আধিপত্য কায়েম করবে। নিম্নে বর্ণিত পরিসংখ্যান দ্বারা এই দাবী বাস্তব বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানী এবং বৃটেনের ৩৫০ টি বড় কোম্পানী এমন রয়েছে যারা ৪০ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দখল করে আছে। সে সব দেশের ১০টি বড় বড় কোম্পানীর যোগাযোগ ক্ষেত্রে (সাধারণ ফোন ও মোবাইল ফোন)- আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ৮৬ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে। এ পাঁচটি দেশের কোম্পানীই অস্ত্রের ৮৫ শতাংশ, কম্পিউটারের ৭০ শতাংশ, পশু ওষুধের ৬০ শতাংশ, সাধারণ ওষুধের ৩৫ শতাংশ ও কৃষি উপকরণের ৩৭ শতাংসের মালিক। এই বিস্ময়কর রিপোর্ট দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উন্নয়নশীল বিশ্বের ওপর মাত্র কয়েকটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যে দিন উন্নয়নশীল বিশ্বের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও সরাসরি উন্নত বিশ্বের শাসকবর্গের মাধ্যমে নীতি নির্ধারিত হবে।[১৪৫]

(৩) অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে সম্পদ ও আয় বন্টনের মাঝে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এমন কি একই দেশের নাগরিকদের মাঝে আয়ের ব্যাপারে পার্থক্য সীমা পাওয়া যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সে সকল লোক, যাদের জীবন মেশিনের মত, যে মেশিনের কাজ পুঁজিবাদী পশ্চিমা শক্তির খেদমত করা। বিশ্বায়নের প্রবক্তা ও রক্ষকরা খুব জোরেশোরে এই প্রচার করছে যে, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন দ্বারা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমদানীর মান বৃদ্ধি হচেছ এবং বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও ক্ষুধা হ্রাস পাচ্ছে । কিন্তু পরিসংখ্যান ও বাস্তবতা বিশ্বের বেদনাদায়ক পরিস্থিতির পর্দা উন্মোচন করে দেয়। পশ্চিমা বিশ্ব যারা বিশ্বায়নের দর্শন পেশ করেছে এবং ধারাবাহিক সমর্থন করে যাচ্ছে, তাদের দেশের যদিও আয়ের হার বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বে এই হার যথেষ্ট হ্রাস পাচ্ছে এবং

১৪৪। আল-আওলামাহ্, পৃ. ১৯।

১৪৫। প্রবন্ধ নেহায়াতুল জুগরাফিয়া, মাসিক আল বয়ান আল- আওলামাহ, পৃ. ১৯- এর সৌজন্যে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকদের মাঝে বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। বিশ্বে ২ কোটির উর্ধ্বে মানুষ এমন রয়েছে, যাদের আয় মাসিক ৫০ ডলার হতেও কম। অন্য কথায় বিশ্বায়ন যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নির্মূলের দাবী করছে তা নির্মূল হওয়ার পরিবর্তে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ ট্রোস সেকাট উন্নয়নশীল বিশ্বে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের দুইটি কারণ উলেখ করেছেন: "প্রথম কারণ উন্নত বিশ্ব দরিদ্র বিশ্ব হতে চাকুরীজীবী লোকদের আনার জন্য প্রস্তুত নয়। তারা চায় না যে, তাদের দেশে উন্নয়নশীল বিশ্ব হতে চাকুরীর জন্য মানুষ আসুক। তারা ভিসা অর্জনের জন্য এমন আইন তৈরি করেছে যে, মুষ্টিমেয় কিছু লোকই সে দেশে প্রবেশ করতে পারবে। সুতরাং যে সমস্ত লোক দেশত্যাগ করে উন্নত বিশ্বের দিকে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে তাদের মধ্য হতে শুধু ৪ শতাংশ ব্যক্তিই সফলকাম হয়, অথচ উন্নয়নশীল বিশ্বের বাজারে ইজারাদারি প্রতিষ্ঠার পরই উন্নত বিশ্বের এই উন্নতি-অগ্রগতি ভাগ্যে জুটেছে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, সম্পদশালী দেশ উন্নয়নশীল বিশ্ব হতে বেশী পরিমাণ কৃষি পণ্য আমদানী করে না এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের কোম্পানী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোন উলেখযোগ্য মুনাফাও অর্জন করতে পারে না। সুতরাং সে সকল দেশের দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৪৬]

(৪) আন্তর্জাতিক সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য এবং জাতীয়, বংশীয় ও দেশীয় পার্থক্য দেখা গেছে, ঠিক সে ধরনেরই পার্থক্য দেশের আঞ্চলিক সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, একই দেশের একটি বিশেষ শ্রেণী অর্থনৈতিক বিশ্বেয়নের কারণে দেশের সম্পদের বিরাট অংশ দখল করে আছে। তার উল্টো একটি বড় শ্রেণী এমনও আছে, যারা একেবারে বঞ্চিত। আশ্চর্যজনক কথা হলো, উলিখিত অবস্থা এমন দেশেও আছে যাকে উন্নত দেশের মধ্যে গণ্য করা হয়। এ দ্বারা উন্নয়নশীল বিশ্বের পরিস্থিতি অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। সুতরাং ফ্রান্সের শুধু ২০ শতাংশ জনগণ প্রায় ৭০ শতাংশ আমদানী দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, আর ২০ শতাংশ লোক আছে যাদের অংশে আসে দেশীয় সম্পদের মাত্র ৬ শতাংশ

---

১৪৬। দৈনিক, আর- রায়ুল আম, কুয়েত, প্রবন্ধ- আল-আওলামাহ লি-মাসরাহাতিল আগনিয়া, সালাহুল ফাযলী।

(৫) ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও বেতন হ্রাস অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ধর্ম। পরিসংখ্যান দ্বারা ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাল করেই আঁচ করা যায়, সুতরাং ৮০০ মিলিয়ন লোক বর্তমান বিশ্বে বেকার রয়েছে এবং এ সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ১০ বছরে ৫৮০টি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী প্রতি বছর গড়পড়তা ৪ লাখ কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছে, অথচ তাদের মুনাফায় কোন হ্রাস হয়নি, বরং তাদের সম্পদ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমন কি একটি কোম্পানীর বার্ষিক আমদানী বন্টনের সময় প্রতিটি দেশের অংশে ৫ মিলিয়ন ডলার আসে।[১৪৭] অর্থনৈতিক বিশ্বেয়নের ফলে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বে উদ্বিগ্ন হয়ে উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকায় বিশ্বায়নের বিরোধিতা আজ জনগণের পর্যায়ে শুরু হয়ে গেছে! নাগরিক ও সামাজিক সংগঠনগুলো রাজপথে নেমে এসেছে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলো সম্মিলিত বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেছে।[১৪৮] বেকারত্বের কারণে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য অন্যায়-অপরাধের সীমা ও গন্ডি ব্যাপক করে দিয়েছে। শিক্ষিত লোকদের পেট পালার জন্য সুপরিকল্পিত অন্যায়-অপরাধ করতে বাধ্য হচ্ছে। এমন অনেক দল রয়েছে যার সকল সদস্য শিক্ষিত ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বেআইনী কাজে জড়িত রয়েছে। এই দল এমন ধনকুবেরদের সহযোগিতা করে যারা ট্যাক্স হতে রক্ষা পেতে চায়। সুতরাং এই দল তাদের সম্পদ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদেশে স্থানান্তরিত করে দেয়। শুধু ১৯৯০ সালেই রাশিয়া হতে ৫ কোটি ডলার ইন্টারনেটের মাধ্যমে বেআইনীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে।

নিরাপত্তারক্ষীদের মতে ইউরোপীয় দেশ অস্ট্রিয়াতেই শুধু মাফিয়া গ্রুপের সম্পদ ১৯ হাজার কোটি ডলারের উর্ধ্বে, অথচ সরকারকে ট্যাক্স না দেওয়া এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের কারণে সে দেশ কঠিন পরিস্থিতির শিকার।

এগুলো তো এমন অপরাধ যা শিক্ষিত শ্রেণী তাদের শিক্ষার ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে করছে। এছাড়াও সমাজে এমন কিছু ভয়াবহ অন্যায়-অপরাধ রয়েছে যার কোন হিসাব-নিকাশ নেই।[১৪৯]

---

১৪৭। প্রাগুক্ত। . ২.

১৪৮। আল- আওলামাহ, পৃ. ১২০ ড. সালেহ আ-রাকাব প্রণীত।

১৪৯। আল-আওলামাহ্, পৃ. ২১।

(৬) উন্নত বিশ্ব অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের রাস্তায় উন্নয়নশীল বিশ্বের ওপর অর্থনৈতিক ও কৃষি পলিসি বাস্তবায়ন করছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, উন্নয়নশীল বিশ্বে যাতে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধণ না হয় এবং এই সমস্ত দেশ পশ্চিমা শিল্পের ক্রেতা হয়ে থাকুক! উন্নত বিশ্বের পক্ষ হতে আরোপিত নেতিবাচক পলিসির কারণে কিছু দেশে উন্নয়নের গতি সম্পূর্ণ নি:শেষ হয়ে গেছে, এমন কি ১৯৯৮ সালে তো সে সকল দেশে এক শতাংশ উন্নতি-অগ্রগতি হয়নি। বেকারত্ব বৃদ্ধি হয়েছে এবং অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকটের জন্ম দিয়েছে।[১৫০]

(৭) বিশ্বায়নের ছায়াতলে আরবদের আয় উপকরণকেও দুর্বল করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। আরবদের আসল আমদানীর মাধ্যম তেল, যা বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, বরং যদি একথা বলা হয়, পশ্চিমা বিশ্বের উন্নতি-অগ্রগতি আরবদের তেলের ওপরই নির্ভরশীল, তাহলে ভুল হবে না। কিন্তু উন্নত বিশ্ব প্রথমত তেলকে একটি পণ্য আখ্যা দিয়ে তার গুরুত্ব হ্রাস করার প্রচেষ্টা করেছে। দ্বিতীয়ত তাকে শিল্পের সেই তালিকা হতে বাদ দিয়েছে যার মুক্ত বাণিজ্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে হয়ে থাকে এবং তা ট্যাক্স ও অন্যান্য কাস্টম ডিউটি হতে মুক্ত থাকে। কিন্তু উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে আমেরিকা তেলের মুক্ত বাণিজ্যকে বরদাশত করে না, বরং তার ওপর চড়া ট্যাক্স আরোপ করে যা আদায় করতে আরববিশ্ব বাধ্য, যার কারণে উন্নত বিশ্ব তেলের ওপর শুধু ট্যাক্স লাগানোর বদৌলতে আরবদের থেকে (যারা গোটা বিশ্বে তেল সাপাই করে)তিন গুণ বেশী মুনাফা অর্জন করছে। উপরন্তু মার্কিন কংগ্রেস একটি আইনও সর্বসম্মতিক্রমে পাস করেছে, যার আলোকে "ওপেক" (তেল উৎপাদন দেশসমূহের সংগঠন)-এর সাথে সংশিষ্ট সকল দেশ তেলের মূল্য বৃদ্ধি করলে তার ওপর অবরোধ আরোপ করা হয়।[১৫১]

এসব কিছু এমন বিপজ্জনক, যা অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো সম্মুখীন হচ্ছে এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ফোকলা করে ফেলেছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে গোটা বিশ্বের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব যে সমস্ত ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল এবং পরিকল্পনা তৈরি করেছিল আজ

---

১৫০। আর- রিসারা, সংখ্যা ১৪১, ২৮ শে শাওয়াল, ১৪২০ হি. পৃ. ২১।
১৫১। প্রগুক্ত।

তা বাস্তবতায় রূপ দিচ্ছে। ষড়যন্ত্রকারী জায়নিস্ট মস্তিষ্ক ৫০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করে স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য রাস্তা সুগম করেছে। চুক্তি ও সংগঠন-সংস্থার সহায়তায় উন্নয়নশীল বিশ্বকে স্বীয় রচিত পলিসি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে একথা বলা যায়, জায়নবাদী ও জায়নিস্টপূজারী পশ্চিমা বিশ্ব উভয়ই স্বীয় যৌথ প্রচেষ্টায় সফলকাম হয়েছে এবং ইসলামী বিশ্বসহ গোটা বিশ্বকে নিজেদের অর্থনৈতিক কলোনীতে রূপান্তরিত করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য কথা মুখ থেকে বের হয়েই যায়, যদিও তা বর্ণনার জন্য যত সতর্কতা অবলম্বনই করা হোক না কেন। পশ্চিমা চিন্তাবিদ Phillip F Kally (ফিলিপ, এফ, কেলী) এবং Krisolds (ক্রিসওল্ড) যারা অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন পলিসিকে সমর্থন করে, তারা এ কথার স্বীকৃতি দেয়, " বিশ্বায়ন সীমাতিরিক্ত করে ফেলেছে। বিশ্বায়ন যদি অর্থনৈতিক কল্যাণের রাস্তা হয়ে থাকে তাহলে অর্থনৈতিক অকল্যাণেরও রাস্তা। এর হিসাব-নিকাশ প্রয়োজন।"[১৫২]

০০০০

১৫২। Questions in Crisis, পৃ. ২, আতেফ সুহাইন সিদ্দিকী লিখিত Globalization From the Perspective of Islam and Modernity- এর সৌজন্যে।

## চতুর্থ অধ্যায়

# সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন

### জীবন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি

প্রাচীনকাল হতেই বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। তাদের মাঝে অনৈক্য ও মতবিরোধের ফলে এক গভীর দূরত্ব বিরাজমান, যা দূর করা খুবই কঠিন। প্রতিটি সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতি হতে পৃথক ও ভিন্ন। প্রতিটি কৃষ্টির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। এজন্য স্বাভাবিকভাবে সে সমস্ত সভ্যতা ও কৃষ্টির অনুসারীরাও বিভিন্ন পথের পথিক, এমন কি রাস্তার ভিন্নতার সাথে সাথে তাদের গন্তব্যও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই মতানৈক্যের ভিত্তি সে সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা নয় বরং এর বুনিয়াদ তাদের ধর্ম ও দ্বীনের ভিন্নতা, যে ধর্ম হতে এই সমস্ত তাহযীব ও কৃষ্টি বের হয়েছে এবং পৃথক পৃথক কৃষ্টি হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। একটি জাতি যদি দ্বীন ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক হয় তাহলে তার সভ্যতা-সংস্কতিও সাধারণত একই হয়। কিন্তু যদি একই অঞ্চলের বাসিন্দা আলাদা আলাদা ধর্মের অনুসারী হয়, তাহলে তাদের মাঝে সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিন্নতা হওয়াও অনিবার্য। ইতিহাস যখন থেকে বিভিন্ন ধর্মকে স্বীয় পাতায় সংরক্ষণ করেছে তখন থেকে বিভিন্ন সভ্যতাও ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতাও এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং যেমনিভাবে অতীতেও ধর্মের বিভিন্নতার অস্তিত্ব ও সভ্যতার বিভিন্নতার ভিত্তি ছিল, তেমিনভাবে ভবিষ্যতেও এই ভিত্তি থাকবে।

সর্বজনস্বীকৃত বাস্তবতা থেকে একথা সুস্পষ্ট, সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আসল উপাদান দ্বীন বা ধর্ম। ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়নকারীরা এই মূলনীতির ওপর একমত। সুতরাং এই ধর্মই জাতির মেজাজ, রুচিবোধ সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। দ্বীন দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয়। আবার এটাই চারিত্রিক অধ:পতনের কারণ হয়। কিন্তু এটা তখনই হয়, যখন তার অনুসারীরা সেটাকে মানুষের মনগড়া বিষয় সাব্যস্ত করেছে। এই ভিত্তিতে এটা অসম্ভব যে, একজন মানুষ কোন ধর্মের অনুসারী হবে আর সেই দ্বীন ও ধর্মের পেশকৃত সভ্যতা গ্রহণ

করার পরিবর্তে অন্য জাতির সভ্যতা গ্রহণ করে তার ওপর জীবন পরিচালনা করাকে বৈধ সাব্যস্ত করবে। কারণ তার এই কর্ম সকল ধর্মের শিক্ষার বিপরীত। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেউ নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার প্লাবনে প্লাবিত হয়ে কিংবা অন্ধ অনুকরণের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে এই অন্যায় কর্মকান্ড করে বসে এবং নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছেড়ে অন্য জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে নেয় তখন তার ফলাফল এই হবে যে, সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সাথে তার ধর্মও তার থেকে বিদায় হতে থাকবে এবং সফরের পোটলা বেঁধে নেবে। এজন্য প্রয়োজন, এক ধর্মের অনুসারীরা সে ধর্মেরই আনীত সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে সে কোন উদারতা দেখাবে না।

উল্লিখিত ভূমিকার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যে, সভ্যতা-সংস্কৃতি শুধু কিছু রসম-রেওয়াজ, চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার সমষ্টি নয়, বরং সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় উপাদানটা প্রবল থাকে। যে কোন সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান ধ্যান-চিন্তাধারা ও প্রথা-প্রচলনের ধারাবাহিকতা কোন না কোনভাবে ধর্মের সাথে গিয়ে মিলে। বিষয়টি গভীর মনোযোগের সাথে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, এই প্রথা-প্রচলন ও ধ্যান-ধারণা ধর্মের দৃষ্টিতে সঠিক না ভুল। আমাদের আশপাশে প্রচলিত প্রথা-প্রচলন ও বংশপরম্পরায় চলে আসা রসম-রেওয়াজকে সর্বদা ধর্মীয় রং দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এজন্য কোন ধর্মের সঠিক অনুসারী হওয়ার জন্য প্রয়োজন সে ধর্মের সংস্কৃতি ও কালচার মানুষের গ্রহণ করা এবং স্বীয় জীবনে অন্য কোন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কালচার প্রবেশ করার সুযোগ না দেওয়া।

## বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে আলোচনা

বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্বায়নের পরিভাষার সাথে সাথে অপর দু'টি পরিভাষাও খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে: ১। সভ্যতার দ্বন্দ্ব, ২। সভ্যতার মাঝে আলোচনা।

বিশ্বায়নের কিছু সমর্থকের ধারণা, গোটা বিশ্বে প্রচলিত সকল সভ্যতা একে অপরের নিকটবর্তী করে দেওয়া হোক। প্রতিটি সভ্যতার অনুসারীরা অন্যান্য সভ্যতা হতেও কালচার গ্রহণ করে তা স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করুক। এর জন্য বিভিন্ন সভ্যতার প্রতিনিধিদের পরস্পর আলোচনা করা এবং প্রতিটি সভ্যতার মৌলিক ও গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলোর ওপর একমত হওয়া দরকার, যাতে এভাবে একটি আন্তর্জাতিক সভ্যতা ও একক সংস্কৃতির অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের সাথে সাথে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে দেখা হয়

তাহলে বিষয়টি অসম্ভব মনে হয়। কারণ প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব একটি সভ্যতা-সংস্কৃতি রয়েছে। প্রতিটি দ্বীন কোন না কোন সভ্যতার ধারক। এজন্য সভ্যতা-সংস্কৃতি পরিত্যাগ প্রকৃতপক্ষে সে ধর্মকেই পরিত্যাগ করার নামান্তর। উপরন্তু বিগত কয়েক বছর বিভিন্ন সভ্যতাকে একে অপরের নিকটে আনার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন কোণায় যে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে ইসলামী সভ্যতাকেই বেশী টার্গেট বানানো হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার বিরাট অংশকে পশ্চাতে ঠেলে দেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, সাথে সাথে তার স্থানে পশ্চিমা সভ্যতাকে গ্রহণ করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

এজন্য বিভিন্ন সভ্যতাকে পরস্পরের নিকটে আনা এই স্লোগানের বাস্তবতার সাথে কোনই সম্পর্ক নেই, বরং এটি শুধু ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বর্তমান যুগে যাকে বাস্তবতা বলা যেতে পারে তা হলো, বিশ্বায়নের ঠিকাদারদের সর্বদা এই প্রচেষ্টা ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে- প্রতিটি জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার নির্মূল করে মার্কিন মূল্যেবোধের ওপর ভিত্তি করে গোটা বিশ্বে একক সভ্যতার বিস্তার ঘটাতে হবে, যাতে বিশ্ববাসী এই সভ্যতা গ্রহণ করে এমনভাবে জীবন যাপন করে যা দ্বারা মার্কিন স্বার্থে কোন ধরনের বাধা সৃষ্টি না হয় এবং বিশ্বায়ন তার সকল উদ্দেশ্য সফলকাম হয়। কারণ যখন ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠী মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতির শৃংখল স্বীয় গলায় পরে নেবে তখন তাদের মার্কিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি-পলিসি গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকবে না। আমাদের দেখতে হবে, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন গোটা বিশ্ব কিভাবে বিস্তৃত ও বিকশিত হচ্ছে। তার কারণ ও উপকরণ কি? তার অন্তরালে কি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিহিত? তার ইতহিাস-ঐতিহ্য কি? কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে আসুন, আমরা সভ্যতা সংস্কৃতির অর্থ ও তার বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করি।

## সংস্কৃতি কি?

সংক্ষেপে সংস্কৃতির সংজ্ঞা হলো-সংস্কৃতি এমন কিছু আকাইদ ও বিশ্বাসবোধ, চিন্তাধারা ধ্যান-ধারণা ও প্রথা-প্রচলনের সমষ্টির নাম যা জাতিকে অন্য জাতি হতে পৃথক করে দেয়।[১৫৩] এই সংস্কৃতির কারণেই একটি মানব গোষ্ঠি কিংবা সমাজ

---

১৫৩। আল-আওলামাহ ওয়াল খুসূসিয়াতুস-সাকাফাহ ইদ্রিস আল কাম্বুরী প্রনীত। আশ শাবকাতুল ইসলামীয়া http//: www. Islamweb.net .

অন্যান্য গোষ্ঠি ও সমাজ হতে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়। আর এ দ্বারা সমাজের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব নিরূপিত হয়। মালিক বিন নবী সাংস্কৃতির সংজ্ঞায় লেখেন, সংস্কৃতি কিছু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ের নাম। বাহ্যিক বিষয়, যেমন নড়া-চড়া, স্থির, ধরন ও কথাবার্তা, আর অভ্যন্তরীণ বিষয়, যেমন আস্বাদন, অনুভূতি, রসম-রেওয়াজ, প্রথা-প্রচলন ইত্যাদি অর্থাৎ কালচার এমন এক পরিবেশের নাম, যা একটি সমাজের ওপর বিশেষভাবে জীবনের এমন এক ছাপ ফেলে যায় যা আমরা অন্য কোন জাতি ও সমাজে দেখতে পাই না।[১৫৪]

মাইকেল বাগনন মর্ডেন্ট (Michael Bugnon Mordent) স্বীয় গ্রন্থ "স্বৈরাচারী আমেরিকা" তে লেখেন, কোন জাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হলো সে জাতির ভাষা, ইতিহাস, দক্ষতা, যোগ্যতা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রগত প্রতিভা, রসম-রেওয়াজ, প্রথা-প্রচলন, মূল্যবোধ ইত্যাদি। যেমনিভাবে উল্লিখিত বিষয়গুলো সংস্কৃতির একটি অংশ তেমনিভাবে জাতির পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহারসামগ্রী, কর্মপদ্ধতি, খেলাধুলার নিয়মকানুন মহব্বত-ভালবাসা, অনন্দ-খুশী, দুঃখ-বেদনার ধরন তার অনুভূতি ও চেতনাও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। যদি কোন জাতির কাছে আমরা এই আবেদন করি, সে তার উল্লিখিত গুণাবলী ও বিষয়াবলী পরিত্যাগ করবে, স্বীয় চিন্তা ভাবনা, ধ্যান- ধারণা ও অনুভূতির ধরন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং স্বীয় ভাষা-সাহিত্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে ফেলবে, তাহলে তার উদ্দেশ্য এই হবে যে, আমরা সে জাতির সংস্কৃতি খর্ব করছি এবং তার সংস্কৃতি ও কালচার ছিনিয়ে নিয়ে অন্য সভ্যতা তার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি।"[১৫৫] এখন যদি সে জাতি এই সমস্ত পরিবর্তনকে গ্রহণ করে নেয় এবং স্বীয় সংস্কৃতি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে কেমন যেন সে তার স্বাতন্ত্র্যকে নির্মূল করে দিল এবং স্বীয় অস্তিত্বে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিল।

## সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ও তার উদ্দেশ্য

বিশ্বায়ন যেমনিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নিজেকে বাস্তবায়ন করতে চায় তেমনিভাবে সভ্যতা-সংস্কৃতিকেও স্বীয় ছাঁচে ঢালাই করতে চায়। রাজনীতি ও অর্থনীতির পরে এখন তার উদ্দেশ্য সংস্কৃতিকেও বিশ্বায়ন করা এবং গোটা বিশ্বে একই ধরনের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া।

---

১৫৪। তাআম্মুলাত মুশকিলাতুল হাধারাহ মালিক বিন নবী প্রণীত.

১৫৫। আমেরিকা, আল মুস্তাবাদ্দাহ আল বিলায়াতুল মুত্তাহিদাহ, পৃ. ১০৮

মানুষের মধ্যে বর্ণ ও বংশে বৈপরীত্য পাওয়া গেলেও (যা প্রাকৃতিক ও সুনিশ্চিত) ভাষা, মেজাজ ও রুচিবোধ, চাল-চলন, আচার-আচরণ ও জীবনের মান, এমন কি চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও অভিন্ন হবে। সকল মানুষের ভাষা এক হবে। আর অবশিষ্ট ভাষাগুলো ইতিহাসের গর্ভে বিলীন করে দেওয়া হবে। তাদের অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণা এক ধরনের হবে যাতে ধ্যান-ধারণার বৈপরীত্যের কারণে কোন স্বার্থ অর্জনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। তাদের পথে জীবনের চাল-চলনও এক হবে, যাতে জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি ও বিক্রয়কারী কোম্পানীর কখনো মন্দা বাজারের অভিযোগ না থাকে। এতদিন পর্যন্ত বিশ্বায়নের অন্যান্য বিভাগে পশ্চিমা ও মার্কিন মূল্যবোধের প্রধান্য প্রবল ছিল, বরং অন্যান্য ধ্যান-ধারণার প্রতি সামান্য ভ্রূক্ষেপও করা হয়নি। রাজনীতিকে মার্কিন স্বার্থ অনুযায়ী ঢেলে সাজানো হয়েছে। অর্থনীতিকে বহুজাতিক কোম্পানীর চাহিদা অনুযায়ী পুনর্গঠন করা হয়েছে। সুতরাং সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পশ্চিমা ও মার্কিন সংস্কৃতিকেই বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হবে। মার্কিন সংস্কৃতিরই এই অধিকার থাকবে যে, সেটাই " গোটা বিশ্বের একক সংস্কৃতি" হবে। এটাকেই আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি ও কালচারের যোগ্য মনে করা হবে। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নকে যদিও এক শ্রেণী বিশেষ একটা গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের সবচেয়ে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক বিভাগই হলো সংস্কৃতি। কারণ রাজনীতি ও অর্থনীতির বিশ্বায়ন তো বস্তুবাদের আলোকে করা হচ্ছে আর সংস্কৃতির সম্পর্ক (যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি) সরাসরি ধর্মের সাথে, বিশেষ করে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এজন্য ইসলাম সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ গোটা বিশ্বের সকল সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নির্মূল করে শুধু মার্কিন ও পশ্চিমা সংস্কৃতিকে বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অর্থ সরাসরি ধর্মের ওপর আঘাত হানা। এর ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নকে মোটেই সহজ ভাবা উচিত নয়।

বিশ্বায়নের নীতি-নির্ধারক সংস্থাগুলো সভ্যতা-সংস্কৃতিকে এজন্য বিশ্বায়ন করতে চায়, যাতে রসম-রেওয়াজ, আচার আচরণ, প্রথা-অভ্যাস, চাল-চলন ও জীবন মানের সামঞ্জস্যের কারণে মানবতা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগ যার সংখ্যা বেশী, তার মর্যদা হলো, আন্তর্জাতিক বাজারের একজন ট্যাক্স আদায়কারীর মত। তার কাজ ট্যাক্স আদায় করা এবং আন্তর্জাতিক সম্পদের হকদার ও অধিকারী শ্রেণীর সেবা করা, আর দ্বিতীয় শ্রেণী যার সংখ্যা কম, তারা

একচেটিয়া সবাই ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি ও শিল্পপতি, তাদের কাজ স্বীয় বাণিজ্যের বিকাশ সাধন করা ও অধিকতর সম্পদ অর্জন করা।

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য এটাই যে, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসার দ্বারা রাজনৈতিক স্বার্থ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়ও যেন কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় এবং ভূপৃষ্ঠে এমন কোন লোক অবশিষ্ট না থাকে যার মস্তিষ্কে পশ্চিমা নীতির বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন ও অভিযোগ উথিত হবে, তার মুখ দিয়ে জায়নবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন শব্দ বের হবে। ফলে তার চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অন্য লোকও পথ খুঁজে পাবে। ফলে সে বিশ্বায়নের রাস্তায় অন্তরায় হবে।

## সাংস্কৃতিক আধিপত্য একটি প্রাচীন রীতি

প্রতিটি সচেতন ও জাগ্রত জাতি স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তাহযীব-তামাদ্দুনকে নিজের জন্য গর্বের বস্তু মনে করে। তার নিকট সংস্কৃতির উর্ধ্বে অন্য কোন বস্তু সামষ্টিক সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয় না। এজন্য প্রাচীন যুগ হতেই সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের ধারা চলে আসছে। প্রতিটি জাতি তার সভ্যতা অন্য জাতির নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কেউ শান্তিপূর্ণ রাস্তা গ্রহণ করেছে আর কেউ উগ্রতার পথ ধরে এ কাজ সম্পাদন করেছে। প্রাচীন মিসরের ইতিহাসেও একথা পাওয়া যায়, সে যুগে মিসরীয় সভ্যতাকেই অন্যান্য জাতির আদর্শ মনে করা হতো। আর অবশিষ্ট সভ্যতাগুলো নিজ নিজ অঞ্চল ও এলাকা পর্যন্তই সীমিত ছিল কিংবা তার টিমটিম প্রদীপ নিভে যাওয়ার ঘোষণা করছিল। মিসরীয় সভ্যতার পরে এই মর্যাদা ও স্থান কিনানী সভ্যতা দখল করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাও এই মর্যাদা ও স্থান অর্জন করেছে। চীনের সভ্যতাকেও স্বীয় যুগে মানুষের জন্য অনুসরণীয় মনে করা হতো। আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর বিশ্ব বিজয়ের সাথে সাথে গ্রীক সভ্যতা বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বীয় পতাকা গেঁড়ে বসেছিল। তা পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও প্রধান সভ্যতা হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছিল। অত:পর পারস্য ও রোমান সভ্যতার পর ইসলামী সভ্যতা এই স্থান ও মর্যাদা অর্জন করে ছিল, যা উত্তর-পশ্চিমে স্পেন অতিক্রম করে ইউরোপের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিল।

উত্তর-পূর্বে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত ও দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য ও ভারত এমন কি চীন পর্যন্ত তার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইসলামী সভ্যতা ও ইসলাম-পূর্ব

সভ্যতার মাঝে পার্থক্য ছিল, যেমনিভাবে ইসলাম উন্নত চরিত্র, সাম্য ও সমুন্নত মূল্যবোধের মত তার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও শিক্ষায় গোটা বিশ্বে ব্যাপকতা লাভ করেছিল এবং ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে ইসলামী সভ্যতাও স্বীয় অভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে লোকদেরকে তার অনুসারী ও গুণগ্রাহীতে পরিণত করেছিল এবং বিশ্বের সকল জাতি, বর্ণ ও বংশের বৈপরীত্য সত্ত্বেও ইসলামের মধ্যে একটা আকর্ষণ অনুভব করেছিল।

পক্ষান্তরে ইসলাম-পূর্ব জাতিগোষ্ঠীগুলো স্বীয় সভ্যতার বিকাশের জন্য শক্তি, বল ও উগ্রতার পথ গ্রহণ করেছিল। জোরপূর্বক লোকদেরকে স্বীয় সংস্কৃতির অনুসারী বানিয়েছিল।[১৫৬] আজ যখন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং ভাগ্য প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারীরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে, কিভাবে গোটা বিশ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার ঘটানো যায়। তারা তাদের এই প্রচেষ্টায় অনেকটা সফলকামও বটে, প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে উগ্রতার বেশী দখল নেই বরং এবার তারা পাশ্চাত্য সভ্যতা গোটা বিশ্বে প্রসার করার জন্য নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। আর সেসব পদ্ধতি অত্যন্ত চতুরতার সাথে সুপরিকল্পিত উপায়ে কার্যকর করছে। তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উন্নতি-অগ্রগতি তাদের কাজকে আরো সহজ করে দিয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতা ফোকলা হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ আমরা যে সভ্যতাকে পশ্চিমা সভ্যতা বলি, তা মূলত মার্কিন সভ্যতা। কারণ অতীতে ইউরোপের নিকট যে একক সভ্যতা ছিল, তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, যাকে তারা সভ্যতা বলবে। ইউরোপের কিছু কিছু দেশ অনেক দেরীতে অলসতা হতে জাগ্রত হওয়ার পর স্বীয় ভাষাকে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসেবে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভাষা ছাড়া ইউরোপের নিকট আর কিছুই বাকী নেই, বরং সব কিছু মার্কিন রঙে রঙিন হয়ে গেছে। এছাড়া ভাষা বাদ দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতাকে মূলত মার্কিন সভ্যতাই বলা হবে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিডিয়া, প্রচার মাধ্যম ও যোগাযোগ দ্বারা ইউরোপসহ গোটা বিশ্বে চালু করেছে। এখন তো এই তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যমের ক্রমবর্ধমান উন্নতি অগ্রগতির সাথে মার্কিন সভ্যতার বিকাশ ও প্রসারে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

১৫৬। মাল আওলামাহ হাসান হানাফীকৃত, পৃ.৩৮।

## যোগাযোগ মাধ্যম পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার

বিশ্বায়নবাদীদের একথা ভাল করেই জানা ছিল, ভবিষ্যতে যদি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বীয় আধিপত্য ধরে রাখতে হয় তাহলে, মার্কিন সভ্যতারও বিশ্বায়ন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যের জন্য তারা 'যোগাযোগ মাধ্যম' অন্য মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাদের ভাল করেই জানা ছিল, যদি গোটা বিশ্বকে মার্কিনীকরণ করতে হয় তাহলে মার্কিন জীবন আচরণকে আদর্শ ও অনুসরণীয় বানাতে হবে। মানুষের বিবেককে ফাঁদ পেতে স্বীয় বলয়ে ও আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে। মানুষের চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার ওপর অতর্কিত হামলা চালানোর জন্য তারা প্রচার মাধ্যম ও মিডিয়াকে নির্বাচন করেছে। এ রাস্তায় তারা মার্কিন সভ্যতাকে গোটা বিশ্বে গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় বানানোর সফল প্রয়াস চালিয়েছে। মূলতঃ বিশ্বায়নবাদীরা এই কর্মকৌশল গ্রীকদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। সক্রেটিসের যুগেই গ্রীক শাসকবর্গের মনে একথা বদ্ধমূল ও বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, শুধু রাজনীতির সরু পথ দখল করেই স্থায়ী ক্ষমতা ধরে রাখা যাবে না, এর জন্য জনগণের মস্তিষ্ক ধোলাই করতে হবে। তাদেরকে স্বীয় তৈরিকৃত রোড ম্যাপের ওপর পরিচালনা করতে হবে। নিজেদের আচার-আচরণ ও প্রথা-প্রচলনকে তাদের নিকট হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক করে তুলতে হবে। তাদের চিন্তাধারা নিজেদের চিন্তাধারা অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। এ কর্মপদ্ধতিই বিশ্বায়নবাদীরা স্বীয় আন্দোলনকে স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য গ্রহণ করেছে। আর এই কর্মকৌশলকে বিশ্বজনীন করার জন্য মিডিয়াকে নির্বাচন করেছে।[১৫৭]

যোগাযোগ মাধ্যম প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু কর্মের সমষ্টি, যার মাধ্যমে মানুষ পরস্পর আবেগ-অনুভূতি, মতামত-প্রতিক্রিয়া, চিন্তাধারা-ভাবধারা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করে। এই আদান-প্রদান ও মত বিনিময় এমন সব উপকরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে যেগুলোকে পৃথক পৃথক দুটিভাগে বিভক্ত করা যায়:

১) এমন সীমিত উপকরণ যা সীমিত ব্যক্তিকে পরস্পর মিলিয়ে দেয়। সেসব উপকরণের মধ্যে টেলিফোন, ফ্যাক্স, মোবাইল ইত্যাদির সাথে সাথে সমাবেশ, সম্মেলন, কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ এগুলো পরস্পরকে মিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যম।

---

১৫৭। আমেরিকা, আল মুস্তাবাদ্দাহ আল বিলায়াতুন মুত্তাহিদাহ, পৃ. ১০২-১০৮।

২) এমন উপকরণ যা অগনিত ব্যক্তি পর্যন্ত কথা পোঁছে দেওয়ার মাধ্যম, এর মধ্যে পত্র-পত্রিকা, টিভি-ভিসিআর, সিনেমা-ফিল্ম, টিভি-র বিজ্ঞাপন, ইন্টারনেট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মার্কিন সভ্যতার বিকাশে ও বিস্তারে দ্বিতীয় প্রকারের উপকরণই বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যার ওপর আমেরিকা শুরু হতেই স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে ইহুদীরা প্রচার মাধ্যম ও মিডিয়ার ওপর পূর্ণ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল, যা আজ পর্যন্ত তাদের প্রভাবাধীন ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং দুর্ভাগ্যবশত এই মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়ে থাকে।

## মার্কিন মিডিয়া

এমনি তো আমরা মার্কিন প্রচার মাধ্যমকে মার্কিন মিডিয়া বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষ এটা নির্ভেজাল ইহুদী মিডিয়া, যা কোটিপতি সুদখোর ইহুদী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই মিডিয়াকে ইহুদী কমিউিনিটির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার মনে করা হয় এমন কি এর মাধ্যমে তারা মার্কিন রাজনীতিতে এমন গভীর প্রভাব ফেলেছে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থীকে স্বীয় বিজয় নিশ্চিত করার জন্য ইহুদী মিডিয়াকে তোষামোদ করতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহুদীরা স্বীয় মনীষীদের প্রটোকল বাস্তবায়ন করেছে। ইহুদী পটোকলের ১২তম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে, আমাদের মঞ্জুরী ছাড়া তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ সংবাদও কেউ সমাজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। একথা নিশ্চিত করতে আমাদের ইহুদীরে জন্য সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা অবশ্য করণীয়, যার মৌলিক কাজ হবে গোটা বিশ্বের প্রতিটি কোণা থেকে সংবাদ একত্র করা। এমতাবস্থায় আমরা একথার গ্যারান্টি দিতে পারি, আমাদের মর্জি ও ইচ্ছা ছাড়া কোন সংবাদ প্রকাশিত হতে পারবে না।

ইহুদীরা স্বীয় প্রটোকল প্রস্তুত করার পূর্বেই ১৮৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সংবাদ এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই এজেন্সিকে আমেরিকার পাঁচটি বড় বড় দৈনিক মিলে 'এসোসিয়েটেড প্রেস, নামে প্রতিষ্ঠা করে। অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৯০০ সনে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কাজ শুরু করে এবং আমেরিকায় প্রকাশিত সকল পত্র-পত্রিকাসহ গোটা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমকে সংবাদ সরবরাহ করতে থাকে। ১৯৮৪ সনের পরিসংখ্যান

অনুযায়ী এজেন্সীর সাথে আমেরিকার তের'শ দৈনিক, তিন হাজার সাত শত আটাশিটি রেডিও এবং ৮৮টি টিভি স্টেশন জড়িত আছে। আমেরিকার বাইরে এগার হাজার নয় শত সাতাশ (১১৯২৭)টি দৈনিক ও রেডিও, টিভি স্টেশন জড়িত আছে। স্যাটেলাইট ও অন্যান্য মাধ্যমে দৈনন্দিন এক কোটি সতের লাখ শব্দ সম্বলিত লেখা মিডিয়াকে সরবরাহ করা হয়। অর্থনৈতিক ও সম্পদ সংক্রান্ত সংবাদের বিশেষ বিভাগ রয়েছে। সেখান থেকে গোটা বিশ্বে আট হাজার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তাজা তাজা সংবাদ সরবরাহ করা হয়। সে সমস্ত সংবাদের বিনিময় মূল্য সীমাহীন চড়া থাকে। এই নিউজ এজেন্সির আমেরিকায় প্রায় এক শত সতেরটি অফিস ও বহির্দেশে এক শত একাশিটি কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে পাঁচ শত উনষাট জন সাংবাদিক কর্মরত রয়েছে। সদর দফতর নির্ধারিত এডিটর সাংবাদিকদের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। এই এজেন্সী ১০০% ইহুদী পুঁজি দ্বারা পরিচালিত। এছাড়াও এই এজেন্সিতে কর্মরত পঁচানব্বই শতাংশ কর্মী ইহুদী। এজন্য একে ইহুদী নিউজ এজেন্সী বলা হয়ে থাকে।[১৫৮]

১৯০৭ সনে আমেরিকার দুই পুঁজিপতি ইউনাইটেড প্রেস নামে একটি নিউজ এজেন্সির গোড়াপত্তন করে। এর দুই বছর পর ১৯০৯ সনে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা খুব দ্রুত একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ও প্রচার কেন্দ্রে পরিনত হয়। এর শাখা-প্রশাখা গোটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যায়। এই দুইটি নিউজ এজেন্সি ১০০% ইহুদী মালিকানায় ছিল। অত:পর ১৯৫৮ সনে ইউনাইটেড প্রেস ও ইন্টারন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি একীভূত হয়ে যায় এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর মালিকানায় চলে আসে, যা একজন ইহুদীর অধীনে আছে। অত:পর ১৯৮৪ সনে একে মিডিয়া নিউজ কর্পোরেশন-এ একীভূত করে দেওয়া হয়। এই নিউজ এজেন্সির খরিদ্দারের সংখ্যা প্রায় সাত হাজার উনাশি। তন্মধ্যে দুই হাজার দুই শত ছিচল্লিশটি খরিদ্দার (পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও টিভি স্টেশন) আমেরিকার বাইরের। এই কেন্দ্রীয় সংবাদ সংস্থার অধীনে প্রায় ৩০টি সংবাদ সংস্থা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে।

ইউনাইটেড প্রেস ও ইন্টান্যাশনাল নিউজ এজেন্সি সাথে আমেরিকার এগার শত চৌত্রিশটি পত্রিকা, পাবলিশার প্রতিষ্ঠান ও তিন হাজার ছয় শত নিরানব্বইটি রেডিও স্টেশন জড়িত আছে। গোটা বিশ্বে এই সংস্থার প্রায় ১৭৭টি কেন্দ্র রয়েছে।

---

১৫৮। মাগরিবী মিডিয়া পৃ. ১১৩।

শুধু আমেরিকাতেই তার ৯৬টি দফতর রয়েছে। দৈনন্দিন ১৮ মিলিয়ন শব্দসম্বলিত লেখা ও সংবাদ খরিদ্দারদের সরবরাহ করা হয়। আর দৈনিক গড়ে ৮২টি ফটো ও ছবি সরবরাহ করা হয়।[১৫৯] আন্তর্জাতিক নিউজ এজেন্সিগুলোর আলোচনা আসলে প্রসিদ্ধ স্ংবাদ সংস্থা রয়টার্স- এর নামও এসে যায়। এই সংস্থা ব্রিটেন, আস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড-এর প্রচার মাধ্যমকে সবচেয়ে বেশী সংবাদ সরবরাহ করে। কিন্তু স্বয়ং সংস্থার অবস্থা এই যে, তার অধিকাংশ সংবাদ মার্কিন সংস্থাসমূহ হতে নেওয়া হয়। এজন্য আমরা একথা বলতে পারি, আমেরিকার নিকট সংবাদ সংস্থার এমন ব্লক রয়েছে, যা আমেরিকায় প্রকাশিত ৯০ শতাংশ সংবাদের একক মাধ্যম।

এছাড়াও মার্কিন সংবাদপত্রের জগতে ১৮৫১ সাল হতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে রয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস, হেরাল্ড ট্রিবিউন, রিডার ডাইজেস্ট, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, টাইম ম্যাগাজিন ও নিউজ টিভি চ্যানেলের মধ্যে N. B. C. A. B. C ও ১৯৮০ সনে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রসিদ্ধি লাভকারী CNN ইত্যাদির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না, যা অতিরঞ্জিত ছাড়াই গোটা বিশ্বে মার্কিন নীতির পক্ষে পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার শক্তিশালী মধ্যমের কারণেই কোটি কোটি মানুষের চিন্তাধারা ও ভাবধারাকে স্বীয় ভাবধারা অনুযায়ী গড়ে তুলতে সফলকাম হয়েছে। এই সুবিস্তৃত মিডিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই আমেরিকা তার সভ্যতা-সংস্কৃতি ও প্রথা-প্রচলন গোটা বিশ্বে ব্যাপক হারে বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, এমন কি মার্কিন মিডিয়া এদিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, মানুষ চায় বিশ্বের যে অঞ্চলেই বাস করুক মার্কিন ধরন অনুযায়ীই ইংরেজী বলবে এবং মার্কিন পদ্ধতি মোতাবেকই ইংরেজী শব্দ লিখবে এবং তাদের বানান রীতি গ্রহণ করবে।

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় সর্বসাধারণ পর্যায়ে মার্কিন মিডিয়ার শক্তি প্রমাণিত হয়। সে সময় এজেন্সিগুলো সম্পূর্ণভাবে মার্কিন মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছিল। মার্কিন নিউজ এজেন্সি ও টিভি চ্যানেলগুলো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করেনি বরং মার্কিন সরকারের মর্জি অনুযায়ী সংবাদ প্রচার করেছে। সাথে সাথে যুদ্ধের পূর্বে এই মিডিয়া শক্তি গোটা বিশ্বে আমেরিকার পক্ষে পরিবেশ তৈরি করেছে এবং ইরাককে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছে।[১৬০]

---

১৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪।

১৬০। আমেরিকা, আল মুস্তাবাদ্দাহ, পৃ.১১১।

## যোগাযোগ বিশ্বে আমেরিকার ভয়াল থাবা

পূর্বে আমি আলোচনা করেছি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ময়দানের সাথে সাথে বিবেককে জয় করা ও স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গোটা বিশ্বে বিস্তার করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচার মাধ্যম ও যোগাযোগ মাধ্যমের আশ্রয় নিয়েছে এবং স্বীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে বিশ্বের প্রতিটি কোনায় প্রসারিত করে দিয়েছে। আমেরিকার নিকট আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তার অনুমান সহজেই করা যেতে পারে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট আলগোর এক নির্বাচনী সভায় বক্তৃতাকালে বলেছিলেন, আমেরিকার বিভিন্ন মৌলিক যুদ্ধের মধ্যে একটি হলো মিডিয়া যুদ্ধ। উক্ত সভায় আলগোর একথাও স্বীকার করেছিলেন, আমেরিকা বিগত ১০ বছরে এই যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রায় কোটি ডলার ব্যয় করেছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগনের সাবেক সদস্য ও প্রসিদ্ধ মার্কিন ইউনিভার্সিটি হার্ভার্ড-এর কেনেডী কলেজের বর্তমান প্রধান জুসেফ এসনাই-এর বক্তব্য হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার তুলনাহীন শক্তি ও যোগ্যতার ভিত্তিতে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থার একক মালিক হবে, কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমেরিকার নিকট কি পর্যাপ্ত উপকরণ আছে? আসলেই কি যোগাযোগ বিশ্বে আমেরিকার ভয়াল থাবা বিস্তৃত?

এর উত্তর হলো, বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা আলোচনা করেছি, পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টিভি ও নিউজ এজেন্সিসহ মিডিয়ার সকল বিভাগের ওপর আমেরিকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এছাড়াও সকল যোগাযোগযন্ত্রও মার্কিন কোম্পানীর অধীনে রয়েছে যা গোটা বিশ্বে স্বীয় যন্ত্র প্রস্তুত করে সাপ্লাই করছে। কম্পিউটার, টেলিফোন, টিভি সেট, ভিসিআর, সিডি, স্যাটেলাইট ইত্যাদির ক্ষেত্রে মার্কিন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর ভয়াল থাবা বিস্তৃত। সুতরাং সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী ব্যক্তি বিল গেটস-এর কোম্পানী মাইক্রোসফট IBM-এর সাথে কম্পিউটারের আন্তর্জাতিক বাজারে বিজয় অর্জন করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক একটি চুক্তি করেছে।

যোগাযোগ বিশ্বকে স্বীয় হাতের মুঠোয় আনার এই গোপন যুদ্ধে আমেরিকার সাথে তার শক্তিশালী মিত্রও রয়েছে, যারা শিল্প ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে বিশ্বব্যাপী কর্মতৎপর। সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে TCI (টাইম ওয়ার্নার) ইউ এস ওয়েস্ট US West ও 'ফিকোম' কোম্পানী উল্লেখযোগ্য। এই কোম্পানী হলিউডের

সিনেমা কোম্পনী পার্মেন্টকে ১০০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে ক্রয় করে নিয়েছে। উল্লেখিত কোম্পানী ক্রয় করার পর ফিকোম বিশ্বের সবচেয়ে বেশী ভিডিও ক্যাসেট বিক্রয়কারী কোম্পনীতে পরিণত হয়েছে। আর 'ব্ল্যাক বিস্টার এনটারটেইনমেন্ট হলো দ্বিতীয় নম্বর বড় কোম্পানী, যার প্রসিদ্ধ সংগীত চ্যানেল MTV এর সাথে রয়েছে গভীর সম্পর্ক এবং গোটা বিশ্বে ১৩০ মিলিয়ন ব্যক্তিকে প্রোগ্রাম দেখায়। এমনিভাবে হকার্স নামক একটি যোগাযোগ কোম্পানী ডাইরেক্ট টিভি (Direct TV) নামে একটি স্যাটেলাইট ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে যাচ্ছে। যার মাধ্যমে সে দেড় শ'র বেশী চ্যানেল গোটা বিশ্বে প্রচার করতে পারবে। অপরদিকে প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক কোম্পানী AT & T এটি এন্ড টি, সিলিকন গ্রাফিক্স (Silicon Graphics)- ও টাইম ওয়ার্নার এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি গ্রুপ এমন একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে যার মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন স্থানে সব সময় ৫০০ হতে বেশী মার্কিন ফিল্ম পাওয়া যাবে।

উল্লেখিত কোম্পানীগুলো আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে মার্কিন বলয়ে আনার জন্য তাকে পূর্ণভাবে সহযোগিতা করছে। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, এই গোপন ও অঘোষিত যুদ্ধ প্রায় সমাপ্তির পথে এবং এ যুদ্ধেও অন্যান্য যুদ্ধের মত বিজয়ের মুকুটও আমেরিকার মাথায় থাকছে।

## প্রোপাগান্ডা একটি কার্যকরী হাতিয়ার

ফ্রাঁসো বরোন বলেন, মেধাবী লোকদের ওপর নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফেলার নাম প্রোপাগান্ডা।

অন্য ভাষায়, প্রোপাগান্ডা কেবল মিথ্যা ও ধোঁকা। যদিও তা আমেরিকা তৈরী করেনি কিন্তু তাকে একটি কার্যকরী ও সক্রিয় অস্ত্রের রূপ অবশ্যই সে দিয়েছে। এর প্রয়োগ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শুরু হয়, বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর যখন বৃটিশ বাহিনী যুদ্ধের গতিধারা পাল্টে দিয়েছে, তখন মার্কিন মিডিয়া বিজয়ের রাজমুকুট বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর মাথায় পরানোর পরিবর্তে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর মাথায় পরায়। আমেরিকা এই বলে প্রোপাগান্ডা করেছিল, তাদের বদৌলতেই ইউরোপ নাজীদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে! এই প্রোপাগান্ডা এত প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রমাণিত হয়েছিল যে, ইউরোপীয় জনগণের একথা বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, আমেরিকা তাদের জন্য কোন আলৌকিক শক্তি হতে কম নয়! সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রচার মাধ্যমে এই কার্যকারী অস্ত্রকে কোন না কোন আকৃতিতে একাধারে

প্রয়োগ করে আসছে। এই কয়েক লাইন দ্বারা শুধু একথা বলা উদ্দেশ্য যে, আজ মার্কিন মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমের অবস্থান এই যে, সে পুরো বিশ্বকে যেভাবে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে চাইবে নিতে পারবে। মানুষ অনিচ্ছায় ও অবচেতনভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রসারকৃত সংবাদকে নির্দ্বিধায় ও বিনা বাক্যে গ্রহণ করে নিচ্ছে। প্রসিদ্ধ মার্কিন নিউজ চ্যানেলের এই পদ্ধতি দ্বারা টিভি দেখা ব্যক্তি তার জাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং টিভির পক্ষ হতে পেশকৃত কথাকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে শুরু করে।[১৬১]

## মার্কিন সভ্যতার কণ্ঠস্বর হলিউড

সিনেমার সূচনা যদিও ইউরোপে হয়েছে এবং আমেরিকা চলমান ছবির সাথে শব্দ সংযুক্ত হলে, নিজকে তার আবিষ্কারক প্রমাণ করার পূর্ণ প্রয়াস চালিয়েছে। কিন্তু যখন সিনেমা উন্নতি লাভ করল এবং নড়াচড়া করতে করতে ফটো হতে আওয়াজ আসতে লাগল তখন আমেরিকা বড় বড় ছবি নির্মাতাকে ইউরোপ হতে আমন্ত্রণ জানাল এবং তাদের মাধ্যমে ফিল্ম তৈরি করল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে তৈরিকৃত যে সমস্ত ছবি ও ফিল্ম প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তার মধ্যে ৮০ শতাংশ ছবি মার্কিন ছবি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হলিউডের তৈরি করা ছিল, যার মধ্যে ইউরোপীয় ছবি নির্মাতারা কাজ করেছিল।

সে সমস্ত ছবির জনপ্রিয়তা ও তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখে আমেরিকার এই অনুমান হয়ে গিয়েছিল যে, বিবেককে জাদু করা ও মার্কিন জীবন পদ্ধতিকে ইতিবাচক উপায়ে পেশ করার জন্য ছবি একটি কার্যকরী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী অস্ত্র। সুতরাং তার স্বীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির বিকাশ সাধন এবং তাদের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে বিস্তার করার জন্য ফিল্ম ও ছবির আশ্রয় নিল এবং যেমনিভাবে তারা শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বীয় আধিপত্য ও ইজারাদারি প্রতিষ্ঠা করেছিল তেমনিভাবে চলচ্চিত্র জগতের ওপরও বিজয় অর্জন করল। বিভিন্ন চুক্তি ও প্রতারণার আড়ালে মার্কিন চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল পর্যন্ত বিস্তার করে নিল। সুতরাং ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন সময়ের ফরাসী প্রেসিডেন্ট বিওন ব্লুমের কাছে বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও সহায়তার বিনিময়ে মার্কিন চলচ্চিত্রকে বিশেষ ছাড় দানের জন্য দাবী করা হয়। ফরাসী প্রেসিডেন্ট এই দাবীকে মেনে

---

১৬১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১২২।

নেন। যার ভিত্তিতে ফ্রান্সে মার্কিন চলচ্চিত্রের সয়লাব হয়ে যায়। ফ্রান্স স্বয়ং চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়। তার চলচ্চিত্র শিল্প ইতালি ও জার্মানী হতে অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফরাসী টিভিতে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মার্কিন চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছিল। সিনেমা হলগুলো মার্কিন ছবির দখলে চলে এসেছিল, এমন কি ইউরোপে চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পাঁচটি সবচেয়ে বড় কোম্পানীও মার্কিন অধীনে চলে এসেছিল। এই চলচ্চিত্রের সয়লাবের প্রভাবে ফরাসী সভ্যতা মার্কিন সভ্যতার সামনে মাথা নত করেছিল। ফরাসী জাতির চেতনাশীল নেতৃত্বের বদৌলতে সেখানকার ভাষা সংরক্ষিত থাকলেও আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।

হলিউড তো পুরো বিশ্বের কোণায় কোণায় মার্কিন সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছে। কিন্তু আমেরিকা বিদেশী চলচ্চিত্রের জন্য এমন এমন নীতি তৈরি করেছে যে, তারা স্বাধীনভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বীয় দেশের সভ্যতার বিস্তার ঘটাতে পারবে না। সুতরাং ১৯৯৬ সনে মার্কিন টিভি চ্যানেলে ৪৯২ টি মার্কিন ছবি দেখানো হয়েছে।

আর সর্বমোট মাত্র ২৭ টি বিদেশী ফিল্ম মার্কিন সিনেমা হলগুলোতে দেখানো হয়েছে। এক জরিপ মতে ১৯৮৩ সনে পুরো বিশ্বের সিনেমা হলগুলোতে শুধু মার্কিন ছবি দেখার জন্যই ৩৫% টিকেট বিক্রি হয়েছে। এই হার ১৯৯৩ সনে ৫৭% পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

আর একই বছর শুধু ইউরোপে মার্কিন চলচ্চিত্রের জন্য টিকেট বিক্রির হার ৭১% ছিল, যা ১৯৯৬ সনে ৮০% হয়ে যায়। এর মোকাবেলায় আমেরিকায় ইউরোপীয় চলচ্চিত্রের হার মাত্র ১থেকে ৩শতাংশ। এই পরিসংখ্যান দ্বারা অনুমিত হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সভ্যতা-সংস্কৃতি গোটা বিশ্বে বিস্তার করা আর অন্যান্য দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি থেকে স্বীয় দেশকে রক্ষার ব্যাপারে কত সজাগ! এ সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার ফলাফল, মার্কিন সভ্যতা যা বিশ্বজনীন হওয়ার জন্য বহু বছর পূর্বে নির্বাচিত হয়েছিল, অত্যন্ত বিদ্যুৎ গতিতে পূর্বে ও পশ্চিমের দূরত্ব অতিক্রম করছে এবং ভৌগোলিক সীমারেখা হতে বেপরওয়া হয়ে প্রতিটি দেশের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের ওপর জাদুর প্রভাব ফেলছে। মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্পের এই সয়লাবের প্রভাব প্রতিটি দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। জার্মানীকে ঐ সমস্ত ইউরোপীয় দেশের মধ্যে গণনা করা হয়, যারা স্বীয় ভাষার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও জার্মানীর চলচ্চিত্র শিল্পের ওপর ৮৫% মার্কিন সিনেমার

প্রাধান্য রয়েছে। বার্লিনের বড় বড় স্টুডিওতে মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে। আর আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ সমস্ত চলচ্চিত্রের প্রসারের মাধ্যমে মার্কিন সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক মার্কিন চলচ্চিত্র পরিবেশনকারী একটি সংস্থা এ. এম. সি. ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে, সে প্রতিটি দেশে এমন কমপ্লেক্স নির্মাণ করবে যার মধ্য হতে প্রতিটিতে কম পক্ষে ২০টি সিনেমা হল হবে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ফ্রান্সের ইউনিফারেন্স কোম্পানীর সাথে প্যারিসে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। প্রতিনিধিদের ভাষ্য এই যে, এ পদক্ষেপের ফলে চলচ্চিত্র বিপুল পরিমাণে উৎসাহিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, এ দ্বারা ফারসী বাজারে মার্কিন চলচ্চিত্রের আরো বেশী স্বাধীনতা অর্জিত হবে এবং তার সভ্যতার বিকাশ সাধনের সুবর্ণ সুযোগ হাতে আসবে।

ইউরোপের আরেকটি দেশ সুইজারল্যান্ডেরও এই অবস্থা, সেখানে প্রতিটি সিনেমা হলে ১০ টি করে ছবি দেখানো হয়, তার মধ্যে ৯টিই মার্কিন ছবি। আর দশমটার বেলায়ও জরুরী নয় যে, তা ইউরোপ কিংবা সুইজারল্যান্ডের তৈরি হতে হবে। পোল্যান্ডের শুধু এক শতাংশ সিনেমা হলে দেশীয় ছবি দেখানো হয়। বাকী সিনেমা হলগুলো মার্কিন ছবির জন্য নির্ধারিত। হাঙ্গেরীতে তিন শতাংশ সিনেমা হলে স্থানীয় ছবি আর বাকী ৯৭ শতাংশ সিনেমা হলে মার্কিন ছবি প্রদর্শিত হয়। মার্কিন সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার করার জন্য কত সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত উপায়ে কাজ চলছে তার অনুমান নিম্নের আলোচনা থেকে অনুমান করা যেতে পারি। বড় কোম্পানী যা আন্তর্জাতিক বাজার দখল করে আছে যখন কোন দেশের সাথে কোন বড় ধরনের চুক্তি করে তখন তার সাথে শর্তও আরোপ করে যে, তারা সে সমস্ত মার্কিন চলচ্চিত্রকে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে প্রদর্শন করার অনুমতি দেবে যা কোন কারণে ইউরোপ ও আমেরিকায় চলতে পারে না।[১৬২] মার্কিন চলচ্চিত্র আন্ত র্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক হওয়ার কারণে আজ এমন কোন দেশ বাকী নেই যেখানে মার্কিন সভ্যতা ও কৃষ্টি স্বীয় পাঞ্জা গেড়ে বসেনি। নতুন প্রজন্ম সবচেয়ে বেশী এই সয়লাবে প্রভাবিত। প্রতিটি দেশের অধিকাংশ নওজোয়ান তার দেশীয় ও জাতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি হতে মূখ ফিরিয়ে মার্কিন সভ্যতার গুণগ্রাহী হয়ে গেছে। আর বিশ্বায়নের উদ্দেশ্যও জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নির্মূল করে দিয়ে তদস্থলে মার্কিন সভ্যতার বিস্তার ঘটানো।

---

১৬২ | প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১২০।

## বিশ্বায়ন ও আধুনিক সভ্যতা

Globalization বা বিশ্বায়নের রাজনীতি সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছে জাতিসংঘ। অর্থনীতি পরিচালনা করছে world Trade Organization এবং সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছে জাতিসংঘের অধীনস্থ কতগুলো সাব-কমিটি যার কাজ হলো বিশ্বের সকল ভাষা ও চিন্তার জগৎকে বিশ্বায়নের আওতায় এনে তাদের নিজস্ব গতিতে পরিচালনা করা। Globalization For Political System হলো এমন একটি শাসন ব্যবস্থা চালু করা যার মাধ্যমে যে কোন দেশের Internal & External Affairs নিয়ে যখন তখন Interfere করা। এভাবে সমগ্র বিশ্বে Inernational Police এর ভূমিকা পালন করে তাদের রচিত তথাকথিত আইন অমান্যকারীদেরকে ইচ্ছা মত শাস্তি দেওয়া। সকল ইচ্ছা এখনও সম্পূর্ণ পূরণ না হলেও সাংস্কৃতিক অঙ্গন আজ তাদের পুরো কন্ট্রোলে চলে এসেছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি Globalization বা বিশ্বায়নের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব আজ ছোট বড় সবার হাতের মুঠোয়। আমরা বিভিন্ন সময়ে বলে থাকি, সিনেমা হলে এখন আর ভাল মানুষ যায় না। ভাল মানুষ বলতে চাকরীজীবী, ব্যবসায়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষিক পরিবার-পরিজন নিয়ে সিনেমা হলে যান না। এর কারণ হিসেবে আমরা যা বলি তা হলো ভাল সিনেমা আজকাল আর তৈরি হচ্ছে না। তাই সিনেমা হলে গিয়ে কেউ এখন আর সিনেমা দেখে না। তবে কেউ কিন্তু FDC-এর লোকজনকে ভাল সিনেমা তৈরির দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন না বা দেওয়ার পরও তারা শুনছেন না, বিষয়টি কিন্তু তা নয়। আমি যেহেতু এই জগতের লোক নই, তাই ভাল সিনেমার Definition কী আমার না জানারই কথা। তবে গ্রামগঞ্জের হাটবাজার হতে শুরু করে রাজধানীর ভিআইপি এলাকা পর্যন্ত যে চিত্র ও পত্রপত্রিকার যে ভূমিকা তা দেখে আমি যা বুঝি তা হলো, আসলে FDC'র কর্তা ব্যক্তিদের কোন দোষ নেই। তাদের তৈরি সিনেমা ভাল কি মন্দ তা আমি বল না, বরং আমাদের রুচির জিনিস যেহেতু সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে তাই সিনেমা হলে উক্ত শ্রেণীর ভিড় লাগছে না। তাই বলে যারা সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখছে তাদের ও উক্ত শ্রেণীর মধ্যে এই দিক দিয়ে কোন ব্যবধান নেই বললে ভুল হবে না।

আমরা সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখি না। কিন্তু সিনেমার পোষ্টার অবশ্যই আমাদের বাসা-বাড়ীর স্কুল-কলেজের সামনে লাগানো হচ্ছে। যে সিনেমা যতো বেশী উলঙ্গপনা ও যৌন সুড়সুড়ি নিয়ে তৈরী তার সিডি ততো তাড়াতাড়ি মার্কেটে

পাওয়া যাচ্ছে। অতএব, এমন সব সিনেমা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজ কক্ষে একবার নয়, দশবার দেখতেও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। গানও আমরা শুনি না। শোনার আগ্রহও নই। তারপর আমাদের কানে অহরহ গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। দুপুরের একটু বিশ্রাম রাতে একটু ঘুম বা নিরিবিলি একটু পড়াশোনা ও গবেষণাও অনেক সময় গানের অসহ্য আওয়াজের কারণে হয়ে ওঠে না। আপনি বিশ্বের যেদিকে তাকাবেন সেদিকেই পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। সব পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলে চালানো হলেও বিবেকবান লোকেরা কিন্তু সব পরিবর্তনকে উন্নয়ন খাতে স্থান দিতে পারবে না । বিবেকবানরা গ্রহণ না করলেও কিন্তু সমাজের ছোট-বড় নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই এই সব উন্নয়নকেই কিন্তু জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া মনে করে কোনো প্রকারের বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই গ্রহণ করে নিচ্ছে। আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জেরও একই পরিবেশ। সব কিছুতে যৌন সুড়সুড়িমূলক আবেদন-নিবেদন। কেউ কোনো বাধা মানছে না। এসব উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা আজ সমাজের ছোট-বড় সবার মনকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সকল প্রকারের বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদকরা তাদের পণ্য বিক্রির জন্য পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়াও তাদের পোস্টারে ছেয়ে গেছে দূর-দুরান্তের গ্রাম-গঞ্জের হাট-বাজার। চমৎকার বক্তব্য, আকর্ষণীয় নারীর অঙ্গভঙ্গি ও বিরাট মূল্যহ্রাস। এসবের কারণে আপনি এসব পোস্টার পড়তে বাধ্য হবেন। শুধু তাই নয়, আপনি এসব পণ্য নিয়ে এসে স্ত্রী ও ছেলেমেদের হাতে তুলে দেবেন। রেডিও-টিভিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতির নামে বেহায়াপনা ও নারীর বিশেষ সময়ে ব্যবহৃত একটি পণ্যের সরাসরি বিজ্ঞাপন প্রচার করে পরিবারের মা-বাবা, ভাই বোনের মাঝের লজ্জা-শরমও তুলে দিয়েছে।

পাশ্চাত্যের কালচারে শুধু দেশ ছেয়ে যাচ্ছে তা নয়, আমাদের মগজ ও অনুভূতিকেও ধুয়ে-মুছে নিয়ে যাচ্ছে। সব কিছুতে এসব নতুনত্ব ও উন্মুক্ততার কারণে ঘর হতে বের হলেই এসব পোস্টার ও গান শুনতে আমরা আজ বাধ্য। তাছাড়া পোস্টারে এখন শুধু নারীর ছবি ও গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ইশারা-ইঙ্গিতের কোনো আবেদন-নিবেদন এখন পুরাতন ও সেকেলে মনে করা হচ্ছে। এগুলো প্রাচীন যুগের বলে প্রত্যাখ্যান করে আধুনিক যুগের নামে আরো অন্য কিছু প্রতিনিয়ত চাওয়া হচ্ছে। নারীকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া এবং শুধু প্যান্টি ও ব্রা পরা তার নগ্ন বুকের ওপরে পুরুষের শুয়ে থাকার প্রকাশ্য পোস্টার লাগানোকে এখন আর কেউ mind করে না।

তাই এখন পণ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের আগে নারীর রূপ ও চুলের বাহার, শারীরিক গঠনসহ নগ্ন ও অর্ধনগ্ন আকর্ষণীয় অঙ্গের মান বিবেচনা করার পর পণ্য নিয়ে ভাবা হচ্ছে। নারীর শরীরের কোমলতা প্রকাশ করে যুব সমাজকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে "তোম কাঁহা হো? দুনিয়া বহুত আগে হ্যায়" অর্থাৎ তোমরা কোথায় পড়ে রয়েছ, দুনিয়া অনেক এগিয়ে গেছে। এসব চাকিচিক্যের কারণে যুব সমাজের দৃষ্টি আজ নারী ও তার অঙ্গভঙ্গির ওপর স্থির হয়ে আছে। অন্যদিকে এই মাঠে টিকে থাকার জন্য নারীর দৃষ্টি শুধু ফ্যাশন ও কমসেটিকসের ওপর পড়ে আছে। কারণ এখানেও প্রতিযোগিতা হচ্ছে কে কার চেয়ে বেশী নগ্ন হতে পারে? কে কার চেয়ে বেশী যুব সমাজকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে? কার চাহিদা যুব সমাজের কাছে কতো বেশী? এটা প্রমাণ করার জন্য নারীও আজ পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

পশ্চিমা জগতের রুচিও খুব চমৎকার! নারীদের ব্যস্ততাও খুব চিত্তাকর্ষক। তাদের পছন্দ-অপছন্দের সীমানাও অনেক প্রশস্ত। নারীদের শরীরে রয়েছে কোমলতা এবং পোশাক-আশাকে রয়েছে আকর্ষণ শক্তি। তাই তাদের ব্যবহারকৃত জিনিসের প্রতি পুরুষের জন্মলগ্ন হতে রয়েছে আগ্রহ ও দুর্বলতা। নারীর সেলোয়ার-কামিজ, শাড়ী-ব্লাউজ, ব্রা-প্যান্টি, ওড়না-স্কাইসহ জুতা-সেন্ডেলের প্রতিও পুরুষদের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এজন্যই শরীয়াতে ইসলামিয়াতে নারীর পোশাককেও পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে বলা হয়েছে। যেহেতু নারীর পোশাকের রং ও প্রিন্ট হয় সুন্দর, সেলাই করা হয় মনোযোগ সহকারে তাই বর্তমান শতাব্দীর পুরুষদের দৃষ্টি শুধু নারী ও নারীর পোশাকের ওপর। এই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে প্রচুর সময় ও অজস্র ডলার অত্যন্ত উদারতার সাথে ব্যয় করা হচ্ছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, জার্মান একটি কোম্পানীর জাপানী পার্টনার একটি ব্রা স্বর্ণের সূতা দিয়ে তৈরি করেছে। যার মধ্যে ১৫ ক্যারেট হিরা লাগানো হয়েছে এবং উক্ত ব্রার নাম দেয়া হয়েছে Millennium Bra। ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে টোকিওতে এর প্রদর্শনী হয়েছে। জাপানের একটি তরুণী শুধুমাত্র একটি প্যান্টি পরে এবং ব্রাটি তার স্তনে লাগিয়ে উক্ত প্রদর্শনীতে দাঁড়িয়েছিল। প্রস্তুতকারকদের দেয়া তথ্য মতে এটি তৈরি করতে সময় লেগেছে ১৮ মাস। খরচ হয়েছে এতে ১৯ লাখ ডলার, অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় ১৩ কোটি টাকা। এমন একটি কাপড় যা নারীর কাপড়ের ভেতরে লুকায়িত থাকে এবং নারী-পুরুষ সবার দৃষ্টির আড়ালে থাকবে সর্বদা, এমন কি তার স্বামী পর্যন্ত যখন-তখন তা দেখতে

পারবে না, তার জন্য তাদের আজ এতো আয়োজন? আমাদের দেশের রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের স্বামীরা ছাড়া তাদের মায়েরাও মেয়েদের ব্রা দেখে না। পরিবারের সদস্যদের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য এটিকে গোসলের পর অন্য কাপড়ের ভেতরে শুকাতে দেয়। তবে এখন আমাদের দেশের মুসলিম মেয়েরাও বাবার বয়সের বৃদ্ধ, বড় ভাইয়ের বয়সের যুবক ও ছোট ভাইয়ের বয়সের তরুণের কাছে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে নিজেদের স্তনের সাইজ বলে তাদের হাতে হাত রেখে ব্রা ও প্যান্টি কিনে আধুনিকতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। আফসোস! শত আফসোস!! এখানেই পশ্চিমাদের দেখানো বিশ্বায়নের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত এবং নারী জীবনে বাস্তবায়িত।

মূলত পশ্চিমাদের পঁচা মগজে আজ শুধু নারী আর নারীর শরীর ঘুরপাক খাচ্ছে, তাই তাদের রুচিও আজ নারী ও নারীর শরীর এবং তাদের পেশাক-আশাক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রয়েছে। পশ্চিমাদের এই পচা রুচির দুর্গন্ধে আমাদের সমাজ আজ আক্রান্ত ও রোগাক্রান্ত। উক্ত প্রদর্শনীর মত প্যারিসেও International Exhibition for Women Brassiers নামে একটি প্রদর্শনী হয়েছে, যেখানে হাজার প্রকারের ব্রা রাখা হয়েছিল। এমন একটি প্রদর্শনীতে দলে দলে যুবকরা যেমন উপস্থিত হয়েছিল তেমনি বৃদ্ধদের মধ্যেও কৌতূহল আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রচুর। এখানেই শেষ নয়। মুসলিম রাষ্ট্র মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরেও সম্প্রতি মেয়েদের জুতার একটি প্রদর্শনী হয়েছে। সেখানে নারীর একটি জুতার মধ্যে ১৮ ক্যারেট স্বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে যার ওজন ২.২৫ কিলোগ্রাম। উক্ত জুতার মূল্য ২৬,৩০০ ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশী ১১লাখ ৫ হাজার টাকা, অথচ জুতা স্বাস্থ্য ভাল রাখার কোন ওষুধ কিংবা মোটা তাজা করার কোন টনিকও নয়। এতে যেমন নারীর সৌন্দর্য্য বাড়ে না অথবা চামড়া সুন্দর করে যৌবনের আকর্ষণ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার কোন যাদুও এর মধ্যে নেই। এটি প্রত্যহ সব জায়গায় ব্যবহার করারও জিনিস নয়, বরং কাদা আবর্জনা হতে নিজের পা রক্ষা করার এবং সব সময় পায়ের নীচে থাকার একটি জিনিস, তার যত মূল্যই হোক কেন, এটি মাথায় রাখার জিনিস নয়। কিন্তু কি করা যাবে? পশ্চিমা জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এটিই নমুনা। তাদের কাঁধে নারী সওয়ার হওয়ার পর তারা নারী ছাড়া এখন আর কিছুই ভাবতে পারে না। তাই আজ তারা মানুষের সীমা ছাড়িয়ে পশুত্বের সীমানায় গিয়ে পৌঁছেছে। হয়ত কোন একদিন নারীর জুতায় কে কত বেশী চুমু খেতে পারে তার প্রতিযোগিতাও হবে। অতি সাধারণ ও তুচ্ছ এসব কারণে বর্তমানে ইউরোপে পারিবারিক জীবন বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানকার

৮০% সন্তান জানে না তার আসল পিতা কে? যুবকেরা ভোমরার মত এক রমনী হতে আরেক রমনীর মধু আহরণে ব্যস্ত। নারী ভোগ ছাড়া তাদের কল্পনায় অন্য কোন কিছুর স্থান নেই। সকালে একজন Girl Friend থাকলে বিকালে অন্যজন। Boy Friend-এর সংখ্যাকে ইউরোপে আজ সৌভাগ্যবান মাপার Thermometer বলা হচ্ছে। যার যত বেশী Boy Friend রয়েছে সে তত বেশী সৌভাগ্যবান তরুনী। Beauty Contest & Modern Culture-এর নামে নিত্য নতুন উলঙ্গপনার বাজার আজ সেখানে সরগরম। এটি তাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য। আমেরিকার ৫৩% ছাড় রেকর্ডার রাখে। সেখানে তারা মাতাপিতার সকল প্রকারের আদেশ-নিষেধ হতে মুক্ত এবং সামাজিক ভয়ভীতি হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যৌন উত্তেজক চ্যানেলসহ যাবতীয় ব্লু ফ্লিম দেখছে। এভাবে তারা যৌবনে পা রেখেই নিজ ঘরে উন্মুক্ত পরিবেশে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং নারী ভোগের সকল পন্থা জেনে নিয়ে যৌন স্বার্থ চরিতার্থ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে, যার কারণে যৌবনের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। হাজারো বাধা-বিপত্তির পরও অবৈধ গর্ভ ধারণ করে সন্তানের জন্ম দিয়ে সমাজে পঁচা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এসব কারণে তাদের পারিবারিক জীবনে আজ এক মহাবিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডের ১১ লাখ ৪৭ হাজার দম্পত্তি তালাক নিয়েছে। সেখানে এখন প্রতি মাসে ১২ হাজার তালাক হচ্ছে। এই দিক দিয়ে ইংল্যান্ড এখন ইউরোপের তালাকের রাজধানী।

বিশ্বায়ন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এখন আমাদের গোটা দেশসহ উপমহাদেশেও পড়তে শুরু করেছে যা সিনেমার পোস্টার, পণ্যের বিজ্ঞাপন ও গানের কলিতে পরিষ্কার ফুটে উঠছে। পুরুষদের রুচি নারীর সৌন্দর্য যৌন সুড়সুড়িমূলক আবেদন নিবে নে সীমাবদ্ধ, যার উদাহরণ আমাদের দেশের বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্য মেলা যেখানে অসংখ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্টল বসায়। কোম্পানীগুলো তাদের পণ্যের প্রচার ও বিক্রির জন্য মডেল কন্যাদের নগ্ন-অর্ধ নগ্ন করে তাদের পণ্যের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। কোম্পানিগুলো কলেজ-ভার্সিটির মেয়েদের ছাড়াও পেশাদার মডেল কন্যাদেরকে Modern Girl অথবা Girl Guide বানিয়ে পণ্যের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখে। এসব মডেল কন্যারা তাদের শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে এবং মিষ্টি ভাষা ও আবেদনমূলক চাহনির মাধ্যমে গ্রাহকদের মন জয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ সম্পর্কে The Times of India 23 Nov. 99 সংখ্যায় একটি সংবাদ

পরিবেশন করেছে। উক্ত সংবাদে লিখেছে, নগ্ন, অর্ধ নগ্ন মডেল কন্যাদের ব্যবহারকারী কোম্পনীগুলোর বিক্রি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী হয়। বিজ্ঞাপন এজেন্সীদের ধারণা নতুন দিল্লীর বিভিন্ন প্রকারের মেলা ও সম্মেলনের চাহিদা পূরণের জন্য ৫০ হাজার মডেল কন্যার প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের স্টলে যে সব মডেল কন্যারা শাড়ী ও ব্লাউজ পরে মডেল হবে, তাদের ফি দৈনিক ৪০০ রুপি। হাঁটু পর্যন্ত যারা শরীর নগ্ন রাখবে তাদের ফী ২ হাজর ৫০০ রুপি হতে ৩ হাজার রুপি। আর যারা শুধু মিনি স্কার্ট পরে পণ্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে তাদেরকে দৈনিক ৪ হাজার ৫০০ রুপি ফি দিতে হবে। আর যারা শুধু প্যান্টি ও ব্রা লাগিয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তাদেরকে দৈনিক ২০ হাজার রুপি পর্যন্ত দেওয়া হয়। যে সব সংস্থা বাণিজ্য মেলাসহ সকল মেলায় মডেল কন্যা সরবরাহ করে তাদের মাধ্যমে এই তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে।

এটি একটি বাস্তব সত্য, সামাজিক নিয়মনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির প্রচলন ও আদান- প্রদানে তরুন-তরুনীদের প্রচুর ভূমিকা রয়েছে। কারণ নারী তার প্রকৃতগত দুর্বলতা, শারীরিক গঠন ও মানসিক অনুরাগ ও ঝোঁকের কারণে খুব সহজে পুরুষদেরকে প্রতারণার জালে আটকে ফেলতে পারে। মানবতার দুশমন, চারিত্রিক মূল্যবোধের বিশ্ব শত্রু আজ সমাজ ও পরিবেশকে দূষিত করার জন্য নারীকে Front Line এ এনে দাঁড় করিয়েছে। নারী মুক্তির কথা বলে তাদেরকে নিজেদের ভোগের বস্তুতে পরিণত করেছে। যার কারণে যুব মানস তরুণ সমাজ খুব সহজেই প্রভাবিত হয়ে সোসাইটিতে এসব অপসংস্কৃতি ও চরিত্রবিধ্বংসী অপতৎপরতাকে উন্নতি ও অগ্রগতির নামে চালু করার চেষ্টা করছে। আর অন্যদিকে Sex Education-এর মাধ্যমে কোমলমতি শিশু Beauty Contest -এর মাধ্যমে তরুণী ও Fashion Show-এর নামে নারীদেরকে আজ অবাধে মেলামেশার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এত সব বেহায়াপনা শিক্ষা দেওয়ার পর আবার নারী ধর্ষণ নিয়ে মাতামাতি ও মাতম করার কোন অধিকার তাদের আছে বলে আমরা মনে করি না। এরপরও বিশ্বায়ন ও আধুনিক সভ্যতাকে কোন প্রকারের বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া গ্রহণ করার কোন যুক্তি আছে কি? [*এই প্রবন্ধটি অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত*]

## আন্তর্জাতিক পোশাক

প্রতিটি জাতির নির্ধারিত লেবাস-পোশাক তার সভ্যতা-সংস্কৃতির দর্পণ। পোশাক দ্বারাই জাতির ইতিহাস উন্মোচিত হয় এবং তার আচার-আচরণ সম্পর্কে

জানা যায়। এটিই কৃষ্টির প্রাণ ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ। কৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্যের যে স্থান অর্জিত হয়ে থাকে সে স্থান পোশাকেরও অর্জিত হয়। এ কারণেই ভাষার মধ্যে যে বৈচিত্র্য পাওয়া যায় কম-বেশী পোশাকের মধ্যেও তা পাওয়া যায়। সংস্কৃতি ইনসাইক্লোপিডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লেবাস-পোশাক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন জাতির নির্ধারিত পোশাককেও চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ পোশাকই মূলত কোন জাতির সবচেয়ে বড় পরিচয়।

বিশ্বায়নের ধ্বজাধারীরা যেমনিভাবে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং পুরো বিশ্বে মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার করেছে, তেমনিভাবে মার্কিন লেবাস-পোশাককেও বিশ্বব্যাপী ব্যাপক করেছে। বিভিন্ন জাতির জাতীয় পোশাক সম্পূর্ণ নির্মূল করা হলিউড চলচ্চিত্রের প্রভাব- প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন পোশাক পরিধান করা উন্নতির প্রতীকে পরিণত হয়েছে এবং উন্নত মানসম্মত জীবনের নির্দশন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর জাতীয় পোশাক পরাকে পশ্চাদ্‌পদতা ও নিম্ন রুচির প্রমাণ মনে করা হচ্ছে।

ইউরোপও প্রাচীন যুগে শক্তিশালী সংস্কৃতির মালিক ছিল। সে কারণে ইউরোপীয় জাতিরও নির্ধারিত ও বিশেষ পোশাক হতো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতে যখন মার্কিন বাণিজ্যিক কোম্পানী ইউরোপে কদম রাখল, তখন থেকে ধীরে ধীরে জাতীয় পোশাকের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে লাগল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জনপ্রিয়তার হার আরো বেশী হ্রাস পেলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন আন্তর্জাতিক মুক্ত বাণিজ্যের নিয়মতান্ত্রিকতা শুরু হলো এবং শিল্প ক্ষেত্রে মার্কিন ইজারাদারি প্রতিষ্ঠা হলো, তখন ইউরোপীয় জাতির জাতীয় সম্পদ সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেলো। মার্কিন পোশাক জিন্স ও টি-শার্টই লোকজন পরিধান করা শুরু করল এবং মার্কিন পোশাককেই তারা পাশ্চাত্য পোশাক বলতে লাগল। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সর্বস্তরে এই পোশাক ব্যাপক হয়ে গেল, এমন কি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও এই পোশাকে স্কুলে যেত। আমেরিকা এই পোশাক টি. ভি ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গোটা জাতি ও প্রজন্মের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। নওজোয়ানদের কামনা থাকে যে কিভাবে ক্যালিফোর্নিয়া'র শার্ট ও টেক্সাসের হ্যাট তাদের অর্জিত হবে, চায় তাতে টেক্সাসের রাখালদের মতো মনে হোক না কেন এবং তার শরীরেও বেজবল ও বাসকেট বল-

এর নিদর্শন সম্বলিত পোশাক হতে হবে যা সেখানকার খেলোয়াড়রা পরিধান করে। তার নিকটও এমন টি-শার্ট হতে হবে যার ওপর কোন মার্কিন ইউনিভার্সিটি কিংবা ফ্লোরিডায় অবস্থিত বারমোডার ছবি থাকবে। তার পায়ে চলচ্চিত্রের নায়কদের মত দামী কালো জুতা হতে হবে, যা দ্বারা লোক যেন তাকে আমেরিকান মনে করে এবং উন্নত সুরুচিবোধ সম্পন্ন অভিজাত ও স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণার অধিকারী মনে করে। এই পরিস্থিতি বর্তমান যুগে প্রায় গোটা বিশ্বে দেখা যাচ্ছে। মেয়েরা তাদের জাতীয় পোশাক ছেড়ে দিয়ে মার্কিন উলঙ্গপনার পোশাক পরছে এবং জাতীয় পোশাক যাকে সংস্কৃতির পরিচয় ও নির্দশন বলা হয় প্রায় বিদায়ের পথে। টিভি চ্যানেলগুলো ও মার্কিন চলচ্চিত্র এই আন্তর্জাতিক পোশাক বিস্তার করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে।[১৬৩]

## খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে অন্ধ অনুসরণ

আমেরিকা শুধু তার লেবাস-পোশাকই পুরো বিশ্বে প্রসার করেনি, বরং তার সাথে সাথে মার্কিন খাদ্য-পানীয়কেও গোটা পৃথিবীতে ব্যাপক করেছে। দুনিয়ার প্রাচীন জাতিসমূহ যাদেরকে পোশাক, ভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে শক্তিশালী মনে করা হতো খাদ্য পানীয়ের ক্ষেত্রেও তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। ইতালীতে পানাহারের হাজার প্রকারের দ্রব্য পাওয়া যেত। ফরাসী গ্রামাঞ্চলে ঐতিহ্যময় খাবারের অসংখ্য প্রকার পাওয়া যেত। রকমারী স্পেনীয় খাবার অত্যন্ত পান্ডিত্যের সাথে তৈরি করা হতো। গ্রীক, ব্রাজিল, চীন, ভারত এবং ইসলামী বিশ্বেও নানা রকমের খাবারের অপ্রতুলতা ছিল না। কিন্তু সাংস্কৃতিক সয়লাবের ফলে কিছু অসুস্বাদু খাবারও ফ্যাশন ও উন্নতির নিদর্শন হয়ে যায়, যেগুলোকে ফাষ্টফুড নাম দেওয়া হয়েছে। হট ডগ, (Hot Dog) হ্যামবার্গার HAMBURGER পিজা Pizza লোকদের প্রিয় খাবারে পরিণত হয়েছে। মার্কিন কালচারের প্রতিনিধিত্বকারী ম্যাকডোনাল্ড, বার্গার কিং ও পিজাহাট (Pizza Hut) নামক রেস্টুরেন্ট প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি শহরে খুলে গেছে। এ সমস্ত রেস্টুরেন্টে লোকদের উপচে-পড়া ভীড় থাকে।[১৬৪] খাদ্য ও পানীয় সংস্কৃতিকে পুরো বিশ্বে বিস্তার ঘটানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সচেতনতা কতটুকু তার অনুমান খুব সহজেই করা যেতে পারে। উকবরোক্স শহরে হ্যামবার্গার নামক একটি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস রুমের

---

১৬৩। প্রাগুক্ত পৃ. ১২৫।

১৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

সাথে সাথে বড় বড় লেকচার হলও রয়েছে। ২৬টি ভাষার অনুবাদক এবং ২৫ জন প্রফেসর এই ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা দীক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। এখান থেকে এ পর্যন্ত ৬৫ হাজার ব্যক্তিকে হ্যামবার্গার তৈরিতে বি.এ. ডিগ্রি অর্পণ করা হয়েছে। এই ইউনিভার্সিটি থেকে প্রতি বছর ৭ হাজার ব্যক্তি তৈরি হয়। ইউরোপে তার ১৫টি শাখা ও ১০০ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। গোটা বিশ্বে হ্যামবার্গার বিক্রয়কারী প্রতি রেস্টুরেন্টের এই ইউনিভার্সিটি কিংবা তার কোন শাখার সাথে সম্পর্ক রয়েছে। ম্যাকডোনাল্ড নামক রেস্টুরেন্টে ভাল চাকুরীর জন্য সে সমস্ত কেন্দ্র হতে ট্রেনিং করা জরুরী। হ্যামবার্গার ইউনিভার্সিটিতে অধিকাংশ পাঠ প্রাত্যহিক কর্মকান্ড সম্পর্কে হয়ে থাকে। এই ইউনিভার্সিটির বেশীর ভাগ দৃষ্টি শিক্ষার পরিবর্তে প্রশিক্ষণের প্রতি হয়ে থাকে। ম্যাগডোনাল্ডে কর্মরত ব্যক্তিরা কিভাবে সাধারণ জনগণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং কিভাবে লোকদের সাথে আচরণ করবে সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।[১৬৫]

এই বিস্ময়কর তথ্য দ্বারা অনুমান করা যায়, ম্যাকডোনাল্ড যা শুধু একটি রেস্টুরেন্ট এর প্রতি সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতির পতাকা বাহকরা কী পরিমাণ দৃষ্টি ও মনোযোগ দিয়েছে। এই তথ্য এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, এসব রেস্টুরেন্ট যা গোটা বিশ্বে মার্কিন সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করছে তা মার্কিন জাতির নিকট কী পরিমাণ গুরুত্বের অধিকারী। মার্কিন সংস্কৃতির দ্বিতীয় প্রতিনিধি প্রসিদ্ধ পানীয় কোকাকোলা যা আজ প্রতিটি দেশের ছোট ছোট শহরেও পাওয়া যাচ্ছে। এই পানীয় ১৮৮৬ সনে জন বোম্বারটন মার্কিন শহর আটলান্টাতে আবিস্কার করেছিলেন। ১৯৯২ সনে 'আসাকিন্টার' নামক একটি কোম্পানী এই ফর্মুলা ক্রয় করে নিয়ে কোকাকোলা নামক কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৮৯ সনে পেপসিও আবিস্কৃত হয়। এই দুটি পানীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা হতে বেরিয়ে দেশ-বিদেশে ছাড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৪ সনে ফ্রান্স পেপসি ও কোকাকোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পেপসি ও কোকাকোলা পুরো বিশ্বে হাজার হাজার লাখ-লাখ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। সেসব কোম্পানী থেকে এই পানীয় প্রস্তুত হয়ে দেশের আনাচে-কানাচে বিক্রি হচ্ছে। মার্কিন সভ্যতা ও কৃষ্টির এই নিদর্শনকে লোকজন একটি সাধারণ পানীয় মনে করে পান করছে।[১৬৬]

---

১৬৫। মাসিক আল বয়ান, সংখ্যা,১৭০।

১৬৬। আমিরিকা, আল-মুস্তাবাদ্দাহ্ পৃ. ১২৭

## সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়ন দুইটি ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১। ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি তথা তথ্য ও প্রযুক্তির বিকাশ, যার মধ্যে মিডিয়া, প্রচার মাধ্যম ও চলচ্চিত্র ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

২। বিভিন্ন জাতি ও সমাজের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান ও অভিন্নতার ক্রমবর্ধনাম হার অর্থাৎ গোটা বিশ্বে একই ধরনের তাহযীব ও একই প্রকারের কৃষ্টি চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী লোকদেরকে স্যাটেলাইট, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে জুড়ে দেওয়া হবে যাতে একটি বিশেষ গোষ্ঠী যখনই ইচ্ছা তার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে এ যন্ত্রের মাধ্যমে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে। ফলে প্রতিটি জাতির ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ পৃথক পৃথক না হয়ে এক ও অভিন্ন হয়ে যাবে। পুরো বিশ্বের চিন্তা করার পদ্ধতি এক হবে। লোকদের গবেষণা ও চিন্তা-চেতনার ধরণ এক হবে, তাদের ইচ্ছা, কামনা বাসনা, চাহিদা, আচার-আচরণ, কথাবার্তার আদব ও ওঠা-বাসা মোট কথা প্রতিটি বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।[১৬৭]

বর্তমান যুগের একটি পরীক্ষিত ও ধ্রুত সত্য এই যে, মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যম-চায় তা যে কোনরূপে হোক সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য ও ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই শ্রেণী টিভি ইন্টারনেট ইত্যাদির সহায়তায় একটি বিশেষ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছড়ানোর কাজে নিয়োজিত। গোটা বিশ্ব বিশেষ করে সে সকল জাতি যারা স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করে তারা আজ পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণ করছে। প্যারিস ও বার্লিনের গলি দিয়ে বের হওয়া ফ্যাশন পরদিন প্রভাতের পূর্বেই প্রাচ্যের সীমারেখা ডিঙ্গিয়ে চলে আসে। আর প্রাচ্যের জনগণ তা চোখ বুজে অভিনন্দন জানায়। ইউরোপ-আমেরিকার শিশুরা চৌরাস্তা ও সড়কের পাশে অবস্থিত যে সমস্ত রেস্টুরেন্টে খাওয়ার জন্য জেদ ধরে আজ সে সমস্ত খাবারের জন্যই প্রাচ্যের অনুন্নত দেশগুলোর অলি-গলির শিশুরা জেদ ধরতে দেখা যাচ্ছে। যেই 'বারবী ডল' (এক প্রকার পুতুল)-এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যে নগ্নতা ও উলঙ্গপনার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে সেই বারবী ডলই প্রাচ্যের তরুণীদের মাঝে নগ্নতা ও উলঙ্গপনার মনোভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এমন কি এই নিস্প্রাণ ও নড়া-চড়ার

---

১৬৭। দৈনিক আল-আহরাম (আরবী), প্রবন্ধ-আস-সাকাফাতুল আরাবিয়া ফি আছরিল আওলামাহ, ড. আব্দুল ফাত্তাহ আহমদ আলফাবী প্রণীত।

শক্তিবিহীন ছোট ছোট খেলনা অতীতের চেতনা ও অনুভূতিসম্পন্ন এবং বর্তমানের চেতনাবিহীন মুসলমানদের মত জাতির এক শ্রেণীকে ভাবতে বাধ্য করছে, অথচ ইরানের মত দেশে এ সকল পুতুল মার্কেটে চলে এসেছে যে ইরান, ইসলামী লেবাসের প্রদর্শন করছে। কিন্তু তথ্য ও প্রযুক্তির পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মুসলিম শিশুদের মাঝে বারবী ডল-এর জনপ্রিয়তার মাঝে কোন হ্রাস পায়নি। বিশ্বায়নেরই ফলাফল এই যে, আজ আরবরা তাদের জাতীয়, দ্বীনী ও ধর্মীয় পোশাক ভুলে গেছে, অথচ তাদের পোশাককে আজও তাদের জাতীয় প্রতীক মনে করা হয়। এমন কি মার্কিন চলচ্চিত্র কেন্দ্র হলিউড ও তার পদাঙ্ক অনুসারী ভারতের ফিল্ম স্টুডিও বলিউড এ ধরনের পোশাককে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করছে। কিন্তু আরবরা তাদের এই প্রভাব সৃষ্টিকারী লেবাস ছেড়ে পশ্চিমাদের লেবাস-পোশাক গ্রহণ করা শুরু করে দিয়েছে।

এমন কি জর্দান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর, লিবিয়া ইত্যাদি আরব দেশ তো পশ্চিমা তথা মার্কিন পোশাককেই জাতীয় পোশাক বলে ঘোষণা দিয়েছে। অবশ্য অতীতের ঐতিহ্যকে ঠিক রাখার জন্য কোথাও কোথাও কিছু কিছু বৃদ্ধকে আরবী পোশাক পরিধান করতে দেখা যায়। মোট কথা, এমন অসংখ্য বিষয় রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আজ মুসলিম জাতি পাশ্চাত্য পূজার শিকার। যদি উল্লিখিত বিষয়গুলোকে সভ্যতা-সংস্কৃতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে এ কথায় কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই যে, মুসলিম জাতি, বিশেষ করে আরব জাতি হতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র বিদায় হতে যাচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্বায়নের আড়ালে পশ্চিমা কালচারের সামনে প্রতি ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করছে। সামান্য গভীরে গিয়ে যদি সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহলে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সামনে আসে।

## বেচা-কেনা ও পাশ্চাত্য পূজা

বিশ্বায়নের ধ্বজাধারীদের বড় অভিলাষ ছিল, পুরো বিশ্বে বেচাকেনা ও এ ধরনের সকল কার্যাদি পাশ্চাত্য স্টাইলে সম্পাাদিত হোক! খরিদদার স্বীয় পকেটে নোটের পরিবর্তে কিছু 'কার্ড' রাখুক যার ওপর তার নাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে। কার্ডকে বিশেষ মেশিনে প্রবেশ করিয়ে দোকানদার প্রত্যাশিত মূল্যে স্বীয় ব্যাংক একাউন্টে জমা করে দেবে। বিশ্বায়নের ঠিকাদারদের এই অভিলাষ অনুযায়ী আজ পুরো বিশ্বে এই ব্যবসা পদ্ধতির প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানুষ নোটের পরিবর্তে চেক বা কার্ড-এর মাধ্যমে লেনদেন করাকে প্রধান্য দিচ্ছে। পশ্চারেত্যের অন্ধ অনুকরণকারী প্রাচ্যের দেশগুলোতে তো এই পদ্ধতিকে উন্নতির নিদর্শন ও উচ্চ শ্রেণীতে প্রতীক মনে করা হচ্ছে। পশ্চিমা জিঞ্জির গলায় পরিধান করতে যারা গর্ববোধ করে ফুলে ফেঁপে উঠে তাঁদের এবং কাগজের কিছু নোটের বোঝা তলে যারা পিষ্ট হচ্ছে সে সমস্ত লোকের ভাল করে জানা আছে যে, প্রত্যাশিত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করার সাথে সাথে গোটা বিশ্বের সম্পদের ওপর দখলদার দুইটি বড় ক্রেডিট কার্ড কোম্পানী (VISA) ভিসা এবং MASTER CARD (মাষ্টার কার্ড) এর জারীকৃত কার্ড ব্যবহার করার ভিত্তিতে তারা গর্ব ও অহংকার করছে। কারণ এই "ক্রেডিট কার্ডে"র মাধ্যমে গোটা বিশ্বে যেখানেই কোন ধরনের লেনদেন হবে তার মুনাফা ও উক্ত দুই বড় কোম্পানীর অবশ্যই হবে। সুতরাং বিশ্বায়ন এই ব্যবস্থা পদ্ধতিকে অনুসরণীয় ঘোষণা দিয়ে এই কোম্পানীর রাস্তা সহজ করে দিয়েছে এবং প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবসা পদ্ধতির যাদুতে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

## অশ্লীল সাহিত্য ও উগ্র সংস্কৃতির বিকাশ

নব প্রজন্মের উপর সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের একটি ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া অশ্লীলতা, নগ্নতা ও উগ্রতার বিকাশ। এই আন্তর্জাতিক চেতনার অধীনে বিকশিত নতুন প্রজন্মগুলো উগ্রতা জীবনের একটি পদ্ধতি ও একটি প্রাকৃতিক সিস্টেম হিসেবে গ্রহণ করছে। মার-ধর ও লড়াই-যুদ্ধ করা নওজোয়ানদের একটি প্রিয় ব্যস্ত তায় পরিণত হয়েছে। ছবিতে নায়ক ও গুন্ডাদের মত পার্ট নেওয়া, ক্যারাতে-কুংফু ইত্যাদি তাদের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তরুণদের মাঝে এ ধরনের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের ফলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের অন্যায়-অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। প্রতিটি হত্যা ও লুন্ঠন একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।[১৬৮] দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতকারীগোষ্ঠী হলিউড ও বলিউড-এর তৈরিকৃত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও অপরাধের নতুন নতুন পদ্ধতি শিখছে এবং বাস্তব জীবনে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। তরুণরা তাদের মূল্যবান সময় নিচু ও জঘন্য কাজে বিনষ্ট করে স্বীয়-ধর্ম, আখলাক-চরিত্র, অভ্যাস ইত্যাদিকে বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

---

১৬৮। আস-সাকাফাতুল আরাবিয়া ফী মুয়াজাহাতিল মুতাগয়্যিরাতিদ-দাওলাতির- রাহেনাহ্, মাসউদ যাহের মাসিল আল-ফিকরুল আরবী আল মুআসির। সংখ্যা- ১০১, ১৯৯৩।

টিভি ও সিনেমায় প্রদর্শিত ছবি এই শ্রেণীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে, যার ফলে উগ্রতার সাথে সাথে পশ্চিমের অশ্লীল কালচার মানব জীবনে তার বড়ত্ব, মাহাত্ম্য এবং ভদ্রতা ও আভিজাত্যকে পদদলিত করছে। এই পশ্চিমা চলচ্চিত্র ও নগ্ন নভেল-নাটক-ফিল্ম বিপজ্জনক সীমা পর্যন্ত শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের ওপর প্রভাব ফেলছে, বিশেষ করে ইসলামী বিশ্ব পশ্চিমের বিছানো জালে কঠিনভাবে ফেঁসে গেছে।[১৬৯] কায়রোতে অবস্থিত নারী ও শিশু বিষয়ক একটি গবেষণা কেন্দ্র সম্প্রতি ১৪৭২ জন নারীর মাঝে একটি জরীপ করেছে যার বিস্ময়কর ফলাফল সামনে এসেছে। সেই ফলাফল দেখে বিবেক শোক পালন করছে। উক্ত জরীপ দ্বারা জানা যায়, মিসরে ৮৫% নারী ব্লু ফিল্ম দেখে মজা পায়, ৭৫% নারী নগ্ন দৃশ্য দেখতে স্বাদ অনুভব করে, ৮৫% মারপিট ও এ্যাকশন ছবি দেখতে ভালবাসে, ৬৮% নতুন-পুরাতন আবেগী ফিল্ম দেখে, ৬১% অন্যান্য ছবি দেখে, আর শুধু ৬% টিভিতে প্রচারিত সংবাদ ও সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম দেখে। উপরন্তু সে নারীদের মধ্যে কেউ-ই জ্ঞানমূলক ফিল্ম কিংবা প্রোগ্রাম দেখার কথা আলোচনা করেনি।[১৭০] এই জরীপ যদি ইউরোপ কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হতো, তাহলে আমরা একথা চিন্তা করে নিস্তব্ধ হয়ে যেতাম যে, নগ্নতা ও উলঙ্গপনার কেন্দ্রে এসব কিছু না হলে কোথায় হবে! কিন্তু উল্লিখিত ফলাফল তো মিসরীয় নারীদের মাঝে কৃত জরীপ দ্বারা জনসমক্ষে এসেছে। এই রিপোর্ট পড়ে চক্ষু দিয়ে রক্ত ঝরবে না তো কী ঝরবে? বাকরুদ্ধ হবে না তো কী হবে? এবং হৃদয় মাতম করবে না তো কী করবে? মিসর তার উজ্জ্বল অতীতেও ইসলামী বিশ্বের দ্বীনী বুদ্ধিবৃত্তিক সভ্যতা-সংস্কৃতির নেতৃত্ব দিয়েছে। যে দেশকে ইসলামী বিশ্বের হৃৎপিন্ড মনে করা হতো, যে দেশের বুক চিরে প্রবাহমান নীল নদ মুসলানদের অতীত মর্যাদার সাক্ষ্য। কিন্তু এই নদের দুর্ভাগ্য যে, আজ মুসলমানরা এই রাজনৈতিক পতনের সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাস্কৃতিক পতনের অতল গহবরে তলিয়ে গেছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে হযরত ওমরের (রা.) পত্র যদি এই নদকে স্থায়ীভাবে শান্তিপূর্ণ না করে দিত তাহলে আজ পর্যন্ত তার তীরে চলমান নাইট ক্লাব, সৌন্দর্য ও রূপের বাজার দেখে কতবারই না এই নদ বিদ্রোহের প্লাবনে নগর জনপদ ভাসিয়ে নিয়ে যেতো।

---

১৬৯। আল আওলামাহ্, ড. জালাল আমীন, পৃ. ১২৬।

১৭০। দৈনিক আকতুবার ১৬/২/৯৭ইং।

সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানা যায়, বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় যন্ত্র ইন্টারনেট। ইন্টারনেট অশ্লীলতা, নগ্নতা ও উলঙ্গপনার সবচেয়ে বেশী বিস্তারকারী হাতিয়ার। কম্পিউটারের স্ক্রীনের সামনে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক খুলে নিয়ে শুধু একটি ক্লিকে (বাটন টিপে) ইন্টারনেট সরবরাহকৃত নগ্ন ও উলঙ্গ কুরুচিপূর্ণ ছবির ফাইল চলে আসে, যা মানুষের লজ্জা-শরমকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেয়। ইন্টারনেটে লাখ লাখ এমন ওয়েব সাইট রয়েছে যার মাধ্যমে উলঙ্গ ছবি. নগ্ন প্রোগ্রাম, ব্লু ফিল্ম ও অশ্লীলতার প্লাবন সৃষ্টিকারী ফিল্মসমূহ নির্লজ্জভাবে প্রদর্শন করা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন কোণার মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব।[১৭১]

## পাশ্চাত্য পূজা

বিশ্বায়নের জঘন্যতম প্রতিক্রিয়ার মধ্য হতে এটাও একটা যে, পশ্চিমা কালচার যা মূলত মার্কিন কালচার, সম্পূর্ণভাবে মানুষের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে গেছে। মার্কিন গীতিকার মাইকেল জ্যাকশন-এর মিউজিক ও গীতিই সবচেয়ে বেশী ইন্টারেস্টের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বেস্তুর ফিল্ম, ডাইলস স্টুডিও-এর পক্ষ থেকে তৈরিকৃত প্রোগ্রামই পুরো বিশ্বে লোকদের, বিশেষ করে তরুন ও যুবকদের মস্তিষ্কের দ্বারে হাতকড়া দিচ্ছে এবং তাদের স্বভাব ও প্রকৃতি অত্যন্ত জঘন্যভাবে প্রভাবিত করছে, এমন কি মার্কিন উচ্চারণেই ইংরেজী বলা বর্তমানের সবচেয়ে বড় ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।[১৭২]

## ইসলামী বিশ্বে ফ্যাশন

### একটি হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি!

মুসলিম উম্মাহর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নির্মূল করার জন্য বিশ্বায়নের একটি উপহার মার্কিন বেশ-ভূষা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর সেই সয়লাব, যার মধ্যে আজ গোটা ইসলামী বিশ্ব ডুবে গেছে। মার্কিন কাপড়, লেবাস-পোশাক ও পণ্যসামগ্রীতে ইংরেজী ভাষায় বাক্য লেখা যা মার্কিন সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে। আরব বিশ্বের বড় বড় দোকান ও বাণিজ্য কেন্দ্রের বিজ্ঞাপনী বোর্ডও সেখানে পণ্যসামগ্রীর ওপর আরবী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীতে এমন এমন বাক্য ও শব্দ লেখা থাকে যা সম্পূর্ণ মার্কিন সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে স্থানীয় ও দেশীয় শিল্প-পণ্যের চেয়ে মার্কিন পণ্য-শিল্পেরই বেশী চাহিদা। আরো একটি বিস্ময়কর জরীপ দ্বারা একটি

---

১৭১। আল-ইসলাম ওয়াল উম্মাতুল ইসলামিয়া, ড. জামালুল মুজাহিদাহ প্রণীত, পৃ. ৩৩।

১৭২। আস-সাকাফাতুল আরবিয়াহ্ ফী আসরিল আওলামহ, ড. আব্দুল ফাত্তাহ আহমদ আল-কাবী আল- আহরাম, ২২/২/০১।

অদ্ভুত তথ্য পাওয়া যায়, যা দ্বারা হৃদয় একথা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, ইসলামের হৃৎপিন্ডে ও কেন্দ্রে এবং কুরআন ও ওহীর ভূ-খন্ডে বসবাসকারী সে সমস্ত আরবদের বিবেক কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে কিংবা আল্লাহ পাকের নিয়ামতের নাশুকরী করার কারণে আল্লাহ পাক শাস্তি হিসেবে তাদের বিবেক-বুদ্ধিকেই ছিনিয়ে নিয়েছেন।

১৯৯৫ সালে একটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে,শুধু এক বছরে সৌদী আরবের মহিলারা ৫৩৮ টন লিপিস্টিক, ৪৩ টন নখ পালিশ ও ১১ টন নখ পালিশ রিমুভার (নখপালিশ বিনাশকারী উপাদান) ব্যবহার করেছে। আর ২৩২ টন আইলাইন্স (চক্ষুকে হৃদয়গ্রাহী বানানোর উপাদান) ৪৪৫ টন বিভিন্ন রংয়ের খিজাব ব্যবহার করেছে। এমনিভাবে ১২০০ থেকে ১৫০০ মিলিয়ন রিয়াল পারফিউম খাতে ব্যয় করেছে। শুধু গ্রীষ্মকালে ৪ হাজার ৪শত রমণী বিয়ের জন্য ১১০ মিলিয়ন রিয়ালের পশ্চিমা কাটিং-এর কাপড় তৈরি করেছে। তাতে এক জোড়া নারী-পুরুষের বিবাহ বাবদ গড়ে ৮ হাজার রিয়াল ব্যয় হয়। সৌদি আরবে বিয়ের সময় একজন রমণী স্বীয় সৌন্দর্য ও রূপ বৃদ্ধির জন্য ২৫ হাজার রিয়াল খরচ করে। উপরন্তু ১৯৯৭ সালের এক পরিসংখ্যানে এই দু:খজনক তথ্য উদঘাটিত হয় যে, আরব উপসাগরের রমণীরা শুধু এক বছরে ৭৯৯ মিলিয়ন ডলার পারফিউম ও ৪ মিলিয়ন ডলারের খেজাব ব্যবহার করেছে। এমনিভাবে ৬০০ টন লিপিষ্ঠিক ও ৫০০ টন নখ পালিশ ব্যবহার করেছে। আর উপসাগরীয় নারীরা ১.৫ কোটি ডলার মেক আপের পণ্যসামগ্রীতে ব্যয় করেছে।[১৭৩]

## পাশ্চাত্য প্রভাবিত মুসলমানদের অভিযোগ

কিছু প্রতারণার শিকার মুসলমান, যারা মডার্নিটি ও আধুনিকত্বকে নিয়মিত গ্রহণ করেছে এবং পাশ্চাত্যের প্রতারণার ফাঁদে আটকে তাদের অন্ধ অনুকরণে সফলকাম মনে করছে আর তাদের হীনমন্যতার (যার কারণে পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণের শিকার) বৈধতা প্রমাণ করার জন্য একথা বলছে, পশ্চিমা রেস্তোরাঁ পশ্চিমা বেশ-ভূষা এবং পশ্চিমা শিল্প পণ্য ও সামগ্রী অন্য দেশে বিস্তার ঘটলে কিংবা মুসলমানরা তা ব্যবহার করলে তাতে কি ক্ষতি? তাদের পণ্যসামগ্রী ব্যাপক হওয়া দ্বারা মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য কি বিপদ হবে? এবং তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য শেষ পর্যন্ত কিভাবে প্রভাবিত করবে।

---

১৭৩। মাসিক আল উসরাহ সফর, ১৪২০ হি।

এ ধরনের পশ্চিমাপন্থীদের জবাবে শুধু ফরাসী একটি উদাহরণ দেওয়াই যথেষ্ট। তা হলো, আপনি শুধু আমাকে আপনার খাবার সম্পর্কে বলে দিন, তাহলে আমি বলে দেব আপনি কে। এই উদাহরণ বাস্তবতাকে উন্মোচিত করে দেয়। কারণ লেবাস-পেশাক-বেশ, ভূষা, খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ইত্যাদি এমন সব বিষয়, যা সে দেশের ধ্যান-ধারণা ও ভাবধারার সাথে সাথে তাদের মূল্যবোধ, আচার-অভ্যাস, ভাষাও সাথে করে নিয়ে আসে।[১৭৪]

বাজার এখন এমন এমন মার্কিন ইউরোপীয় পোশাকে সয়লাব হয়ে গেছে, যার ওপর যৌন সুড়সুড়িমূলক বিভিন্ন ইংরেজী বাক্য লেখা থাকে। এমন কি তাঁর ওপর ইসলামী মূল্যবোধবিরোধী বাক্যও লিপিবদ্ধ থাকে। উদাহরণস্বরূপ (KISS ME) আমাকে চুমা দাও, (TAKE ME) আমাকে ধরো, (I'm Jewish) আমি ইহুদী, (PROSTITUTE) পতিতা নারী, (ADULTERY) ব্যভিচার এবং (ZION) জায়নবাদী ইত্যাদির মত অসভ্য, অমার্জিত ও চরিত্রবিধ্বংসী শব্দ বাক্য সে সমস্ত পোশাকের ওপর লিপিবদ্ধ থাকে যার একমাত্র উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তার ঘটানো, যার ভিত্তি নগ্নতা, উলঙ্গপনা ও অশান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১৭৫]

এজন্য ইউরোপীয় ও মার্কিন পণ্যের বিকাশ ও বিস্তার আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নির্মূল করা, আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে দাফন করা এবং অন্য জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার দিকে এ ধাপ এগিয়ে যাওয়া হবে। আফসোস, ইসলামী বিশ্ব এই এক ধাপ অগ্রসর হয়ে গেছে। কিন্তু এর চেয়েও বেশী আফসোসের কারণ হলো, নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল আজ পর্যন্ত আমরা অনুধাবন করতে পারিনি।

## ভাষাগত বিশ্বায়নের দিকে অগ্রসরমান পদক্ষেপ

আমি পূর্বে আলোচনা করেছি, যদি এক শব্দে বিশ্বায়নের সারকথা ও তাৎপর্য প্রকাশ করতে হয় তাহলে তার জন্য 'মার্কিনাইজেশন' শব্দটি বেশী উপযোগী। মার্কিনাইজেশন এর উদ্দেশ্য মার্কিনীকরণ অর্থাৎ বিশ্বের সকল বস্তুকে মার্কিন ছাচে ঢেলে সাজানো। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের নীতি নির্ধারণী সংস্থা, বিশ্বায়নের যে ব্যাখ্যা প্রদান করে তার উদ্দেশ্য মার্কিন জীবন ব্যবস্থা, মার্কিন ধর্ম, মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি, মার্কিন অর্থ ব্যবস্থা, মার্কিন সমাজ ব্যবস্থা ও মার্কিন ভাষা গোটা বিশ্বের

---

১৭৪। মাসিক আল মানারুল জাদীদপ্রবন্ধ আশা-শাবাবল মুসলিম ওয়াল আওলামাহ্ কামেল শরীফকৃত।
১৭৫। আল ইসলাম ওয়াল আওলামাহ্ পৃ. ১৩৬।

ওপর চাপিয়ে দেওয়া। ইঙ্গ-মার্কিন ছাড়াও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ যদিও পরিপূর্ণভাবে মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মার্কিন সমাজ ব্যবস্থার রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে গেছে কিন্তু তারা তাদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য বাকী রাখার খাতিরে অনুকরণযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং অনেকটা তারা এই ভাষাগত আগ্রাসন থেকে মুক্ত। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রকৃত টার্গেট এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ব। এমনিই তো বিস্তৃত দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোটি কোটি মুসলামান অসংখ্য ভাষায় কথা বলে এবং লিখে, বরং উর্দু, ফার্সী ও তুর্কী ভাষা তো, বিশেষ করে মুসলমানদেরই ভাষা। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এগুলোকে ইসলামী ভাষা আখ্যা দেওয়া হয় না। তবে মুসলমানদের ভাষা অবশ্যই বলা যেতে পারে।

আরবী ভাষা মুসলমানদের ভাষা হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী ভাষা হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আর তা হবেই না বা কেন, কারণ এ ভাষাতেই আল্লাহ পাক স্বীয় মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। এ ভাষাতেই হাদীস শরীফের বিশাল ভান্ডার মজুদ রয়েছে। এই ভাষার সংরক্ষণের দায়িত্বও স্বয়ং আল্লাহ পাক নিয়েছেন যার জ্বলন্ত প্রমাণ আল কুরআন, যা অপরিবর্তিত অবস্থায় এখনো বিশ্বাবাসীর নিকট বিদ্যমান আছে। সুতরাং আরবী ভাষাকে ইসলামী ভাষা বলা হবে না তো কি বলা হবে? একমাত্র আরবী ভাষারই বৈশিষ্ট্য হলো, চৌদ্দ শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তার একটি হরফেরও পরিবর্তন হয়নি, অথচ তার বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ও আন্দোলনের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের মিলনকেন্দ্র মিসরে যখন ফ্রান্স ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বীয় পাঞ্জা গেড়ে বসেছিল, তখন সুপরিকল্পিতভাবে এমন এমন ব্যক্তি তৈরি হয়েছিল, যারা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম তো ছিল, কিন্তু তারা আরবী ভাষার দ্বীনী বৈশিষ্ট্য ও ধর্মীয় রঙের বিরোধী ছিল। তা-হা হুসাইনসহ আরো অনেক লেখক সাহিত্যিক রয়েছে যারা এমন আন্দোলন পরিচালনা করেছিল এবং এমন ধ্যান-ধারণা পেশ করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল আরবী ভাষার ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য নির্মূল করা। যাতে এই ভাষা তার প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলার পর একটি সাধারণ ভাষায় পরিণত হয়। পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের সামনে মাথা নত করে দেয়। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের দিকপালদের প্রবল প্রতিরোধ পশ্চিমা প্রভুদের স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়ন হতে পারেনি। কিন্তু ষড়যন্ত্রের উপচেপড়া সয়লাব একটুও থেমে যায়নি। কাল ও আজ-এর মধ্যে যদি পার্থক্য এসে থাকে তাহলে শুধু এতটুকু যে, কাল সে সমস্ত ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার ছিল

প্রচলিত ও প্রাচীন, আর আজকের অস্ত্র অত্যন্ত উন্নত ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সজ্জিত। অবশ্য আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে তার আসল রূপ ও আকৃতিতে বাকী রাখা এবং আধুনিক যুগের উন্নতি-অগ্রগতির সাথে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে কিছু আরব সংগঠন-সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় ভাষার সংরক্ষণের কাজ তাদের থেকে নিয়েছেন। কিন্তু যদি জনসাধারণের পর্যায়ে এই ভাষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি সামনে আসে। আশার কিস্তি নড়বড় করতে শুরু করে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও বিশ্বায়নের হাতে তার ব্যর্থতা দৃষ্টিগোচর হয়।

ভাষা মানুষের মাঝে সম্পর্ক ও যোগাযোগের একটি মাধ্যম। প্রকৃতপক্ষে ভাষা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পোশাক, বরং তার রক্ষক এবং সংস্কৃতি ও তাহযীবের ভিত্তি। আর তাহযীবই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের শিরোনাম। এজন্য কোন জাতির স্বাতন্ত্র্য ও নৈতিকতা গঠনে ভাষার কত যে বেশী গুরুত্ব তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়।

১ যে কোন জাতি তার ভাষাকে যত বেশী ব্যবহার করে ততই ভাষা'তার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে স্থায়িত্ব দান করে। ভাষার এত বেশী গুরুত্বের কারণে ইসলামী শরীয়ত বিনা প্রয়োজনে অন্যের ভাষা ব্যবহার করা হতে বিরত থাকার উৎসাহ ও নির্দেশ দিয়েছে

বরং অনেক ফকীহ তো আরবী ভাষা শিক্ষা ওয়াজিব আখ্যা দিয়েছেন। সভ্যতা- সংস্কৃতির সাথে ভাষা বরং আক্বাইদের সাথে এত গভীর সম্পর্ক দেখে কিছু কিছু ভাষাবিদ একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন, আধুনিক যুগে ইংরেজী ভাষায় আগ্রাসান কোন সামরিক আগ্রাসন থেকে কম নয়। যেমনিভাবে কোন জাতি রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ফায়দা ওঠানোর জন্য অন্য জাতির ওপর আগ্রাসন চালায়, তেমনিভাবে ইংরেজী ভাষাও যদি অন্য ভাষার বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায় তাতে কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ প্রতিটি জাতি তার ভাষা নিয়ে গর্ব করে। তার ভাষার সমৃদ্ধি, উন্নতি ও অগ্রগতি প্রচার- প্রসারকে সে নিজের জন্য সৌভাগ্য ও সম্মান থেকে কম মনে করে না। এ কারণেই তো কোন কোন অঞ্চলে ভাষার কারণেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। মেসিডোনিয়া বছরের পর বছর ধরে শান্তির পথ পানে চেয়ে আছে কিন্তু আলবানী ভাষাকে সে দেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার বিষয়টি শান্তির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে।

## ভাষা ঐক্যের প্রতীক

ভাষা যেমনিভাবে কোন জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির সংরক্ষক, তেমনিভাবে সে জাতির মাঝে ঐক্য-সংহতিরও একটি মাধ্যম বটে! ভাষার মাধ্যমে সকল জাতি উন্নতি-অগ্রগতি লাভ করে মর্যাদা ও উচ্চতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করে। তাদের মাঝে ঐক্য-সংহতির ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু ভাষাকে যদি তার আসল মর্যাদা ও সঠিক স্থান না দেওয়া হয় তাহলে জাতিসমূহের মধ্যকার ঐক্য ভেঙ্গে চুরামার হয়ে যায়। তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা ও সংহতি ধুলোয় মিশে য়ায়। এ কারণেই যে দেশে শুধু একটি ভাষায় কথা বলা হয় সে দেশ অর্থনীতি ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ঐ দেশের তুলনায় বেশী মজবুত ও শক্তিশালী যে দেশে একাধিক ভাষায় কথা বলা হয়। কারণ একই ভাষা হওয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভারত একটি বহু ভাষার দেশ হওয়ার কারণে গর্ববোধ করে।

কিন্তু এই বহু ভাষা সে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার একটি কারণ। আফ্রিকার দেশসমূহ যেখানে অগনিত ভাষা রয়েছে, যদি তার তুলনা ইউরোপীয় দেশসমূহের সাথে করা হয়, তাহলে আসমান-যমীনের মাঝের দূরত্বের মত পার্থক্যের কারণ স্পষ্ট হয়ে সামনে আসবে। জামালুদ্দীন আফগানীর ভাষায় যদি উসমানী খেলাফতের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এটাও স্পষ্ট হয় যে, আরবী ভাষা উসমানী খেলাফতের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পায়নি। এজন্য আরবী ও তুর্কী জাতীয়তাবাদের স্লোগান এবং সুবিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য উসমানী খেলাফত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।[১৭৬] এই আলোকে কিছু কিছু গবেষকের এই কথা সঠিক মনে হয়, যে দেশ ভাষার কারণে বিভক্তির শিকার হয় সে দেশ সর্বদা অর্থনীতির দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে যায়।[১৭৭] এমনিভাবে কিছু কিছু গবেষকের বক্তব্য এটাও যে, ইউরোপে বহু ভাষার অস্তিত্বেই তাদের ঐক্যের পেছনে সবচেয়েবড় আন্তরায়।[১৭৮] সুতরাং এতে দ্বিমতের আর কোন অবকাশ নেই যে, কোন জাতির মাঝে বিদেশী ও অপরিচিত ভাষার অনুপ্রবেশ কী পরিমাণ বিপজ্জনক। অত:পর এই ভয়াবহতা বিদেশী ভাষা দুর্বল ও কমজোর হওয়া সত্ত্বেও

---

১৭৬। আল-আ'মালুল কামিলাহ লিজামালুদ্দীন আল-আফগানী, ড. মুহাম্মদ উমারাহ, প্রাণীত পৃ. ২১৯।

১৭৭। আল-লুগাহ ওয়াল ইকতিসাদ, ড. মুহাম্মদ আউদ। আল লুগাতুল আরাবিয়া ফী আরাবিয়া ফী আসরিল আওলামাহ্- এর সৌজন্যে, পৃ ৪০. ড. আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আয-যবী।

১৭৮। প্রাগুক্ত।

অবশিষ্ট ও অব্যাহত থাকে। কিন্তু যদি বিদেশী ভাষা শক্তিশালী ও বিকশিত হওয়ার উপায়-উপকরণের মাধ্যম হয়, তাহলে তা দ্বারা সংগঠিত বিপর্যয়ের অনুমান করা অসম্ভব। বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তখন বিদেশী ভাষা দেশীয় ভাষার ওপর প্রবল হয়ে যায় এবং বিদেশী ভাষার ব্যবহারকেই কারো সভ্য, ভদ্র ও শিক্ষিত হওয়ার নিদর্শন মনে করা হয়। সে ভাষায় কথোপকথনকারীদের ইজ্জত-সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং তাদের দেশী ও স্থানীয় ভাষায় কথোপকথনকারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়ে যায়। তাহলে এভাবেই বিদেশী ভাষা ধীরে ধীরে দেশীয় সংস্কৃতিকে নির্মূল করে নিজের সাথে আনীত সভ্যতা-সংস্কৃতিকে জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়।

সভ্যতা-সংস্কৃতি বরং ধর্ম ও আকাইদদের সাথে ভাষার এই সুগভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাহর জীবন বিধান আল-কুরাআনকে এমন একটি গ্রন্থে পরিণত করেছেন যার শব্দ-অক্ষর, এমন কি হরকত পর্যন্ত সংরক্ষিত রেখেছেন। অত:পর উম্মাহকে সে ভাষাতেই কুরআন কারীমের পঠন-পাঠনের নির্দেশ দিয়েছেন, যে ভাষাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং শুধু শব্দ ও অক্ষর তেলাওয়াত করাকেই সওয়াব ও ইবাদত ঘোষণা করেছেন যাতে একজন মুসলামান কুরআন তিলাওয়াতের সময় স্বীয় প্রভুর সাথে এক আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করে। এ ওহীর বাণীর প্রজ্ঞা ও কৌশলের ফলে আরবী ভাষা আজও সে অবস্থাতেই টিকে আছে, যে অবস্থায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। এজন্য মুসলিম উম্মাহর গর্ববোধ করা উচিত যে, তার নিকট এমন একটি ভাষা রয়েছে যা অন্য কোন জাতির নিকট নেই। এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম দেশসমূহ অন্য কোন বিষয়ে ঐকমত্যে আসুক বা না আসুক, কিন্তু আরবী ভাষা তাদের মাঝে একতার অনুভূতি বজায় রেখেছে। অত:পর এই ভাষাগত ঐক্য ভৌগোলিক পরিস্থিতির ফলাফল নয় বরং এটা তো সেই আসমানী ধর্মের ধারাবাহিকতার একটি কড়ি, যা সে সমস্ত দেশের জন্য একটি গর্বের বিষয়।

ঐক্যের এই তীক্ষ্ণ অনুভূতি, যা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে যে, এই ভাষাগত ঐক্যই যেন ইসলামী বিশ্বের মাঝে ঐক্য-সংহতির কারণ না হয়ে যায়। কারণ ভাষা এমনই একটি বিষয় হিসেবে এখানো অবশিষ্ট রয়েছে যা যে কোন সময় ইসলামী বিশ্বকে এক সুতোয় গ্রথিত করতে পারে! নতুবা আরব নেতাদের থেকে তো বহুপূর্বেই দ্বীন-ধর্ম বিদায় হয়ে গেছে। এজন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঐক্যের স্বপ্ন কখনো বাস্তবতার সীমানায় পৌছতে পারে না।

পশ্চিমা চিন্তাবিদদের এখন যেটা ভাবনা সেটা হলো, ইসলামী বিশ্বের মাঝে এই ভাষাগত ঐক্যের সম্ভাবনাকে নির্মূল করা, এই ঐক্যের ব্যাপারে যদিও তাদের কোন বিশ্বাস ও আস্থা নেই। কিন্তু এ সন্দেহ অবশ্যই রয়েছে, কখনো যেন এ ঐক্য ইসলামী বিশ্বকে এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে না দেয়! এজন্য ভাষাগত বিশ্বায়নের টার্গেট এখন পূর্ণাঙ্গভাবে আরবী ভাষার দিকে। পশ্চিমা মস্তিষ্ক এখন আরবী ভাষার ওপর আগ্রাসনের পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়ে গেছে। তবে এটা ভিন্ন কথা যে, যখন প্লাবন কোন অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় তখন তার রাস্তার সকল বস্তু প্রভাবিত হয়। এমনিভাবে ভাষাগত বিশ্বায়নের টার্গেট যদিও ইসলামী বিশ্ব কিন্তু তার আন্তর্জাতিক রাস্তার সকল ছোট-বড় ভাষা এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং তার কথোপকথনকারীদের কাছে তার অস্তিত্বের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টার হাত সম্প্রসারিত করার অনুমতি চাচ্ছে।

## ভাষাগত বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য

ভাষাগত বিশ্বায়নের কথা শুনে মানব মস্তিষ্কে এ প্রশ্ন অবশ্যই উঁকি মারে যে, তার মমার্থ কী? বাস্তবিকই কি কোন বিশেষ ভাষার বিশ্বায়ন করা হচ্ছে? যদি আমরা বিশ্বায়নের বাহ্যিক অর্থে (স্থানীয়কে আন্তর্জাতিক বানানোর) প্রতি চিন্তা-ভাবনা করি, তাহলে কি বাস্তবিকই এমন কোন ভাষা আছে যা স্থানীয় ও আঞ্চলিক গন্ডি হতে বের হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এসে গেছে? না কি বাস্তবেই এমন কোন ভাষা আছে, যা ভৌগোলিক সীমারেখাকে অতিক্রম করেছে? কি এমন কোন ভাষাও আছে যাকে গোটা বিশ্বের জনগণ স্বীয় মাতৃভাষার পরিবর্তে যোগাযোগের মাধ্যম বানাচ্ছে?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক। কারণ ইংরেজী একমাত্র ভাষা যার বিশ্বায়ন ঘটছে। এই ভাষাকে সামান্য কিছু দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা হতে বের করে অসীম ও সীমাহীন বানানো হচ্ছে। এখন এই ভাষাতে শুধু কয়েকটি দেশের বাসিন্দারাই কথা বলে না, বরং প্রতিটি দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকও এই ভাষাকে নিজ ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর এটাই ভাষাগত বিশ্বায়নের রাস্তায় একটি অগ্রসরমান পদক্ষেপ। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সেদিন পূর্ণ হবে যেদিন প্রতিটি দেশের জাতীয় ভাষা ইংরেজী হয়ে যাবে। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে মার্কিন অর্থনীতি ও মিডিয়ার আধিপত্যের ফলে ইংরেজী ভাষার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। অত:পর ইন্টারনেটের ব্যবহার তো আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এর

বিকাশের সকল রাস্তা উন্মুক্ত ও সহজ করে দিয়েছে, যার পরিনতিতে মার্কিন সংস্কৃতির মুখপত্র ইংরেজী ভাষার শব্দ ও বাক্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মুখে ব্যাপক হয়ে গেছে, এমন কি জার্মান ও চীনা ভাষাবিদগন ইংরেজী ভাষার এই ব্যাপকতাকে নিজেদের ভাষার জন্য বিপদ মনে করছেন। কিন্তু আরবরা এই ভাষাগত আগ্রাসনকে সহাস্য বদনে মেনে নিয়েছে এবং তার জন্য আরবী ভাষার সকল দরজা পরিপূর্ণভাবে খুলে দিয়েছে যাতে ইংরেজী ভাষা আরবী ভাষার মধ্যে ভালভাবে একীভূত ও বিলীন হয়ে যেতে পারে। তাই যাতে তারা ইংরেজী ভাষাকে আরবী ভাষায় বেশী বেশী ব্যবহার করতে পারে এবং তার বাগধারা ও পরিভাষাগুলোকে আরবী অক্ষর ও শব্দের লেবাস পরিয়ে লেখা ও পড়া যায়।

যেরূপ আমি ওপরে আলোচনা করেছি, বিশ্বায়নের আড়ালে কর্মতৎপর মস্তিষ্ক যদিও ইহুদী কিন্তু তারা এই আন্দোলনের কেন্দ্র আমেরিকাকে নির্বাচন করেছে। সুতরাং এই দেশের প্রতিটি স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিষয়কে আন্তর্জাতিক বানানোই এখন বিশ্বায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিশ্বায়ন করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত জোরেশোরে শুরু হয়েছে। এমনিভাবে ইংরেজী ভাষার বিশ্বকরণের প্রচেষ্টাও দ্রুত গতিতে চলছে, বরং একথা বললেই বেশী ভাল হবে যে, প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে অব্যাহত প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনাকে খুব দ্রুত গতিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলাফল হলো, ইংরেজী আজ আন্তর্জাতিক ভাষার স্থান দখল করেছে। এই ভাষাকে আন্তর্জাতিকতার মর্যাদা দান করা বিশ্বায়নবাদীদের প্রথম টার্গেট ছিল। এখন তাদের টার্গেট হলো অন্যান্য ভাষাকে নির্মূল করে শুধু এ ভাষাকেই ব্যাপক করা। এ রাস্তায় যদি তাদের কোন প্রতিবন্ধকতা দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তা হলো আরবী ভাষা। এজন্য পশ্চিমা ফেরাউনদের মস্তিস্ক এখন এই আরবী ভাষাকে নির্মূল করার পরিকল্পনা তৈরি এবং তৈরিকৃত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে লেগে আছে।

## ইংরেজী ভাষার বিশ্বায়ন কর্ম পদ্ধতি

বিশ্বায়ন ও ইংরেজী ভাষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এই ভাষাকে অধিকতর বিকাশ ঘটানো ও এর গন্ডিকে সম্প্রসারণ করার জন্য বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। যেহেতু ভাষা শিক্ষা একটি শাস্ত্র, আর যে কোনো শাস্ত্রকে ব্যাপকও বিস্তৃত করার জন্য স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য ইংরেজী ভাষাকে বিকাশ দানের প্রচেষ্টাও সর্বসাধারণ পর্যায়ের সাথে সাথে

ইউনিভার্সিটি ও কলেজ পর্যায়েও আছে। সুতরাং ভাষাতত্ত্ববিদ Claud Hagege (ক্লাউড হ্যাজেজ)-এর বক্তব্য হলো "ইংরেজী ভাষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বের সকল ইউনিভার্সিটির ওপর বরাবর এই জোর দিয়ে আসছে যে, তারা যেন ফরাসী ভাষা শিখানো বন্ধ করে দেয়, যাতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু আবার বিশ্বায়নবাদীরা বৃটিশ ইংরেজীর প্রসার করতে চায় না, বরং তাদের সকল প্রচেষ্টা মার্কিন ইংরেজীর বিস্তার ঘটানোর ওপরই ব্যয় হচ্ছে। তারা মার্কিন ইংরেজীকেই বিশ্বব্যাপী ছড়াতে চাচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগগুলো প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্যন্ত এই ইউনিভার্সিটিগুলো শুধু সে সকল শিক্ষার্থীকেই ডিগ্রি প্রদান করেছে, যারা ইংরেজী ভাষা ও বৃটিশ সাহিত্যিকদের জীবনী বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এরপর বৃটিশ সাহিত্যিকদের সাথে একজন মার্কিন সাহিত্যিকের জীবনী ও পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হলো। তারপর শেক্সপিয়ার ছাড়া কোনো বৃটিশ সাহিত্যিক সম্পর্কে পড়ানো তারা পছন্দ করে না। বৃটিশ সাহিত্যিকদের স্থান দখল করে নেয় মার্কিন সাহিত্যিকরা। এর সাথে সাথে ইংরেজী পড়ানোর জন্য এমন শিক্ষক ও প্রফেসর নিয়োগ দেওয়া হয় যারা মার্কিন বংশোদ্ভূত কিংবা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশুনা করেছে, এমন কি শিক্ষা-কারিকুলাম প্রণয়ন কমিটিতে তাদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল। তাদের প্রচেষ্টার ফলে ছাত্রদের অধিকাংশই মার্কিন ইংরেজীকে প্রাধান্য দিতে লাগল।

এ ব্যাপারে, সুইজারল্যান্ডের শহর বার্ন এ অবস্থিত মার্কিন হাইকমিশনও পিছিয়ে নেই। এই হাইকমিশনের পক্ষ থেকে ১৯৮৮-সালে সুইজারল্যান্ডের প্রাইমারী স্কুলগুলোর শিক্ষকদের জন্য একটি প্রোগ্রামের সূচনা করা হয়, যার অধীনে শিক্ষকদেরকে এক মাসের জন্য আমেরিকার বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাদেরকে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং সাথে সাথে একটি সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকরা যখন শিশুদের শিক্ষা দেবে তখন তাদের মিডিয়া বা মাধ্যম হবে ইংরেজী ভাষা। যারা এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন এবং পরবর্তীতেও ইংরেজী ভাষার বিকাশ ও বিস্তারে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে তাদেরকে হাইকমিশনের পক্ষ থেকে সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং উৎসাহ ও সাহস প্রদানের জন্য ইংরেজীতে একটি পুস্তকও প্রণয়ন করা হয়েছে।[১৭৯]

---

১৭৯। আমিরিকা, আল-মুস্তাবাদ্দাহ, পৃ.১২৮।

সাংবাদিক ভার্জিনি ডোমারোন লেখেন, "স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ছাড়াও সর্বসাধারণ পর্যায়ে ইংরেজী ভাষার বিকাশ সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হয়েছে। কারণ সকল বিজ্ঞাপন টিভি ও পত্র-পত্রিকায় সাধারণত ইংরেজী ভাষাতেই দেওয়া হয়। যে সমস্ত বিজ্ঞাপনের কারণে পরিপূর্ণভাবে না হলেও প্রচুর ইংরেজী শব্দ সকল ভাষায় ব্যাপক হয়ে গেছে।[১৮০] ইংরেজী ভাষার প্রচার-প্রসারের জন্য একটি সক্রিয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, মার্কিন কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলো বিশ্ব জুড়ে তার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে যেখানে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়া হবে। সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মান এত উন্নত করা হয়েছে যে, সেখান থেকে শিক্ষা অর্জনকারীদের বড় বড় কোম্পানীতে ভাল ভাল চাকরী মিলে যায় যা দ্বারা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ওয়াল স্ট্রীট ইনস্টিটিউট (Wall Street Institute) নামক মার্কিন প্রতিষ্ঠান সবার শীর্ষে, যার শাখা-প্রশাখা প্রতিটি দেশেই রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ পত্রিকা উকায-এ বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তাতে এক ব্যক্তিকে হাত বাঁধা অবস্থায় দেখানো হয়েছে। নিচে লেখা আছেঃ আপনার মধ্যে যোগ্যতা যতই থাকুক না কেন, ইংরেজী ভাষা জানা ছাড়া আপনার হাত বাঁধা। তাহলে আপনি ইংরেজী শেখার জন্য ওয়াল স্ট্রীট-এর প্রতিষ্ঠানে এগিয়ে আসুন। সেখানে আপনি আমেরিকার দক্ষ শিক্ষকের মাধ্যমে ইংরেজী শিখতে পারবেন।[১৮১] উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়াও ইন্টারনেট, টেলিভিশন ও হলিউডের ফিল্ম মার্কিন ভাষাকে গোটা বিশ্বে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর আজ তো ইংরেজী বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভাষায় পরিণত হয়েছে।

## মার্কিন ইংরেজীই মূলত আন্তর্জাতিক ভাষা

ইংরেজী ভাষা কয়েকটি দেশের জাতীয় ভাষা। সেখানে কয়েক শতাব্দী ধরে এ ভাষা ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু সে সকল দেশের ইংরেজী ভাষায় বিরাট পার্থক্য পাওয়া যায়, বিশেষত উচ্চরণ ও বানানে বিরাট বৈপরীত্য পাওয়া যায়। এজন্য সব ইংরেজী ভাষাই আন্তর্জাতিক ভাষা নয়, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ইংরেজী বলা হয় তাই মূলতঃ আন্তর্জাতিক ভাষা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজী

---

১৮০। প্রাগুক্ত।

১৮১। দৈনিক উকায, ৩০ রবিউল আওয়াল, ১৪২৩ হি.।

বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রসারের ফলে অন্যান্য দেশের ইংরেজীও বিপর্যয়ের সম্মূখীন হয়ে পড়েছে। ১৭৮৩ সনে মার্কিন ইংরেজীর জন্ম হয়। সে সময় ওয়েবস্টার, টাচ বিন ও উইলিয়াম স্মীথ- এর মত মার্কিন সাহিত্যিকগণ নতুন আবিষ্কৃত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনির্মাণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে কাজ করছিলেন। সে সমস্ত সাহিত্যিকদেরও এই ধারণা ছিল যে, মার্কিন জাতিই ভবিষ্যতে এই প্রদীপ হাতে নিয়ে সামনে অগ্রসর হবে যা দ্বারা গোটা বিশ্বে আলো ছড়িয়ে পড়বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই আগামী দিনে বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে এবং জাহেলিয়াতে আচ্ছন্ন বিশ্বকে জ্ঞানের আলো দান করবে। এজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হওয়া উচিত।

ফলে তারা এমন মার্কিন ইংরেজীর জন্ম দিল যা উচ্চরণ ও বানানে বৃটিশ ইংলিশ থেকে ভিন্ন ছিল। এই নতুন ইংলিশের বিজ্ঞাপনের জন্য পুস্তক রচনা করা হলো। ডিকশনারী প্রণয়ন করা হলো। পত্র-পত্রিকার প্রসার ঘটানো হলো। প্রসিদ্ধ ইংলিশ অভিধান নিউ ওয়েবস্টার সে যুগেরই উৎপাদন যা সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত মার্কিন ইংরেজীর বিকাশ ও বিস্তারের জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উন্নতির কারণে মার্কিন ইংলিশের সবচেয়ে বেশী বিকাশ লাভ হয়েছে। স্থানে স্থানে মার্কিন স্টাইলেই ইংরেজী শব্দ ও বাক্য লেখা শুরু হয়। দোকান ও রাস্তাঘাটের সাইনবোর্ডগুলো এমনিভাবে শিল্পও পণ্যসামগ্রীর ওপরও মার্কিন বানানেই ইংরেজীর প্রচলন শুরু হয়। প্রাচীন বৃটিশ ইংরেজীর গন্ডি আস্তে আস্তে সীমিত হতে লাগল, এমন কি তা দু-একটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো। এমন অগণিত শব্দ রয়েছে, যার মধ্যে মার্কিন ও বৃটিশ ইংলিশের মাঝে বানান রীতিতে বিরাট বৈপরীত্য পাওয়া যায়। সুতরাং মার্কিনীরা Centre-এর পরিবর্তে Center, Throught এর পরিবর্তে Thru, Colour এর পরিবর্তেColor, Defense এর পরিবর্তে Defence, Traveller- এর পরিবতে Traveler এবং Theatre এর পরিবর্তে theater লেখে। এ-তো শব্দসমূহের মধ্যে পরিবর্তন! বাগধারা ও বাক্যের ক্ষেত্রেও উভয় ইংলিশের মধ্যে বিস্তার পার্থক্য রয়েছে।

সুতরাং আমেরিকায় যদি একথা বলতে হয় যে, "আমি আপনার সাথে ঘরে সাক্ষাত করব" তাহলে তার জন্য "See you home" ব্যবহৃত হয় আর বৃটেনে বলা হয় "See you at home'এমনিভাবে কারো অসুস্থতার কথা বলার জন্য 'Ill'-এর পরিবর্তে Sick বলা হয়। যদিও বৃটিশ রেডিও (BBC) এর পক্ষ হতে প্রাচীন ও সঠিক ইংলিশ প্রসারের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রয়াস চালানো হয়। কিন্তু যেহেতু মিডিয়া

ও প্রচার মাধ্যমের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে, এজন্য BBC `র পক্ষ হতে উক্ত প্রচেষ্টা তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ফায়দা লাভ করতে পারেনি বরং মার্কিন ইংলিশকেই ক্রমবর্ধমান হারে উন্নতি লাভ করতে দেখা যাচ্ছে।[১৮২]

এসব সত্ত্বেও বর্তমান ইংরেজীকেই সাধারণত আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা দেয়া হয় এবং তাকে বিশ্বের অন্যান্য ভাষার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়। চায় তার উপর মার্কিন রং-ই প্রবল হোক না কেন। কারণ কোন ভাষার বিভিন্নমুখী হওয়াটা তার ব্যাপকতার নিদর্শন। কিন্তু এটুকু অবশ্যই সত্য যে, অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে কোন এক ধরণ বা কোন এক ভঙ্গিকে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রধান্য দানের জন্য এত বেশী প্রচেষ্টা করা হয় না, যতটুকু প্রচেষ্টা করা হয় মার্কিন ইংলিশকে বিস্তার ও বিকাশের জন্য এই ভিত্তিতে চায় মার্কিন ইংরেজীর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হোক কিংবা বৃটিশ ইংরেজীর মোট কথা ইংলিশেরই প্রাধান্য ও বিজয় থাকবে এবং বিশ্বের এক নম্বর ভাষা হওয়ার মর্যাদা অর্জিত হবে। ইতিমধ্যে ইংরেজী এই মর্যাদা অর্জন করেও ফেলেছে। এখন শুধু সে সময়ের অপেক্ষা যখন বিশ্বের অন্যান্য ভাষাগুলোকে ইতিহাসের গর্ভে বিলীন করে দেওয়া হবে এবং তাকে শুধু একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসেবে স্মরণ করা হবে। পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত যদি কোন ভাষা অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা হবে ইংরেজী। বিশ্বায়ন যদি স্বীয় মিশনে ১০০% সফলকাম হয় তাহলে সে যুগের আগমন অনিবার্য।

## ইংরেজী ভাষার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব

নি:সন্দেহে বর্তমান যুগে ইংরেজী ভাষা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া ও মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ইংরেজী ভাষার পরিচিতির জন্য তৈরী ওয়েব সাইট "www.krysstal.com" অনুযায়ী "এই ভাষা বিশ্বের সবচেয়ে বেশী কথোপকথনকারী ভাষা"। আর এর জন্য বড় গর্বের বিষয় হলো, এই ভাষা বিশ্বের ৩০০ মিলিয়ন লোকের মাতৃভাষা, ৩০০ মিলিয়ন লোক একে দ্বিতীয় (সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ) ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে আর ১০০ মিলিয়ন লোক একে বিদেশী ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। ৪৫টি দেশ এমন রয়েছে যেখানে ইংলিশ সরকারী কিংবা বেসরকারী ভাষার মর্যাদা অর্জন করেছে। যে সকল দেশে এখনো ইংরেজীর এই মর্যাদা অর্জিত হয়নি সেখানকার বাসিন্দাদের মাঝেও এই

---

১৮২। আমেরিকা, আল-মুস্তাবাদ্দাহ, পৃ. ১২৯।

ভাষা নিয়মতান্ত্রিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সম্ভবত বিশ্বে এমন কোন দেশ বাকী নেই যেখানের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ওপর এই ভাষা প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফেলেনি।[১৮৩] ওয়েবসাইটের মতে ফ্রেন্স, স্প্যানিশ ও আরবী ভাষার গন্ডি যথাক্রমে ২৭, ২০ ও১৭টি দেশে সীমাবদ্ধ, আর ইংরেজী এর থেকে বহুগুণে বেশী। ওয়েব সাইটের এভাবে গর্ব করা হয়েছে যে, ফ্রেন্স কোম্পানী ও আরবী ভাষায় কথোপকথনকারীরা মানুক চায় না মানুক কিন্তু বাস্তবতা এই যে, ইংরেজী ভাষা বিশ্বায়নের পথে খুব দ্রুত ধাবমান। চীনা ভাষায় কথপোকথনকারীর সংখ্যা যদিও বেশী কিন্তু এর কারণ হলো চীনের জনসংখ্যা বেশী। আর বাস্তবতা এই যে ইংরেজী ভাষায় কথোপকথনকারীরা কোন এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রতিটি স্থানে ইংরেজী ভাষার লোক পাওয়া যায়। উপরন্তু গোটা বিশ্বের অর্ধেকের চেয়েও বেশী বাণিজ্যিক কাজকর্ম ও লেনদেন ইংরেজীর মাধ্যম্যেই হয়। এমনিভাবে দুই-তৃতীয়াংশ বিজ্ঞান আজ ইংরেজী ছাড়া পড়া সম্ভব নয়। ডাকের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ৭০ শতাংশ ইংরেজীই ব্যবহৃত হয় এবং ভ্রমণ ও পর্যটন পরিমন্ডলে ইংরেজীই যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।[১৮৪]

ইংরেজীর সর্বব্যাপী প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার কারণ হলো, ইংলিশ কোন মতানৈক্য ছাড়াই আজ ইন্টারনেটের ভাষা হয়ে গেছে। একটি জার্মান সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত এক গবেষণার দ্বারা জানা যায়, ইন্টারনেটের ৭৭ শতাংশ পৃষ্ঠা ইংরেজী ভাষায়। আর বিশ্বের অবশিষ্ট ভাষাগুলো শুধু ২৩ শতাংশ পৃষ্ঠা ব্যবহার করে। এই গবেষণা ইন্টারনেটের প্রায় এক কোটি পৃষ্ঠা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করার পর সামনে আসে (ইন্টারনেটের এক পৃষ্ঠায় পুস্তকের ৪/৬ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু এসে যায়)। গবেষণায় বলা হয়েছে, ইন্টারনেটে ইংরেজীর পর জাপানী ভাষা, অতঃপর জার্মান ভাষার স্থান। অথচ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মার্কিনীদের হার ধারাবাহিক হ্রাস পাচ্ছে। যদিও গোটা বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের অর্ধেক মার্কিন যুক্তরাস্ট্রে কিন্তু পাঁচ বছর পূর্বে এর হার ছিল মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ। ব্যবহারকারীদের হার হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ইংরেজী ভাষা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের পরিমন্ডলে গুগল Google কোন নতুন নাম নয়, বরং Google একটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ওয়েবসাইট।

---

১৮৩। যঃঃঢ়: / / ীীী.শহুং ঞ্জঅখ. ঈভগ/উঘএখওঝঐ. যঃসষ

১৮৪ । প্রসিদ্ধ ওয়েব সাইড যাতে ইংরেজী ভাষার পরিচিত দেওয়া আছে যঃঃঢ় : / / ীীী. শহুংংঃধষ. পড়স/ উহমষরংয. যঃসষ.

জার্মানীতে প্রতিষ্ঠিত এর একটি সেন্টার যে গবেষণা প্রকাশ করেছে, তা দ্বারা এ অনুমান করা মোটেই কঠিন নয় যে, ইংরেজী ভাষা খুব দ্রুত প্রসার লাভ করছে। মজার কথা হলো, ইংরেজী ভাষা দ্রুত প্রসার লাভ করলেও এমন লোকদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে যারা ইংলিশকে স্বীয় মাতৃভাষা মনে করে। কিন্তু বিশ্বায়নের শক্তিশালী হাতিয়ার ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই ভাষা অসাধারণভাবে বিকাশ লাভ করছে।

এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা ঘরে ঘরে প্রবেশ করছে। এজন্য ভাষাবিদদের মতে ইংরেজী ভাষার এই সীমাহীন প্রসারের কারণে এই ভাষায় কথোপকথনকারী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ভাষা ব্যবহারকারীদের সঠিক সংখ্যা তুলে ধরা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, বরং অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজী ভাষার বিশ্বায়নের ফলে আজ এই ভাষা বিশ্বের অধিকাংশ দেশ, বিশেষ করে আরব দেশে দ্বিতীয় স্তরের ভাষার মর্যাদা অর্জন করেছে। আর ফরাসী ভাষার স্থান হলো তৃতীয়। আরব বিশ্বের স্কুলসমূহের (যেখানে ইংরেজী কিংবা ফরাসী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়) পাঠ্যসূচী দেখে ভালভাবেই এ অনুমান করা যায়, এই দুই ভাষাকে কেন্দ্র করে আজ গোটা ইসলামী বিশ্ব দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা নতুন প্রজন্মকে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক মনে করে। যেমন উপসাগরীয় দেশগুলো, মিসর, সুইডেন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ। আর দ্বিতীয় শ্রেণী, যারা সংখ্যায় কম, তারা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফরাসী ভাষাকে শিক্ষা দেওয়া পছন্দ করে। যেমন মরক্কো, সিরিয়া ইত্যাদি। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার এই হস্তক্ষেপের ফলাফল ১৯৯৫ সালে বৃটিশ একটি কমিটির মাধ্যমে প্রণীত “ইংরেজীর ভবিষ্যৎ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিশ্বের জনসনংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ কোন না কোনভাবে ইংরেজী ভাষায় কথা বলে। আর বিরাট একটি অংশ এই ভাষা শিক্ষাকে কঠোর বাস্তবতা মনে করে। ২০০০ সাল আসতে না আসতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকারীদের সংখ্যা এক'শ কোটি অতিক্রম করে যাবে। আর ইংরেজীই জীবনের সকল বিভাগের ভাষায় পরিণত হবে।[১৮৫]

---

১৮৫ । The Future of English, আল-আওলামাতুল লুগাবিয়া, ড. হুসাইন বিন জাওয়াদ আল-হাদ্দাদ প্রণীত-এর সৌজন্যে মাসিক আল বয়ান, সংখ্যা-১৭০।

## আরবী ভাষার ওপর ইংরেজীর প্রভাব

মিসরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের যুগ হতেই আরবী ভাষার বিরুদ্ধে (একটি ইসলামী ভাষা হিসেবে) আগ্রাসনের সূচনা হয়েছিল। সূচনালগ্নে "জর্জি যায়দান" ও তার মত অন্য প্রাচ্যবিদরা অত:পর প্রাচ্যবিদদের লালিত কিছু আরব সাহিত্যিকরা আরবী ভাষার বিরুদ্ধে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে নির্মূল করার জন্য শক্তিশালী তৎপরতা শুরু করেছিল। কোথাও কোথাও বিশুদ্ধ আরবী ভাষার পরিবর্তে সাধারণ ভাষাকেই আলস আরবী আখ্যায়িত করছিল এবং সবাইকে জীবনের সকল বিভাগে সর্ব সাধারণের ভাষাকেই ব্যবহার করার আহবান জানাচ্ছিল। আর বিশুদ্ধ আরবীকে কুরআন-হাদিস পর্যন্ত সীমিত রাখার, প্রচার ও ষড়যন্ত্র চলছিল। কোথাও কোথাও আরবী ভাষার লিখন পদ্ধতি পরিবর্তন করারও শ্লোগান উঠেছিল। সে সকল আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম উম্মাহ তার সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সম্পদ কুরআন হতে বঞ্চিত হয়ে যাক। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মাধ্যমে আরবী ভাষাকেও সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এজন্য তার সকল একক শব্দ ও বাক্য আজ পর্যন্ত সে অবস্থায়ই অবশিষ্ট রয়েছে।

নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে বর্তমান যুগে অন্যান্য ভাষারও কিছু কিছু শব্দ ও বাক্য ব্যাপক আকারে আরবীতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং আরবী মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমে তা ব্যবহৃত হচ্ছে, অথচ বিভিন্ন আরব দেশে এমন এমন সংগঠন-সংস্থা আছে যারা নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্য নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে এবং বিভিন্ন মিডিয়া ও মাধ্যমে তা ব্যাপক প্রচার করে। কিন্তু ইংরেজী প্রভাবিত আরব সাংবাদিক ও কলামিস্টরা ব্যাপকভাবে লেখনীতে আরবীর সাথে ইংরেজীর সংমিশ্রণ ঘটায়। এতদ্‌সত্ত্বেও আরব সংগঠন-সংস্থাসমূহের এক্ষেত্রে দৃষ্টি দেওয়া একটা উজ্জল পদক্ষেপ। আরবী ভাষার একক শব্দ ও বাক্যসমূহ ইংরেজী দ্বারা বেশী প্রভাবিত না হলেও কিন্তু বর্ণনাভঙ্গি, বাচন রীতি ও বাগধারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়েছে। একথা বললে ভুল হবে না, মিসরে ফরাসী অত:পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময় আরবী ভাষাকে সম্পূর্ণ ফরাসী ও ইংরেজী ধরণ ও কাঠামোতে ঢেলে সাজানো হয়েছিল।

আজকাল আরবী ম্যাগাজিন ও পত্র-পত্রিকায় ব্যবহৃত বাগধারা ও বাক্যে ইংরেজীর সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়- যদিও শব্দ বাক্য নিরেট আরবীই হোক না কেন। এজন্য যারা মনে করেন, আধুনিক আরবী ও পুরাতন আরবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং আধুনিক গদ্যকে আধুনিক আরবী আখ্যা দেওয়া মোটেই ঠিক

নয়। তাদের এ কথা একক শব্দের বেলায় ঠিক আছে। কিন্তু বর্ণনাধারা, বাচনভঙ্গি ও বাগধারার ক্ষেত্রে সঠিক নয়। এ হিসেবে আরবীর মধ্যে ইংরেজী ও অন্যান্য বাগধারা ও বাক্য আরবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে তা অন্যান্য অপরিচিত ভাষা হতে গ্রহণকৃত, ঘরের তৈরী নয়। আর দুই শতাব্দী পূর্বের সকল বাগধারা ও বাক্য আরবীর নিজের ঘরে তৈরী এবং কুরআনী ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

**আমরা হাতে গোনা কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি যা এই বাস্তবতা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট যে, আরবী ভাষা কী পরিমাণ ইংরেজী দ্বারা প্রভাবিত!**

**উদাহরণস্বরূপঃ** আরবী ভাষার একটি বাক্য 'লায়িবা দাওরান' (ভূমিকা পালন করা)। এই বাক্যটি সাংবাদিকতা ও অসাংবাদিকতা উভয় প্রকার লেখায় সাধারণত ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত ইংরেজী হতে নেয়া। ইংরেজী ভাষা এই অর্থ প্রকাশ করার জন্য Play the role ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে 'ছাজ্জালা ইনতিদারান' (বিজয় অর্জন করা) একে ইংরেজীতে বলা হয় Reard the victor। অনেক আরবী পত্র-পত্রিকায় 'মাদারুছছাআ' নামে একটি কলাম থাকে। যা একটি ইংরেজী বাক্যের হুবহু অনুবাদ। ইংরেজীতে এজন্য পত্র-পত্রিকায় Around The Clock ব্যবহৃত হয়। এতো সামান্য কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো, নতুবা আজকালের পেপার-পত্রিকার ভাষায় ব্যবহৃত আরবী বাক্যের অধিকাংশ ইংরেজী হতে গ্রহণকৃত। এ কারণেই একজন অনারব ব্যক্তির আরবীতে পারদর্শী হওয়ার জন্য ইংরেজী জানা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

ইংরেজীর পক্ষ থেকে কোন ভাষাকে গ্রাস করে ফেলাই বিশ্বায়নের নীতি-নির্ধারকদের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং ইংরেজীর সামনে অন্য কোন ভাষার অস্তিত্বই অসহনীয়। এজন্য এখন দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে যেখানেই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে আরবী ভাষা নির্মূল করার বাহানা তালাশ করা হচ্ছে। সুতরাং যখন থেকে ইরাকের ওপর মার্কিন দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকে মার্কিনীরা ইরাকী শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষাও লালন-পালনের দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে তুলে নিয়েছে। বুশ প্রশাসন ইরাকের পুনর্নির্মাণের মধ্যে সেখানের স্কুলের সিলেবাস প্রণয়নেরও পরিকল্পনা তৈরি করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গঠিত শিক্ষা এক্সিকিউটিভ কমিটি ইরাকের ওপর আগ্রাসনের দুই মাস পূর্বে জানুয়ারীতেই মার্কিন বংশোদ্ভুত ইরাকী ও মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ইরাকী স্কুলের জন্য নতুন সিলেবাস প্রণয়নে লেগে গিয়েছিল। সেই টিমের সদস্য এডওয়ার্ড উডসী বলেন,

তারা ইরাকের বর্তমান আরবী সিলেবাসের পরিবর্তে বিভিন্ন ভাষার সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন করছে।[১৮৬]

এ দ্বারা ভালভাবে অনুমান করা যায়, ইরাকী আরব শিশুরা যখন এই সিলেবাস পড়ে ভবিষ্যতের দরজায় পা রাখবে তখন সাধারণ কথাবার্তার জন্য যদিও সে মাতৃ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করবে, কিন্তু বিশুদ্ধ আরবী ভাষার ব্যাপারে সে অপরিচিত থাকবে এবং ইংরেজীকেই সে আদর্শ ও অনুসরণীয় ভাষা ধারণা করবে। ইরাকের পূর্বে আমেরিকা এই অভিজ্ঞতা আফগানিস্তানেও কাজে লাগিয়েছিল এবং ইরাকের পর যে সকল মুসলিম দেশের পালা আসবে সেখানেও এই পরিকল্পনা করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাচ্যের প্রতিটি শিশু ইংরেজী ভাষাকে ভাল না বাসবে, এর সেবকে পরিণত না হবে, ততক্ষন পর্যন্ত এই কর্মতৎপরতা ও কৌশল চলতে থাকবে।

## অন্যান্য ভাষার অস্তিত্ব বিপর্যয়ের মুখে

ভাষাগত বিশ্বায়নও ইংরেজী ভাষার দেশসমূহ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যেমনিভাবে বিভিন্ন পথ সুগম করেছে তেমনিভাবে এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সে সমস্ত ভাষা তার কথোপকথনকারীদের খোঁজে পেরেশান কিংবা তার আলোচনা শুধু কিছু পুস্তকের পাতা পর্যন্তই সীমিত। যে সমস্ত ভাষা অবশিষ্ট রয়েছে এবং স্বীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রাম করছে, তাও ইংরেজী দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। জাতিসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচীর একটি টিমের গবেষণা দ্বারা জানা যায় গোটা বিশ্বের প্রায় অর্ধেক আঞ্চলিক ভাষা পতনের পথে ধাবমান। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হলো-এই পরিস্থিতি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও পরিবেশ উভয়ের জন্য অনুতাপের! বিশ্বায়নের কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাচীন জাতিসমূহের সংরক্ষিত প্রাকৃতিক রহস্য, যেমন কিস্‌সা-কাহিনী, নভেল-নাটক, শিল্প-কারিগরী দক্ষতা ইত্যাদি চিরকালের জন্য অতি দ্রুত দাফন হয়ে যাবে।

গবেষকদের মতে ২৩৪টি সমকালীন ভাষা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে গেছে। আর পুরো বিশ্বের ৯০ শতাংশ আঞ্চলিক ভাষা একবিংশ শতাব্দীতে নির্মূল হয়ে যাবে। জাতিসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচীর চেয়ারম্যান ক্লাসটোবিফার সতর্ক

---

১৮৬। দৈনিক রাষ্ট্রীয় সাহারা (উর্দূ), নয়া দিল্লী, ১৩ই এপ্রিল ২০০৩ইং।

করেছেন, বিশ্ব বাজারে যে মুক্ত বাণিজ্যকে আমরা অর্থনৈতিক উন্নতির গ্যারান্টি মনে করছি, প্রকৃতপক্ষে এটাই অগণিত সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক ঐতিহ্যকে জীবন্ত প্রোথিত করে দেবে।[১৮৭]

গবেষণা কমিটি স্বীয় রিপোর্টে এ কথাও উল্লেখ করেছে, ৩২ শতাংশ আঞ্চলিক ভাষা এশিয়াতে পাওয়া যায়, ৩০ শতাংশ আফ্রিকাতে, ১৯ শতাংশ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, ১৫ শতাংশ আমেরিকা মহাদেশে এবং ৩ শতাংশ ইউরোপে পাওয়া যায়। আফ্রিকান দেশ কেনিয়া তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানে। সেখানে অনেক ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। কেনিয়াতে সর্বোচ্চ ৮৪৭টি ভাষা রয়েছে। তারপর ইন্দোনেশিয়ার স্থান, সেখানে ৬৫৫টি ভাষা রয়েছে। নাইজেরিয়াতে রয়েছে ৩৭৬টি ভাষা, ভারতে রয়েছে ৩০৮টি ভাষা, অষ্ট্রেলিয়াতে রয়েছে ২৬১টি, মেক্সিকোতে রয়েছে ২৩০ টি, কেমিনে রয়েছে ২০১টি, ব্রাজিলে রয়েছে ১৮৫টি, কঙ্গোতে রয়েছে ১৫৮টি, ফিলিপাইনে রয়েছে ১৫৩টি ভাষা।[১৮৮] এ সকল ভাষা বর্তমানে শুধু ইংলিশের কারণে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রাম করে যাচ্ছে এবং ক্রমেই পতনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। খুব নিকটে এমন সময় আসবে যখন তার ওপর মাতমকারীও কেউ থাকবে না এবং সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের মজলিসে হয়তো বা কখনো কখনো আলোচনার মাঝে মুখ দিয়ে এসে যাবে। আবার সেই আলোচনা তাদের মুখ দিয়েই হবে যারা পুরো বিশ্বের তাবৎ সংস্কৃতি নির্মূল করার প্রকৃত যিম্মাদার।

বস্তুবাদ ও জড়বাদের এ যুগে যে দ্রুততার সাথে মানুষের পরিবেশ ও তাদের জীবনে ইংরেজী ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটছে, তার অনুমান স্বয়ং মানুষেরও নেই।

গোটা বিশ্বে অর্থনৈতিক লাভের প্রেক্ষাপটে ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকারসমূহের নির্লিপ্ততার কারণে সরকারগুলোই এর জন্য দায়ী। সেখাকার জনগণের অসচেতনতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনষ্ট হওয়া এবং ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা হয়ে যাওয়ার পেছনে তারাই অনেকটা দায়ী। বৃটিশ ছাড়া সাধারণভাবে ইউরোপীয় জনগণ ইংরেজীর কঠোর বিরোধী, অথচ তাদের সভ্যতা ও ইঙ্গ-মার্কিন সভ্যতার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু সাদা চামড়ার ঐ প্রজন্মের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু সাদা চামড়ার ঐ

---

১৮৭। আল-আওলামাতুল লুগাবিয়া-মাসিক আল- বায়ন সংখ্যা-১৭০।

১৮৮। প্রাগুক্ত।

প্রজন্মের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের কোন বিষয় যদি থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে ভাষা। এজন্য কোন কোন ইউরোপীয় দেশে ২০০১সালের ৪ ফেব্রুয়ারী ভাষাগত বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে। The Globalist পত্রিকার কলাম লেখক আলেক্স বিয়ার বলেন, ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভের সময় মজার বিষয় এই ছিল যে, লোকেরা যে ফেস্টুন হাতে নিয়ে মিছিল করছিল তার ওপর বিশ্বাযনের বিরুদ্ধে ইংরেজী ভাষাতেই আবার বিভিন্ন বাক্য লেখা ছিল। তাতে লেখা ছিল, ইংরেজী বিশ্বায়নের পথে দ্রুত ধাবমান, অথচ এ বিষয়ে কারো অনুভূতি পর্যন্ত নেই।[১৮৯]

## বিভিন্ন জাতির আশংকা

ইংরেজী ভাষার বিশ্বায়নের জোরদার বিকাশ ও বিস্তারকে দেখে অনেক জাতির এই আশংকা সৃষ্টি হয়ে গেছে, যদি তারা নীরব ভূমিকা পালন করতে থাকে তাহলে একদিন তাদের ভাষা ইংরেজীর মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে এবং তাদের নিকট যে একক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রয়েছে তা নির্মূল হয়ে যাবে।

এ সকল জাতি মার্কিন সভ্যতার প্রসারকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে অতি সহজে অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তুত মনে হচ্ছে না। ফ্রান্স, জার্মানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ ইংরেজীর সীমাহীন প্রসারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সে দেশের জনগণ এক্ষেত্রে সরকারের কাঁধে কাঁধ মিলেয়ে চলার সংকল্প করছে এমন কি এ সকল লোক যারা নিজদেরকে স্বাধীন, মুক্ত, উদারপন্থী, সংকীর্ণ মনোভাবের বিরোধী ও প্রগতিপ্রিয় মনে করত এখানে এসে তারা সংকীর্ণমনা, পশ্চাৎপদ ও গোঁড়া হয়ে গেছে। কোন কঠিন প্রয়োজন যদি তাদেরকে ইংরেজী শিখতে বাধ্য করে তাহলে তা ভিন্ন কথা নতুবা তারা এই ভাষার কোন শব্দ পর্যন্ত বলা অপমান মনে করে। যারা ফ্রান্সের গলিতে ঘুরেছে, তারা ভালভাবে জানে, ফরাসী জাতির গোঁড়ামী এমন তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, ইংরেজীতে প্রশ্নকারী ব্যক্তি বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও তারা তাকে নিজের ভাষাতেই উত্তর দেয়, সে বুঝুক আর না বুঝুক এর সাথে তার সম্পর্ক নেই। তারা বিদেশী ব্যক্তিকে ইশারা-ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করলেও ইংরেজীর একটি

---

১৮৯। The Globalist, ৫/২/২০০১ইং।

অক্ষরও মুখে আনতে পছন্দ করে না, অথচ ফ্রেন্স ও মার্কিন ফরাসী সভ্যতার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

কারণ নারীর অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নের নামে যে নগ্নতা ও উলঙ্গপনাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈধ বলে, সে নগ্নতা ও উলঙ্গপনাকে ফ্রান্সও বৈধ বলে, বরং সমকামিতাকে ফ্রান্সেই সর্বপ্রথম আইনী মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং তা মানবাধিকার বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্য কোন ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের অনুসরণ করুক কিংবা না করুক, এক্ষেত্রে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স থেকেই পথনির্দেশ পেয়েছে এবং নিজ দেশে সমকামিতাকে আইনের মর্যাদা দিয়েছে, এমন কি ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্ত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত সমকামিতার বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাদের বার্ষিক বিশ্ব সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয় এবং যৌনতা ও নগ্নতা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মাঝে এই অভিন্ন ও একক সভ্যতা-সংস্কৃতি হওয়া সত্ত্বেও যখন ভাষার কথা আসে তখন ফ্রান্স এক শত্রুর ভূমিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে দাঁড়ায়। স্বীয় ভাষার হেফাযত ও ইংরেজীর সংমিশ্রণ থেকে বাঁচানোর জন্য ফ্রান্সের চেষ্টা-প্রচেষ্টার অনুমান তাদের নেতা-নেত্রীর চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং তাদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা থেকেই করা যায়। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক 'বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণে ল্যাটিন ভাষাভাষী দেশসমূহের কাছে আবেদন করেছিলেন, তারা ইংরেজী ভাষার আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হোক, একটি ঐক্য গড়ে তুলুক! সরবন ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারের উদ্বোধনকালে জ্যাক শিরাক বলেছিলেন, একটি আধিপত্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা এখানে একত্র হয়েছি এবং চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হয়েছি, যাতে আমরা ভবিষ্যতে জাতীয় ঐতিহ্য ও সম্পদ রক্ষা করতে পারি। এতে ফ্রান্স ও পর্তুগালের অতিথিরা অংশ গ্রহণ করেছিলন।

ফরাসী প্রেসিডেন্ট ল্যাটিন ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত ইতালীর জনগণকে পরামর্শ দিয়েছিলন, তারা এসোসিয়েশন অফ ফ্র্যান্সাইজেশন (ফরাসীকরনের একটি সংগঠন) পর্তুগাল ভাষাভাষী দেশসমূহের গ্রুপ মার্কিন স্পেনীশ এসোসিয়েশন-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে যাতে তাদের দেশের সংখ্যা ৭৯-এ দাঁড়ায়। যারা কোটি কোটি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে যারা ভাষা রক্ষার অভিলাষ রাখে।

জ্যাক শিরাক উল্লিখিত সকল সংগঠনের কাছে যৌথ ও সম্মিলিতভাবে জাতিসংঘে স্বীয় পরিকল্পনা পেশ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলেন এবং বিশ্ব সমাজে 'একাধিক ভাষার নীতি'র প্রতি জোরালো সমর্থন করেছিলেন। তিনি সেমিনারে অংশ গ্রহণকারীদেরকে ইনফরমেশন ও টেকনোলজির ক্ষেত্রে অধিক পুঁজি বিনিয়োগ, ইন্টারনেটে ল্যাটিন সংস্কৃতির পরিচিতি ও তার প্রচার-প্রসারের জন্য একটি সর্বব্যাপী ওয়েব সাইট কায়েম করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। পরিশেষে তিনি আশা প্রকাশ করেন, জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন 'ইউনেস্কো' একটি আন্তর্জাতিক ইশতিহার প্রকাশ করে একাধিক ও বহু সংস্কৃতির অধিকারকে নিয়মতান্ত্রিক স্বীকৃতি দেবে।[১৯০]

উল্লেখ্য, আজ থেকে ৩৩ বছর পূর্বে ফ্রান্স স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশের জন্য 'ফ্রান্সাইজেশন' নামক একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল। তার সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৫টি দেশ। এগুলো সে সকল দেশ যারা আংশিক কিংবা পরিপূর্ণভাবে ফরাসী ভাষায় কথা বলে। সে সময় এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বুট্রোস গালী। এই সংগঠন ২০-৩-১৯৭০ তারিখে নাইজারের রাজধানী নিয়ামীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি কালচার সীমাহীন বানিয়ে দেওয়া এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় ফরাসী সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো। কিন্তু বিশ্বায়নের মোকাবেলায় উক্ত সংগঠনটি দুর্বল হয়ে পড়ে। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে এসে ফ্রান্সাইজেশন আন্দোলন বিশ্বায়নের প্রতিরোধ করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল। অন্যথায় ফ্রান্সের ভাষাও বিশ্বায়নের কবলে পড়ে যেত। ফ্রান্সের এ প্রচেষ্টার দ্বারা অনুমিত হয়, ফরাসী জাতি স্বীয় ভাষা ও তথাকথিত সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য কী পরিমাণ সচেতন! সাধারণ পরিমন্ডল থেকে সরকারী পরিমন্ডল পর্যন্ত ফরাসী ভাষাকে ইংরেজীর প্রভাব থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং এ সেক্টরে বিরাট অংকের পুঁজি ব্যয় করা হচ্ছে। তাদের প্রচেষ্টার ফল হলো, ফ্রান্স (মার্কিন সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও) একটি পৃথক ও আলাদা সভ্যতার আকৃতিতে বিশ্ববাসীর সামনে আবির্ভূত হয়েছে। ফরাসী সংস্কৃতি একটি নীতি-নৈতিকতাহীন ও প্রকৃতিবিরোধী সংস্কৃতি হওয়া সত্ত্বে তা ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছে, অথচ এ সকল সভ্যতার মাঝে যদি কোন পার্থক্য থেকে থাকে তাহলে শুধু ভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। ফ্রান্সের পর জার্মানীর স্থান, যারা ইংরেজীর গন্ডি সম্প্রসারিত হওয়াতে ভীত-সন্ত্রস্ত

---

১৯০। ওয়েব সাইড আল-জাযীরা চ্যানেল http: / / www. Al jazeerh. net মঙ্গলবার।

এবং নিজেদের প্রিয় ভাষাকে ইংরেজীর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা নিজ ভাষাকে গর্বের কারণ মনে করে। এজন্য জার্মান ভাষার উপর আগ্রাসনকে নিজেদের জাতিসত্তার ওপর আগ্রাসন মনে করে।

জার্মানীর জনগণই আজ প্রায় এক দশক পূর্বে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে বার্লিন প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যকার দূরত্বকে নির্মূল করে নজীরবিহীন ঐক্যের প্রমাণ দিয়েছিল। আজ এ জনগণই ইঙ্গ-মার্কিন থেকে আসা ইংরেজীর চাদর পরা সংস্কৃতির সামনে একটি লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করতে চায়। যাতে তারা এই প্লাবন ও সয়লাব থেকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও ভাষাকে রক্ষা করতে পারে। জার্মানীর জনগণ যতই দিন যাচ্ছে ততই এই দাবীতে সোচ্চার হচ্ছে, আমাদের জাতীয় ভাষাকে অন্যান্য ভাষা, বিশেষ করে ইংরেজীর প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্য আইন পাস করা হোক। যাতে জার্মান ভাষা চিরকালের জন্য জীবন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু জার্মান ভাষাবিদদের মতে "ইংরেজীর পরিভাষাসমূহ তাদের জন্য একটি বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কারণে তাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে এবং তাদের সকল চিন্তা-ভাবনার গন্ডি গুটিয়ে ভাষা রক্ষা পর্যন্ত সীমিত হয়ে গেছে।"

তাদের দাবী, 'জার্মানীও ফ্রান্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলুক এবং এমন আইন প্রণয়ন করুক যার আলোকে লোকজন স্বীয় লেখা ও বিজ্ঞাপনে বিদেশী পরিভাষার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবে। এই স্পর্শকতার বিষয়টির অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও জার্মানীর সংস্কৃতি মন্ত্রী এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের পক্ষে নন। তবে তিনি জার্মান ভাষা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জোরালো ওকালতি করেন।[১৯১]

চীন হলো তৃতীয় দেশ, ভাষাগত বিশ্বায়নের ব্যাপারে সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে চিন্তা-ভাবনা করছে। চীনা বিশেষজ্ঞদের ধারণা, তরুণ ও যুব সমাজ মার্কিন ফিল্মে প্রচন্ড আগ্রহী হওয়ার কারণে তারা মার্কিন সভ্যতা দ্বারা খুব প্রভাবিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি চীনা বিশেষজ্ঞদের সংস্কৃতি নিয়ে ভাবতে বাধ্য করছে। তারা চীনা ভাষা রক্ষার জন্য সরকারের নিকট আইন পাস করার জোর আবেদন করেছে। সুতারং ২০০১ সালের জানুয়ারীতে এ ব্যাপারে একটি আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ আইনের আলোকে মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমগুলো প্রাচীন চীনা ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। আর বৃটিশ কলোনী হংকং-এ চীনা ভাষায় সূচিত পরিবর্তনের সাথে ভাষাকে ব্যবহার করা মারাত্মক অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়।[১৯২]

---

১৯১। রয়টার নিউজ এজেন্সী, আল জাযীরা টিভি চ্যানেলের সৌজন্যে ৫/৩/২০০১।

১৯২। আল আওলামাহ্ আল লুগাবিয়াহ, মাসিক আল বয়ান সংখ্যা-১৭০।

উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা সুস্পষ্ট যে, এ সকল দেশ ও সেখানকার জনগণ স্বীয় ভাষাকে কি পরিমাণ ভালবাসে, যার কারণে তারা স্বয়ং সরকারের কাজে ভাষা রক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের দাবী করে। অত:পর সে আইনকে কঠোরভাবে মেনেও চলে। কিন্তু দু:খের বিষয় আরবদের চিন্তা-চেতানা শুষ্ক হয়ে গেছে, যারা দুনিয়ার প্রাচীনতম ও সবচেয়ে বেশী ও ব্যাপক শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ ভাষার মালিক। আরবী ভাষার সাংস্কৃতিক গুরুত্বের চেয়ে দ্বীনী ও ধর্মীয় গুরুত্ব বেশী কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও সাধারণভাবে আরবী ভাষাকে বিদেশী-বিশেষ করে ইংরেজীর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার কোন সতর্ক ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টা করা হচ্ছে না।

দ্বীনের অনুভূতি ও মর্যাদাবোধ এবং ইসলামী শিক্ষার অলংকার থেকে বঞ্চিত পাশ্চাত্য পূজায় মত্ত এবং ইংরেজদের গোলামী ও দাসত্বের শৃংখলে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হওয়া আরব নেতারা কেবল স্বীয় প্রভুদের সন্তুষ্টির জন্য এমন আইন পাস করা হতে বিরত থাকে, যা আরবী ভাষার পূর্ণাঙ্গ রক্ষার গ্যারান্টি হবে। আজ আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের সামনে পরাজিত, অথচ মুসলিম উম্মাহ্ এমন এক ভাষার মালিক যার মধ্যে বিশ্বজনীনতার সবচেয়ে বেশী গুণাবলী বিদ্যমান এবং যা তার শব্দের আধিক্যের কারণে সকল পরিবেশে, সকল স্থানে খাপ খেয়ে চলতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রেও মুসলিম উম্মাহ অলসতা, গাফলতি ও নীরবতা প্রদর্শন করছে এবং স্বীয় ধর্মীয় ও দ্বীনী ভাষাকেও ইংরেজীর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারেনি।

## ভাষাগত বিশ্বায়নের প্রতিরোধ কিভাবে করা যাবে

মুসলিম উম্মাহকে তার দ্বীনী ভাষা (আরবী)-কে রক্ষার জন্য যে রকম সম্ভ্রমবোধ, মর্যাদাবোধ বরং দৃঢ়তার আশ্রয় নিতে হবে, যা বিগত কয়েক বছর ধরে ফ্রান্স ও জার্মানীর জনগণ নিয়ে আসছে। এই মূলনীতি শুধু আরবী ভাষাকেই রক্ষার জন্য নয়, বরং সে সব ভাষার ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য যে সব ভাষা আজ ইংরেজীর আগ্রাসনের শিকার হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। উর্দূ ভাষাকে যদিও ইসলামী ভাষা বলা না হয়, কিন্তু মুসলমানদের ভাষা অবশ্যই বলা হয়। এ দিক দিয়ে উর্দূভাষীদের ওপরও এই দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, তারা উর্দূ ভাষাকে বিদেশী ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে উর্দূর ব্যাপারেও সীমাহীন অলসতা প্রদর্শিত হয়েছে।

বরং হুবহু ইংরেজী শব্দকেই উর্দূতে অনুপ্রবেশ করানোকে সঠিক ও ভাল মনে করা হচ্ছে। আরবীর সাথে সাথে উর্দূকে রক্ষার জন্যও এই সম্ভ্রমবোধ, মর্যাদাবোধ ও দৃঢ়তার আশ্রয় নেওয়া অপরিহার্য। যে মর্যাদাবোধকে আমরা তথাকথিত উদারতা দ্বারা শেষ করে দিয়েছি। প্রয়োজনে এই দৃঢ়তা আমাদেরকে ফরাসী ও জার্মানীদের কাছ থেকে ধার নিতে হবে নতুবা এছাড়া যে কোনো ভাষার সংরক্ষণ সম্ভব নয়।

আমাদের নিকট উর্দূ কিংবা ফার্সীর চেয়ে বেশী গুরুত্ব আরবীর। কারণ আরবী সকল সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে একটি দ্বীনী ও ধর্মীয় সম্পদ, যাকে পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে আসা সকল ঝড় ও প্লাবন আজ গ্রাস করে ফেলেছে। এই ডুবন্ত কিশতী বাঁচানোর দায়িত্ব প্রত্যেক সচেতন মানুষের দ্বীনী কর্তব্য। আরবী ভাষাকে রক্ষায় আরবদের সাথে সাথে অনারবদেরও একই সাথে এগিয়ে আসতে হবে। ড. হুসাইন বিন জাওয়াদ আল হাদ্দাদ তার প্রবন্ধে এমন সমাধান উপস্থাপন করেছেন যা কার্যকর করল সম্ভবত আরবীকে এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। নিম্নে আমরা তাঁর প্রবন্ধে উপস্থাপিত কিছু প্রস্তাবের উল্লেখ করছি।

(১) বিশ্বের সে সমস্ত অঞ্চলে আরবী ভাষার প্রচলন নেই, সেখানে আরবী ভাষার প্রচার প্রসার করা হবে। এক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা মেনে চলা যেতে পারে:

(ক) আরব দেশে যে সমস্ত অমুসলিম ও অনারব সংখ্যালঘু রয়েছে তাদের মাঝে আরবীকে ব্যাপক প্রচার-প্রসার করতে হবে। উদারহণস্বরূপ মরক্কো। মরক্কো এমন একটি আরব দেশ যেখানের বিপুল সংখ্যক মানুষ আরবী ভাষা জানে না। এজন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের সাথে সাথে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও সেখানে আরবী ভাষার বিকাশ প্রচার-প্রসারের প্রয়োজন।

(খ) যে সমস্ত মুসলিম দেশে আরবী ভাষা বলা হয় না, যেমন ইন্দোনিশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইত্যাদি। এসব দেশেও আরবী ভাষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার করতে হবে। তাহলে এসব দেশে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ওঠানো প্রতিটি পদক্ষেপ সকলকাম হবে। কারণ এসব দেশের জনগণের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি প্রচন্ড জযবা ও চেতনা রয়েছে।

(গ) পশ্চিমা দেশসমূহে আরবী ভাষার বিস্তার ও প্রচার-প্রসারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কমপক্ষে পশ্চিমা দেশে বসবাসরত মুসলিম কমিউনিটিগুলোর মাঝে আরবী ভাষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

(২) আরব দেশে গ্রাম্য ভাষায় কথোপকথনকারীদের মাঝে বিশুদ্ধ আরবীর বিকাশ ও প্রচলন ঘটাতে হবে; কারণ উপসাগর থেকে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত যখন গোটা আরব বিশ্ব বিশুদ্ধ আরবীতে কথা বলবে তখন ইসলামী ঐক্যের পথে অন্তরায় উপজাতীয়, বংশীয় ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা কি বিদূরিত হবে না?

এ উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নের জন্য প্রয়োজন আমাদের আশপাশের পরিবেশে গ্রাম্য ও আঞ্চলিক ভাষা বলা কম করে দিতে হবে। মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যম গ্রাম্য ও অশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করবে না, বরং বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

(৩) লোকদের হৃদয়ে একথা বসিয়ে দিতে হবে, গ্রাম্য ভাষা ইসলামী ঐক্যের ক্ষেত্রে কোন বিপদ থেকে কম নয়। তার প্রমাণ প্রতিটি আরব দেশের গ্রাম্য ভাষা অন্য দেশ হতে এত ভিন্ন যে, মনে হয় প্রতিটি ভাষা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আলাদা ভাষা। এ কারণেই যদি ঘটনাক্রমে কোন স্থানে হিজাযী, লেবাননী ও আলজেরীয় তিন দেশের লোক একত্র হয় এবং তিনজনই গ্রাম্য ভাষায় কথা বলে, তাহলে একে অপরের কথা বোঝার জন্য তিনজনেরই দোভাষীর প্রয়োজন হবে। এ বাস্তবতা দ্বারা একথা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়, বর্তমানে প্রতিটি গ্রাম্য ভাষা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষায় পরিণত হয়েছে। "মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়াহ"-এর প্রধান ড. শউক্বী দাইফ তাঁর সংস্থার ৬৭তম বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনকালে বলেন, "যদি আরব নেতারা গ্রাম্য ও আঞ্চলিক ভাষার প্রসারের ওপরই জিদ ধরে থাকেন তাহলে আরব জাতির মাঝে যোগাযোগ ও সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। অথচ ইউরোপ, যেখানে বহু ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে, তারা আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঐক্যের প্রাচীর গড়ে তুলেছে। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

(৪) লোকদের মস্তিষ্কে একথা ঢুকিয়ে দিতে হবে, আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার জনগণের ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ আরবীর পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করবে সে বিশুদ্ধ আভিধানিক বিন্যাস ও শব্দ হতে দূরে সরে যাবে, তখন কুরআন-সুন্নহ বোঝা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে ইসলামের দুই ঝর্ণাধারা কুরআন-সুন্নাহ বোঝার পথে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

(৫) ইংরেজী ভাষার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ ও বিস্তারের ওপর লাগাম কষতে হবে। কমপক্ষে সে সব ক্ষেত্রে, যেখানে ইংরেজী ছাড়াও কাজ চলতে পারে,

সেখানে ইংরেজীতে কথা বলা যাবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আরব দেশগুলো তার প্রাথমিক স্তরের সিলেবাস থেকে নিয়ে ইউনিভার্সিটির সিলেবাস পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা আবশ্যকীয় ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্বে এমনও দেশ রয়েছে, যারা স্বয়ং নিজেদের ইজ্জত করে, স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ব করে। সাথে সাথে টেকনোলজি ও সাইন্সের ক্ষেত্রেও কারো থেকে পিছিয়ে নেই। কিন্তু সে সকল দেশ ইউনিভার্সিটির শিক্ষা স্তরেই কেবল ইংরেজী ঢুকিয়েছে, তারা জাতির নতুন প্রজন্মকে কোন বিদেশী ভাষা শিখতে বাধ্য করেনি। কিন্তু মুসলিম দেশের প্রতিটি স্কুলে যাওয়া শিশু প্রথম দিন হতেই বিদেশী ভাষা শিক্ষা শুরু করে এবং ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত স্বীয় পুরো শিক্ষা সফরের মাঝে সে বিদেশী ভাষাই শিখতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ফল এই দাঁড়ায়, এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার সংস্পর্শে থেকে তার হৃদয়ে এ আশার তরঙ্গ খেলতে থাকে যে, সে পশ্চিমা দেশ সফর করবে। সেখানে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে। একদিন সে নিজ দেশকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে কোন পশ্চিমা ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়।

(প্রকাশ থাকে, এমনিতেই সে নিজ দেশে থাকা অবস্থায় ইসলামী ও দ্বীনী প্রশিক্ষণ থেকে বহু দূরে অবস্থান করত এবং পশ্চিমা সভ্যতাকে গলায় জড়িয়ে থাকত, যেমনটি সাধারণত দেখা যায়। আর পশ্চিমা ইউনিভার্সিটিতে গেলে তো সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রবেশ করা অবধারিত।

কিছু লোকের ধারণা, বর্তমানে সাধারণ লোকদের ইংরেজী থেকে দূরে থাকা অসম্ভব, অথচ তাদের সামনে জাপান, ফ্রান্স, জার্মানী, চীন ইত্যাদি দেশের জ্বলন্ত উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে, যারা তাদের নিজস্ব ভাষার ওপর ভর করে উন্নতি-অগ্রগতির সকল সোপান অতিক্রম করেছে। অত:পর এটাও একটা বাস্তবতা যে, ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার অনেকটা দখল রয়েছে। যদি সে চায় তাহলে তার প্রয়োজন বেড়ে যাবে। আর যদি হ্রাস করতে চায় তবুও তা হ্রাস হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ কম্পিউটার ব্যবহার করা আজ একটি মানবিক প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যখন লোকজন কম্পিউটারের আরবী প্রোগ্রামের চাহিদা পেশ করল তখন কম্পিউটারের কোম্পানীগুলো আরবী প্রোগ্রাম বেশী পরিমাণে তৈরি করতে বাধ্য হলো। ফলে এসব লোকের ইংরেজীতে কম্পিউটারের পরিভাষা জানার আর কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকল না।

এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা ইচ্ছা করি তাহলে ইংরেজীর ব্যবহার কম করতে পারি। কিন্তু প্রয়োজন শুধু ইচ্ছা, সংকল্প ও সাহসের, অতঃপর তা বাস্তবায়ন করা।

(৬) লোকদের মস্তিষ্কে একথা বসে গেছে, উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও উন্নত চাকরীর জন্য ইংরেজী জানা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ ধারণা সরকার ও বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দূর করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

(৭) আরবী ইউনিভার্সিটির দায়িত্ব হলো, তারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত, রচিত জ্ঞানগর্ভ উপকারী পুস্তকগুলোর আরবীতে অনুবাদ করানোর ব্যবস্থা করবে, যাতে সেসমস্ত গ্রন্থ হতে আরবী ভাষাতেই উপকার লাভ করা সম্ভব হয়। ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই। অত:পর অনুবাদকও এমন হতে হবে যারা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিত। যাতে কিতাবের অনুবাদের সময় নেতিবাচক দিকগুলোর প্রতিকার করতে পারে।

(৮) শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকবৃন্দ, ইউনিভির্সিটির প্রফেসর, অধ্যাপক ও লেকচারারদের দায়িত্ব হলো তারা নিজেরাও বিশুদ্ধ ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করবে এবং ভবিষ্যতের নেতৃত্ব দানকারী নতুন প্রজন্ম যারা তাদের শিক্ষা গ্রহণ করছে তাদেরকেও আরবী ভাষার পন্ডিত বানাবে এবং একটি ভাষাগত বিপ্লব আনতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

(৯) স্কুল ও কলেজের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতে হবে, যার মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ লেখা, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া, গল্পসহ ভাষা ও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বিচরণ করার জন্য উৎসাহিত করবে।[১৯৩]

হুসাইন বিন জাওয়াদ-এর প্রবন্ধ হতে উল্লেখিত পয়েন্টগুলো নির্বাচন করা হয়েছে, যদিও পয়েন্টগুলো আরবী ভাষা ও আরব জনগণ সম্পর্কে। কিন্তু উল্লিখিত প্রস্তাবাবলীর আলোকে অন্যান্য ভাষাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। প্রবন্ধকারের মত আরো অনেক লোক রয়েছে যাঁরা ভাষানুরাগী, স্বীয় সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধকারী, স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাকারী এবং স্বীয় উজ্জ্বল অতীতের পদাংকে উজ্জ্বল ভবিষ্যত বিনির্মাণের সাহস ও বর্তমানে যুগের সবচেয়ে বেশী বিষয় অর্থাৎ দ্বীনী দৃঢ়তা যাঁদের অন্তরে

---

১৯৩। আল-আওলামাহ্ আল লুগাবিযাহ্ হুসাইন বিন জাওয়াদ আল-হাদ্দাদ প্রণীত, মাসিক আল- বয়ান ১৭০।

জাগ্রত আছে। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা আটায় লবণের সংমিশ্রন। সাধারণ পরিমন্ডল থেকে সরকারী পরিমন্ডল পর্যন্ত যদি উল্লিখিত সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে ভাষাগত বিশ্বায়নের প্রবাহমান সয়লাবের সামনে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব নতুবা সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন পশ্চিমা দেশের পক্ষ হতে আসা ঝঞ্ঝা প্রতিটি ছোট-বড় ভাষার মূলোৎপাটন করে দেবে এবং পানি মাথা হতে এ পরিমাণ উঁচু হয়ে যাবে, "প্রত্যেক তাতারী আগ্রাসনের পর হরমের নতুন মুতাওয়াল্লী মিলে যাবে" এর মত বাক্যের সত্যতা হতে লোকদের বিশ্বাস নির্মূল হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে সকল ভাষার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

## সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আসল টার্গেট মুসলমান

বিশ্বায়নের মাধ্যমে পরিচালিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের টার্গেট পাশ্চাত্য সভ্যতা ছাড়াও দুনিয়ার অন্যান্য সকল সভ্যতা-সংস্কৃতি, যার মধ্যে চীন এবং আফ্রিকার প্রাচীন ও ঐতিসাসিক সভ্যতা-সংস্কৃতিও অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে হতোপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু ডঃ মুহাম্মদ মাখযুন-এর ভাষায়, এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের টার্গেট কিছু কারণের ভিত্তিতে শুধু মুসলমান ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি। কারণ সমূহঃ

(ক) মুসলিম উম্মাহ বিশাল বস্তুগত সম্পদের অধিকারী। যেমন তেল, গ্যাস ইত্যাদি।

(খ) পশ্চিমাদের স্বীয় প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সেন্টার, ইউনিভার্সিটি ও প্রাচ্যবিদদের মাধ্যমে একথা ভালভাবেই জানা যায়, মুসলিম উম্মাহকে সে সময় পর্যন্ত পরাজিত করা যাবে না যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে ইসলামী স্বাতন্ত্র্যবোধ টিকে থাকবে। এজন্য মুসলিম জাতিকে অধীনস্থ করার একই পথ, আর তা হলো মুসলিম উম্মাহর একক ইসলামী স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সংস্কৃতি নির্মূল করে দিতে হবে এবং এ জাতির সেই বিপ্লবী ধর্মকে পরিবর্তন করে দিতে হবে, যে ধর্ম সকল ধরনের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করার শিক্ষা দেয়।[১৯৪]

(গ) ইসলামী শরীয়াহ্, তাহযীব-তামাদ্দুন এবং ইসলামী আকাইদ ও নৈতিক ব্যবস্থাই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের দর্শন ও তার বস্তুগত মূল্যবোধের জন্য সবচেয়ে

---

১৯৪। মাকিস আল-বয়ান (প্রবন্ধ) আল আওলামাহ বাইনা মনযূরীন, সংখ্যা ১৪৫ মাহে রমাযান, ১৪২০ পৃ. ১২৬।

বড় আতংক।[১৯৫] পশ্চিমাদের একথা ভাল করেই জানা আছে, যদি বিশ্বায়নের স্বপ্ন বাস্তাবায়ন করতে হয় তাহলে ইসলামকে টার্গেট বানিয়ে সেটাকে দুর্বল করে দিতে হবে এবং মুসলিম উম্মাহর হৃদয় হতে তাদের দ্বীনী শ্রেষ্টত্ব, মহাত্ম্য ও মর্যাদাবোধ নির্মূল করে দিতে হবে, যাতে পশ্চিমাদের পুরাতন স্বপ্ন পূরণ হতে পারে এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় শ্বেতাঙ্গদের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

## মার্কিন সভ্যতার এত শক্তি কিভাবে

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য পশ্চিমা, বিশেষ করে মার্কিন কালচার ও তাহযীব তামাদ্দুন গোটা বিশ্বে ব্যাপক। বাস্তবতা এই যে, আজ মার্কিন সভ্যতা খুব দ্রুত প্রসার লাভ করছে এবং অত্যন্ত ক্ষীপ্র গতিতে লোকজন তার প্রতারণার ফাঁদে আটকে যাচ্ছে, এমন কি মানুষ আজ ভাবতে বাধ্য হচ্ছে, সত্যিই কি মার্কিন সভ্যতা হৃদয়গ্রাহী ও মনোহরী, যা মানুষকে তার আকর্ষণ-চিত্তাকর্ষণ ও সৌন্দর্যের জাদুতে আচ্ছন্ন করছে আর মানুষ দলে দলে তার জীবন আচরণ দ্বারা নিজেদের ঢেলে সাজাচ্ছে? আর সত্যিই কি অপরাপর সভ্যতা নি মানের ও ফোঁকলা, যা আজকের উন্নত বিশ্বের পিছে পড়ে স্বীয় প্রভাব খুঁইয়ে ফেলেছে? পরিশেষে, জিজ্ঞাসা হলো, কি কারণ যার ভিত্তিতে মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতি গোটা বিশ্বে আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করে ফেলছে?

এর উত্তরে একথা বলা তো কখনোই ঠিক হবে না যে, মার্কিন সভ্যতা তার নিজস্ব সৌন্দর্যের কারণে আজ সাধারণ ও বিশেষত সর্বমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কারণ ভাসাভাসাভাবেও যদি মার্কিন সভ্যতার পর্যবেক্ষণ করা হয় তাহলে অনুমিত হয় যে, তার থেকে নি মানের ও ফোঁকলা আর কোন সভ্যতা নেই। তার ছায়ায় বিকশিতদের প্রকৃতির সাথে দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। তার বংশ ও খান্দানের সঠিক হবার দাবী করার অধিকার নেই, আর না কারো এর মধ্যে ইন্টারেস্ট আছে। নগ্নতা, উলঙ্গপনা ও যিনা-ব্যভিচারের মত প্রকৃতিবিরোধী বিষয়কে সে সমাজের লোকেরা গর্বের বস্তু মনে করে। ফ্যামিলী ও বংশ বলতে কোন শব্দ সে সমাজে মূল্যহীন। আত্মীয়তা ও পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, তা সত্ত্বেও এমন কিছু কারণ ও উপকরণ রয়েছে যার কারণে

১৯৫। আল আওলামাহ্ ড. সালেহ আল রাকাব, পৃ. ২৬।

মার্কিন সভ্যতা আজ গোটা বিশ্বাবাসীর লোলুপ দৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সে সমস্ত কারণ ও উপকরণের মধ্যে কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(১) গোটা বিশ্ব মার্কিন অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল, ইতোপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি, বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার পর বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বেশীর ভাগ মার্কিন নিয়ন্ত্রণে। প্রতিটি স্থানে মার্কিন পণ্য ও শিল্প খুব ক্ষিপ্র গতিতে প্রসার লাভ করছে। এমনিভাবে ঐতিহ্যগত শিল্প ও পণ্য, যেমন কাগজ, দোয়াত, যন্ত্রপাতি, প্রকাশনা শিল্প সমৃদ্ধ দেশও মার্কিন কজায়। এই অর্থনৈতিক আধিপত্য মার্কিন সভ্যতা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

(২) আধুনিক যোগাযোগ ও তথ্য সংশ্লিষ্ট শিল্প, যেমন কম্পিউটার শিল্প পূর্ণাঙ্গভাবে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে। এ শিল্পের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের জন্য কয়েক শতাংশ মাত্র বাদ দেওয়া যেতে পারে। চলচ্চিত্র নির্মাণ ও নাচ-গান-বাদ্যের ক্ষেত্রেও আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য রয়েছে। বিদেশী বাজারে মার্কিন চলচ্চিত্রের খুব চাহিদা রয়েছে। এই শিল্প টেলিভিশন ও স্যাটেলাইট চ্যানেলের ছত্রছায়ায় ধারাবাহিক উত্থানের পথে ধাবমান এবং আধুনিক টেকনোলজি ও প্রযুক্তির সাহায্যে আজ প্রায় বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে "ইউনেস্কো" নামক সংগঠনের মাধ্যমে পেশকৃত পরিসংখ্যান দ্বারা এ তথ্য জানা যায়। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, সিরিয়াতে আরবী টেলিভিশন নেটওয়ার্কের এক-তৃতীয়াংশ প্রোগ্রাম বিদেশী। আর তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়ায় প্রচারকৃত অর্ধেক প্রোগ্রাম মার্কিনী। লেবাননের টেলিভিশন নেটওয়ার্কের অর্ধেকের চেয়ে বেশী প্রোগ্রাম বিদেশী। সম্মিলিতভাবে গড়ে ৮৫.৫ শতাংশ প্রোগ্রাম বিদেশী হয়ে থাকে। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয়, বরং এ ধরনের অধিকাংশ প্রোগ্রাম ভাষান্তর ছাড়াই প্রচার করা হয়। আর শিশু বিষয়ক দুই-তৃতীয়াংশ প্রোগ্রাম তো ইংরেজী ভাষাতেই প্রচার করা হয়।[১৯৬]

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেসব তরুণ ও যুবকের জন্য নিজ দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোর দরজা খুলে দিয়েছে, যাদের হাতে থাকবে আগামী দিনে সমাজ ও দেশের নিয়ন্ত্রণ রশি, যারা হাতে তুলে নেবে জাতির নেতৃত্ব, যাতে এ সকল

১৯৬। দৈনিক আল-আহরাম (প্রবন্ধ), আস-সাকাফাতুল আরাবিয়া ফী আসরিল আওলামাহ্ ড. আব্দুল ফাত্তাহ্ আহমদ, ২২/২/২০০১।

তরুন ও যুবক মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জন করে মার্কিন কালচার নিয়ে নিজ দেশে ফিরে আসে এবং সেখানে মার্কিন কালচারের বিকাশ ও বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

উল্লিখিত কারণ ও উপকরণের ভিত্তিতে আজ সবাই মার্কিন কালচারকে অনুসরণীয় মনে করছে এবং প্রকৃতিবিরোধী এই সংস্কৃতি গ্রহণ করাকে সবাই প্রাধান্য ও আগ্রাধিকার দিচ্ছে। উল্লিখিত এ সকল কারণ মার্কিন সংস্কৃতিকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সক্রিয় বানিয়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে সে সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতি যা তার পশ্চাদপদতা ও প্রাচীনতার সাথে সাথে স্বভাব ও প্রকৃতি এবং মানুষের প্রকৃত মেযাজ ও রুচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন কি সে তার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের কারণে এক কালে বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে, সে সভ্যতা বস্তুবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে একটি নিঃ ও ফোঁকলা সভ্যতার সামনে দুর্বল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আর এমনটি হবেই না বা কেন? কারণ প্রাচীন সভ্যতার অনুসারীরা তাদের উত্তরাধিকারী পুঁজি ও সম্পদের প্রচার-প্রসার, বরং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করেনি যা তাদের করা উচিত ছিল। তারা এই মহাসম্পদকে তুচ্ছ মনে করে বস্তু পূজার শিকার হয়ে গেছে।

গোটা অর্ধ জাহানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানদের শাসন ছিল। আর আজও মুসলমানদের একটি বিপুল সংখ্যা রয়েছে, কিন্তু তাদের প্রতিটি দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কালচার আলাদা আলাদা। ইসলামী সভ্যতা একটি সীমিত ভূ-খন্ডে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে, অথচ এর উল্টো মার্কিন কালচার গোটা বিশ্বে বড় শৌর্য-বীর্যের সাথে বিকশিত ও বিস্তৃত হচ্ছে। স্বয়ং ইউরোপীয় সভ্যতাও আজ মার্কিন সভ্যতায় প্লাবিত হয়ে গেছে। সম্ভবত এমন কোন দেশ বাকী নেই যেখানে এই সয়লাব ধ্বংসকারিতা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু মার্কিন জাতি এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে তাদের অধিকার মনে করে। তারা মনে করে, দুনিয়াতে তাদের যে বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতে তারা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি পুরো বিশ্বে চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে। সুতরাং কলম্বো ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রফেসর এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা ডেভিডরো শিকুইফ বলেন "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার কালচার ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার এবং অন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মূল করার জন্য আন্ত র্জাতিক ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি তথা তথ্য-প্রযুক্তির ওপর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। আর এটা মার্কিন জাতির অধিকার। কারণ মার্কিন জাতিই

সবচেয়ে বেশী ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশী ক্ষমাশীল। মার্কিন জাতি বিশ্ব নেতৃত্বের সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত ও ভবিষ্যতের সর্বোত্তম নমুনা।"[১৯৭]

মিঃ আউসহ্যাব বলেন, "মার্কিন জাতির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, পুরো ভূ-খন্ডকে স্বীয় নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসা এবং মার্কিন সাংস্কৃতিক আধিপত্য আরো বিস্তার করা। পশ্চিমা সংস্কৃতি মোকাবেলায় এশিয়ান টাইগার্স কে (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড) আপন শক্তিতে খুব দ্রুত ও জোরদারভাবে নিজস্ব সংস্কৃতি পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন।[১৯৮]

## সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন সম্পর্কে চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মতামত

প্রসিদ্ধ মার্কিন বিজ্ঞানী নাউম চমস্কি বলেন, "সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এটা পুরো বিশ্বে মার্কিন আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়ার একটি অগ্রসরমান পদক্ষেপ।"[১৯৯]

বুলগেজার বলেন, "বিশ্বায়ন জাতীয় সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করার নাম। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি উদ্দেশ্য এবং শুধু পশ্চিমা সংস্কৃতিকে বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেওয়া।[১০০]

ড. আব্দুল ফাত্তাহ আহমদ আল-ফাবী বলেন, "বিশ্বায়ন জাতীয় ও আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে একটি আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করার নাম, বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস ও সকল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটি প্রচন্ড আগ্রাসন। আর এর একমাত্র টার্গেট ইসলামী সভ্যতা।"[১০১] জার্মানীর ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুরাদ হফম্যান বলেন, "বিশ্বায়ন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা ও ইসলামের উন্নত মূল্যবোধকে ঘায়েল করার জন্য একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন। এই আন্দোলনের সবচেয়ে ভয়াবহ হাতিয়ার যৌনকামিতা, বস্তুপূজা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের মাধ্যমে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা।[১০২]

---

১৯৭। আল-ইসলাম ওয়াল আওলামাহ্ পৃ.১৩।

১৯৮। প্রাগুক্ত, দিরাসাতু হাওলাল বু দিস্তারীখি মুঅসির লিমাফহুমিল আওলামাহ্ পৃ. ৫ এর সৌজন্যে।

১৯৯। আল-আওলামাহ্ বায়না মনযূরীন, মাসিক আল-বয়ান সংখ্যা-২৭।

১০০। আল-মাজমাউল আরাবি লিল মুহাসিবীনাল কূনূনীন, পৃ. ৩৮।

১০১। আস-সাকাফাতুল আরাবিয়া ফী আসরিল আওলামাহ্, নৈদিক আহরাম, ২২/২/০১।

১০২। আল আওলামাহ্ বায়না মনযূরীন মাসিক আল বয়ান সংখ্যা ১৪৫-১৯৯৯।

## ইসলামী বিশ্বের শিক্ষা নেওয়া উচিত

তবে এমন কিছু দেশও রয়েছে, যারা বিশ্বায়নের প্রতিরোধের জন্য সামনে অগ্রসর হচ্ছে। তারা এই সয়লাবের ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে অনুমান করে ফেলেছে। তারা এই সয়লাবের উত্তাল তরঙ্গে হারিয়ে যেতে চায় না। তারা স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কালচালরকে সংরক্ষণ করতে চায়। এমনই একটি দেশ ফ্রান্স, যা স্বীয় সাংস্কৃতিক সম্পদকে বাঁচানোর জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও অন্যান্য জাতির তুলনায় তার সভ্যতা তেমন একটা মূল্যবান নয় এবং মার্কিন সংস্কৃতি হতে ততটা ভিন্ন নয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বিস্ময়কারভাবে সে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের প্রতিরোধকারীদের মধ্যে শীর্ষ স্থানে। বিষয়টি ফ্রান্সের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা ও বক্তব্যের আলোকে ভাল করেই অনুমান করা যায়। ফ্রান্সের আইনমন্ত্রী জ্যাক কোবান বলেন, বর্তমান যুগে ইন্টারনেট সাম্রাজ্যবাদের একটি নতুন রূপ। সুতরাং যদি আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকি তাহলে আমাদের জীবন আচরণ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। এজন্য ফরাসী জাতি এ কথায় একমত হয়েছে, মার্কিন সভ্যতার প্রভাব থেকে ফরাসী সভ্যতা ও ভাষাকে রক্ষার সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[১০৩]

বরং প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক তো ফ্রান্সে মার্কিন রেস্টুরেন্ট ম্যাকডোনাল্ড খোলারও কঠোর বিরোধী। তিনি বলেন, "যদি পরিস্থিতি এই হয় তাহলে ফ্রান্সের জীবন-আচরণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শুধু আইফেল টাওয়ারই বাকী থাকবে।[১০৪]

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর অধিবেশনে ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করে বলেন, "আমাদের বড় আশ্চর্য বোধ হয়, সে সমস্ত দেশই বিভিন্ন জাতিকে স্বাধীনতার শিক্ষা দেয় যারা স্বয়ং নিজেরা জুলুম-অত্যাচারের স্টিম রোলার চালায়। সে সমস্ত দেশ চায় গোটা বিশ্বের ওপর এক সার্বজনীন আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে। নি:সন্দেহে এটা সম্পদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাম্রাজ্যবাদের এক কুৎসিত চেহারা! এই সাম্রাজ্যবাদ ভূ-খন্ড দখল করবে না, বরং বিবেককে মৃত বানিয়ে দেবে। চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণাকে স্থবির করে দেবে।"[১০৫]

---

১০৩। প্রাগুক্ত।

১০৪। আল আওলামাহ্ আমামা আলমিয়াতিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া, ড. ওমর আলহাজী প্রণীত, পৃ.৫১।

১০৫। প্রাগুক্ত।

ফ্রান্সের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এ সমস্ত বক্তব্য দ্বারা একথা সহজে অনুমেয়, ফরাসী জাতি তাদের কালচার ও সভ্যতা-সংস্কৃতি রক্ষায় কী পরিমাণ সচেতন। অথচ মার্কিন ও ফরাসী সভ্যতার মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই! শুধু ভাষার পার্থক্য। কিন্তু মতবিরোধ এত কঠিন যে, ফ্রান্সে কেউ ইংরেজী ভাষা জানলে তা বলা পছন্দ করে না, বরং ইংরেজী ভাষায় কথোপকথনকারীকে হোক সে বিদেশী, ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। সেখানকার রাজনৈতিক নেতারাও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের সম্মুখে ফরাসী ভাষাতেই বক্তৃতা-বিবৃতি ও সাক্ষাতকার দেয়।

কিন্তু ভাবনা যদি কোথাও শুষ্ক হয়ে যায় তাহলে তা হলো ইসলামী বিশ্বে। ইসলামী বিশ্ব তার প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সভ্যতা রক্ষার জন্য কোনই প্রচেষ্টা করছে না! মুসলমানদের ফরাসী জাতির কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। এখন তাদের স্বীয় সভ্যতা রক্ষার খাতিরে সিদ্ধান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বরং এ ব্যাপারে যদি গোড়ামিরও প্রয়োজন হয় তাহলে তার আশ্রয় নিতে দ্বিধা ও কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়। পানি যদিও প্লাবিত হয়ে মাথার ওপরে ওঠে গেছে কিন্তু ডুবন্ত ব্যক্তির জন্য সে সময় খড়-কুটার আশ্রয়ও যথেষ্ট। অতএব, সাংস্কৃতিক সয়লাবে ডুবন্ত মুসলিম জাতির এখন কমপক্ষে সে খড়-কুটার অনুসন্ধানেই লেগে যাওয়া উচিত যার সাহায্যে সে নিরাপদে কিনারায় ও তীরে পৌঁছতে পারবে।

OOOO

পঞ্চম অধ্যায়

# সামাজিক ও নৈতিক বিশ্বায়ন

## পরিবার ও সমাজ

সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ-এই তিনটি শব্দ বাহ্যিক দৃষ্টিতে একে অপরের নিকটবর্তী মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তিনটিরই ক্ষেত্র আলাদা আলাদা। সংস্কৃতির অর্থ ও তার বিষয়াবলী আলাদা। সভ্যতার অর্থ ও তার বিষয়াবলী আলাদা। আর সমাজের অর্থ ও তার বিষয়াবলীও আলাদা। বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা যখন মানব তৈরি করলেন তখন তার জন্য কিছূ আইন-কানুনও নির্ধারণ করলেন, যা মেনে চলা তার জন্য অপরিহার্য। তাকে একাকী ও নি:সঙ্গ জীবন যাপন করার পরিবর্তে দাম্পত্য জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করলেন যাতে একদিকে বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যও পূরণ হয়, অপর দিকে জীবনের নি:সঙ্গতাও দূর হয় এবং তার একজন কল্যাণকামী জীবনসঙ্গীও সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দানকারিণী মিলে যায়। সুতরাং মানুষ নি:সঙ্গ জীবন থেকে দাম্পত্য জীবনে যখন পদার্পণ করে, তখন সে অনেক নতুন নতুন সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বিবাহের পূর্বে সে কারো সন্তান এবং কারো ভাই-ভাতিজা প্রভৃতি ছিল। এখনো বিবাহের পর সে কারো স্বামী, কারো পিতা এবং কারো জামাই হয়ে গেল। এভাবে একজন ব্যক্তি হতে একটি পরিবার গঠিত হয়। আর কয়েকটি পরিবার মিলে গঠিত হয় একটি সুশীল সমাজ। এজন্য আমরা বলতে পারি, পরিবার সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, আর ব্যক্তি পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ, যেমনিভাবে ব্যক্তি ছাড়া পরিবারের কল্পনা অসম্ভব তেমনিভাবে পরিবার ছাড়াও একটি সমাজের পরিকল্পনা অসম্ভব। এই সাইন্টিফিক বিন্যাসের ফল হলো যদি ব্যক্তির মধ্যে কোন অনিষ্ট ও রোগ-ব্যাধি পাওয়া যায় তাহলে সে সমাজের ওপর সরাসরি তার প্রভাব পড়ে। এমনিভাবে পরিবারে যদি রোগ-ব্যাধি ও অন্যায়-অপরাধ প্রবেশ করে তাহলে সমাজে তা সংক্রমিত হবেই।

ইতিবাচক ভঙ্গিতে এভাবে বলা যেতে পারে, ব্যক্তি সৎ হলে পরিবার সৎ হবে এবং পরিবার সৎ হলে সমাজও সৎ ও সুশীল হবে। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। মানব জীবনের জন্য এই তিনটি

বস্তু অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা তথা বিশ্বায়ন আন্দোলন স্বীয় উদ্দেশে তখনই পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করতে পারবে যখন মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগে তার অনুপ্রবেশ ঘটবে। এজন্য সর্বপ্রথম বিশ্বায়ন রাজনীতিতে পা রাখে, তারপর অর্থনীতির রাস্তা ধরে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কালচারের প্রতি হস্ত সম্প্রসারণ করে। তারপর এক পর্যায়ে সমাজের ওপর আগ্রাসন চালায়। এভাবেই সে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশ্বায়নের পর সামাজিক বিশ্বায়নের দিকে পা বাড়ায়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এই সামাজিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য গোটা বিশ্বে পশ্চিমা সামাজিক রীতিনীতির বিকাশ ও বাস্তবায়ন করা এবং পশ্চিমা মূল্যবোধ ও পশ্চিমা চরিত্রের আধিপত্য ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বাস্তবতা এই যে, যখন সমাজের বিশ্বায়ন হয়ে যাবে তখন এর ফলে নৈতিকতার বিশ্বায়ন নিজে নিজেই হয়ে যাবে।

বিশ্বায়ন চায় নৈতিকতার পতন ও অবক্ষয়ের এই যুগে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নীতি-নৈতিকতাহীন জাতির অপবিত্র নীতি-নৈতিকতা গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিতে এবং জাতি যেন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একটি সৎ ও সুশীল সমাজ বিনির্মাণে ব্যর্থ হয়ে যায়, বরং জাতি যেন কোন সমাজ বিনির্মাণের কষ্ট করতেও প্রস্তুত না হয়। কারণ তার সমাজ হবে পশ্চিমা দেশে বিনির্মিত "ইম্পোর্টেড" সমাজ। আসুন! এবার আমরা দেখি বিশ্বায়ন সমাজকে কিভাবে বিশ্বকরণ করে? সে উপায়-উপকরণগুলো কী, যা দ্বারা সামাজিক বিশ্বায়ন সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে?

## সামাজিক বিশ্বায়নের একমাত্র মাধ্যম

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, ব্যক্তি পরিবারের কেন্দ্রীয় উপাদান। আর পরিবার সমাজের বুনিয়াদ। এজন্য পশ্চিমারা চিন্তা-ভাবনা করল, সমাজ পরিবর্তনের জন্য পরিবারে প্রভাব ফেলা একান্ত প্রয়োজন। সমাজকে পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য পরিবারকে সকল দ্বীনী, ধর্মীয়, নৈতিক ও দেশীয় সীমারেখা হতে মুক্ত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যের জন্য সে পরিবারের অংগ তথা 'ব্যক্তি'র প্রতি হস্ত সম্প্রসারিত করল, ব্যক্তির মধ্যে পুরুষের মত নারীও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সে সামাজিক বিশ্বায়নের বিনির্মাণে নারীর আশ্রয় নিল। তাকে ব্যবহার করে 'পরিবার' ও তার অধীনস্থ সকল চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধ পদদলিত করার প্রচেষ্টা করল। বিশ্বায়নের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ ইসলাম। এজন্য নারীর সহায়তায় পশ্চিমাগোষ্ঠী ইসলামের ওপরেই সবচেয়ে বেশী আঘাত হানতে শুরু করল।

মুসলিম নারীকে এই ধারণা দেওয়া হলো, সে ইসলামী সমাজে একজন মজলুম। তার বৈধ অধিকার সে পাচ্ছে না। ইসলাম নারীর ওপর পর্দার বিধান দিয়ে তাকে পুরুষের গোলাম ও দাসীতে পরিণত করেছে। ইসলামে নারী-পুরুষের মাঝে কোন সাম্য নেই। সুতরাং নারী জাতির উচিত পশ্চিমা সমাজের ক্রোড়ে চলে আসা, যে সমাজ ঐ সকল (তথাকথিত) অন্যায়-অপরাধ হতে মুক্ত, নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দান করে ইত্যাদি। পরিবার ও সমাজ বিনির্মাণে পুরুষের তুলনায় নারীর ভূমিকা অনেক বেশী। এজন্য ইসলামী সমাজের অস্তিত্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য পশ্চিমাগোষ্ঠী নারীর মাধ্যমে স্বীয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করল। তার অনুমান এভাবে করা যায়, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আলজেরিয়ার সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য সেখানে সেনাবাহিনীর মধ্যে ধর্মহীনতা ছড়িয়ে দিল। কিন্তু তারপরেও সে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়নি। সুতরাং ফ্রান্স একজন সমাজবিদ-রোজিয়া মোবিনিয়ার সহায়তা গ্রহণ করল। রোজিয়া মোবিনিয়া আলজেরিয়ার শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে ঘুরে সেখানকার সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর ফরাসী সরকারকে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্টে তিনি বলেন, যদি তোমরা আলজেরিয়াকে ধ্বংস করতে চাও তাহলে তার জন্য নারীই হলো মোক্ষম অস্ত্র। সেখানকার নারীরা ইসলামী মূল্যবোধের রক্ষক। যদি তোমরা তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরাতে সফলকাম হও তাহলে মনে কর তোমরা স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জন করে ফেলেছো।"[১০৬]

এই সমাজতত্ত্ববিদের উক্ত রিপোর্ট শুধু ফ্রান্সেরই সংবিধান হয়নি, বরং গোটা পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামকে নির্মূল করার জন্য উক্ত রিপোর্ট নিজেদের কৌশল ও পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সুতরাং নারী হাতিয়ার দ্বারা ইসলামের ওপর আক্রমণ চালানো এবং ইসলামী সমাজের মজবুত প্রাচীর ধ্বংস করার জন্য পাশ্চাত্য জগৎ তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেঃ

(১) ইউরোপ ও আমেরিকার পক্ষ হতে নারীদের আঞ্চলিক, সোস্যাল ও সেক্যুলার সংগঠন ও প্রতিষ্ঠনগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা, যার উদ্দেশ্য বস্তুগত উপকরণ ব্যবহার করে নারী সমাজকে পথ ভ্রষ্ট করা এবং সঠিক রাস্তা হতে তাদের দূরে সরানো। সুতরাং পশ্চিমা জগৎ এ ধরনের নারীবাদী সংগঠনগুলোকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মিসর, জর্দান ও তিউনিসিয়ায় নারীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা নারী স্বাধীনতার স্লোগান তোলে, এদেরকে তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য

১০৬। প্রবন্ধ, ২০০ মিলিয়ন ডলার লিমুখাতীরিল আখলাকী, মাসিক আশ-শাকায়েক, সংখ্যা ৬৮, ১৪২৪ হিঃ সফর।

জাতিসংঘের পক্ষ হতে ২০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেওয়া হয়।[১০৭] ফিলিস্তিনে অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংসের শিকার, বেকারত্ব ব্যাপক, লোকদের নিকট খাবার কিছু নেই, যারা জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ, যাদের অর্থনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণ বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় শুধু পশ্চিম তীরের নারীবাদী সংগঠনগুলোকেই পশ্চিমাদের পক্ষ হতে বার্ষিক ৭০ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছিল যা শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে দেয়া সাহায্যের দুই গুণ।

ঐ অঞ্চলে ১৮০০ সরকারী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও অফিস বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে নারীদের সক্রিয় সংগঠনের সংখ্যাই প্রায় ১২০০।[১০৮] রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত মুসলিম ফিলিস্তিনের নারীবাদী সংগঠনগুলোকে পাশ্চাত্যের পক্ষ হতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নিশ্চিতভাবে এ কথাই প্রমাণ করে, পাশ্চাত্য সামাজিক বিশ্বায়নের বিকাশ ও বিস্তারের জন্য সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নারী সমাজকে বস্তুবাদের জালে আবদ্ধ করে সমাজ ও নারীদের ধ্বংস করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

আর এই প্রয়াসে তারা অনেকটা সফলকামও। সে মতে এই প্রচুর আর্থিক সহযোগিতার প্রভাব ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে সম্মেলনে মুসলিম নারীদের বিরাট প্রতিনিধিত্ব ছিল। উক্ত সম্মেলনের সুপারিশমালা অধ্যয়ন করলে ভালভাবেই অনুমান করা যায়, পাশ্চাত্য মুসলিম দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে কিভাবে বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে।

কনফারেন্সের প্রস্তাবাবলীর মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল, মেয়ে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে তখন তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। তার স্বাধীন কর্মকাণ্ড থেকে তাকে বাধা দেওয়ার বা বিরত রাখার অধিকার পিতা-মাতা কিংবা অন্য কোন অভিভাবকের থাকবে না।[১০৯]

(২) নারী সমাজকে পথভ্রষ্ট করার জন্য পশ্চিমাদের দ্বিতীয় কর্মকৌশল হলো মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং নারীদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি করানো। এই কৌশলের মাধ্যমে পশ্চিমা সমাজ নারী জাতির ইজ্জত-সম্ভ্রম ও মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। মুসলিম দেশগুলোকে তাদের ঋণ মাফ করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাদেরকে এসব বিষয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে এবং তাদের দেশে এ চুক্তি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করা

---

১০৭। প্রাগুক্ত

১০৮। প্রাগুক্ত

১০৯। প্রাগুক্ত

হয়েছে। অন্যথায় চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকারকারী দেশগুলোকে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে। আর জাতিসংঘের সংবিধান অনুযায়ী মানবাধিকার লংঘনকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিস্বরূপ অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হবে। এ সমস্ত চুক্তির মাধ্যমে জনমত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলিম নারীদের একথা বোঝানো হয়েছে, তারা জুলুম-অত্যাচারে পিষ্ট হচ্ছে। এ সব চুক্তি দ্বারা তাদের উপর পরিচালিত যুলুম অত্যাচার নির্মূল করা হবে।[১১০] জাতিসংঘ নারী সমাজকে সামাজিক বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দিয়েছে, অথচ বাস্তবতা এই যে, বিশ্বায়নের ক্রীড়নক প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ সমাজ ও নারী জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। এ সকল চুক্তি দ্বারা নারী সমাজের জুলুম-অত্যাচার নির্মূল হওয়ার পরিবর্তে তার মাহাত্ম্য ও সতীত্ব আরো ভূলুণ্ঠিত হবে এবং তার পবিত্রতা ও আভিজাত্য নির্মূল হবে।

(৩) জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনসমূহ নারী সমাজকে ধ্বংস করার পশ্চিমাদের তৃতীয় কৌশল। এসব কনফারেন্সের একমাত্র উদ্দেশ্য, মানব সোসাইটি, বিশেষ করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা। ইসলামী দেশে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধগুলো অধ্যয়ন করলে জানা যায়, এসব সম্মেলনের একমাত্র উদ্দেশ্য নারী জাতিকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা থেকে দূরে সরানো, যে সমাজের বুনিয়াদ নারীর প্রকৃতি, সতীত্ব, তার আভিজাত্য ও পবিত্রতার ওপর। জাতিসংঘ নারী সমাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব ও দৃষ্টি দিয়েছে, সে নারী জাতির জন্য বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনও কায়েম করেছে, যার উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশে কনফারেন্স ও সম্মেলন অনুষ্ঠান করা এবং সামাজিক বিশ্বায়নের পথে সূচিত সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করা। যেহেতু এ সকল উদ্দেশ্য অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, তাই প্রতিটি পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর পূর্ণাঙ্গ গুরুত্বের সাথে কাজ করার জন্য জাতিসংঘ বিভিন্ন পৃথক পৃথক কমিটি ও সংগঠন-সংস্থা কায়েম করেছে।

## জাতিসংঘের নারী বিষয়ক প্রতিষ্ঠান

নিম্নে আমরা জাতিসংঘের এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করছি যেসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নারী বিষয়ক কনফারেন্স করায় এবং এ বিষয়ে পরিবেশ-পরিস্থিতি সুগম করে। সে সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিষ্ঠান: (ক) জাতিসংঘ

১১০। আল-আওলামাহ, ড. সালেহ আর রাকাব, পৃ. ৩৪।

মহিলা কাউন্সিল, (খ) জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল,[১১১] (গ) জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল, (ঘ) জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী, (ঙ) আন্তর্জাতিক নারী উন্নয়ন গবেষণা ও ট্রেনিং সেন্টার, (চ) লীগ অফ ইউনাইটেড নেশস্‌ন, (ছ) জাতিসংঘ সামাজিক গবেষণা সেন্টার, (জ) নারী সমাজের প্রতি বৈষম্য আচরণ নির্মূল কমিটি, (ঝ) জাতিসংঘ শিশু সংস্থা, (ঞ) জাতিসংঘ মানব বসতি সংস্থা ও (ট) জাতিসংঘ জ্ঞান প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। এই শেষোক্ত সংস্থাটি ইউনেস্কো নামে প্রসিদ্ধ।

নারী বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন ও পরিবেশ তৈরিতে এই সংস্থার বিশাল ভূমিকা রয়েছে। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত নারী বিষয়ক প্রসিদ্ধ চতুর্থ বেইজিং সম্মেলনের পূর্বে সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল একটি পরামর্শ বোর্ড গঠন করেছিলেন। উক্ত বোর্ডের দায়িত্ব ছিল বেইজিং সম্মেলনকে সর্বদিক দিয়ে সফল করার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করা। উক্ত সম্মেলনে সংস্থার নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে প্রচুর লোকের সমাগত ঘটেছিল:

১। সম্মেলনের তিনটি আলোচ্য বিষয়: সাম্য, উন্নয়ন ও শান্তি-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর সক্রিয় অংশীদারিত্ব এবং এই তিনটি বিষয়কে গোটা বিশ্বে ব্যাপক প্রচার প্রসার করা।

২। নারীদের সকল ক্ষেত্রে ও সকল ধরনের শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

৩। নারীদের বিষয়ে ইতিবাচক দিকের প্রসার ঘটানো যা দ্বারা তাদের যোগ্যতা, প্রতিভা, অভিজ্ঞতা ও সমাজ পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে তাদের সক্রিয় অংশীদারিত্ব মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হয়।

৪। প্রশিক্ষণ, তথ্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও নারী সমাজের বিরুদ্ধে উগ্রতা ও বৈষম্য প্রতিরোধ করার মত ক্ষেত্রে নারী সমাজকে নিয়ে প্রস্তাব পাস করা এবং তা বাস্তবায়ন করার উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা।[১১২]

---

১১১। এই তহবিল ১৯৯৬ সালে নিম্ন বর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়।
(ক) স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন, যেমন ফ্যামিলি প্লানিং ও যৌন সুস্থতা। (প্রজনন সুস্থ্যতার উদ্দেশ্য হলো চিকিৎসাগত দিক দিয়ে নিরাপদ যৌন স্বাধীনতার আহবান)। (খ) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান। (গ) জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যার সমাধানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহযোগিতা। (ঘ) সুস্বাস্থের বিকাশদান ও (ঙ) নারী পুরুষের মাঝে সমান অধিকারের ধ্যান ধারণার বিকাশদাণ।
এই তহবিল জনসংখ্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন এই তহবিলের ওয়েব সাইট http://www.unfpa.org

১১২। প্রবন্ধ, আল- আওলামাতুল ইজতিমাইয়্যা লিল মারওয়াহ্ ওয়াল উসরা, ফুয়াদ আবদুল করিম আলে আবদুল করিম। মাসিক আল বয়ান, সংখ্যা- ১৭০।

এগুলোই সেসব প্রতিষ্ঠান, যেগুলো সামাজিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশে সম্মেলন ও কনফারেন্সের আয়োজন করে। নারীদের ব্যাপারে বিশ্ববাসীর ধ্যান-ধারণা তৈরি, এমন কি নারী সমাজকে সবচেয়ে মজলুম ও নির্যাতিতা প্রাণ হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করে এবং নারী সমাজকে একথা বোঝাতে চেষ্টা করা যে, নারী সমাজ যদি তার স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত অধিকার অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থার ছায়াতলে আসতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপক করা এবং নারী সমাজকে তথাকথিত স্বাধীনতা দান করার জন্য জাতিসংঘের অধীনস্থ এসব সংগঠন ও সংস্থা বিভিন্ন দেশে সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। নিম্নে আমরা সেসব সম্মেলনের ইতিহাস নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোকপাত করছি।

## নারী বিষয়ক বিভিন্ন সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম জাতিসংঘ নারী সমাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়। সে সময়ই নারী সমাজ সম্পর্কে প্রথম সংগঠন মহিলা কাউন্সিল গঠন করে। এতে প্রায় ৪৫টি দেশ শরীক ছিল। এই সংস্থা প্রতি বছর সমাজে নারীদের স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ ও প্রস্তাব পাস করে এবং অতীতের পেশকৃত রিপোর্টকে সুনিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করে। প্রকৃত প্রস্তাব জাতিসংঘ তার প্রতিষ্ঠা লাভের পর হতেই এক্ষেত্রে কাজ করা শুরু করে। বাস্তব কথা হলো, জাতিসংঘ আজ ৫৫ বছর পর স্বীয় উদ্দেশ্যে অনেকটা সফলকাম। ২৬ শে জুন ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সংবিধান তৈরি হয়। উক্ত সংবিধানে লিঙ্গের ভিত্তি মানুষের মাঝে পার্থক্য না করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকারের আহ্বান জানানো হয়েছে।[১১৩]

পাশ্চাত্য জগত নারী-পুরুষের মাঝে এমন সাম্যের রূপরেখা পেশ করেছে যার বুনিয়াদ সামঞ্জস্যের ওপর অর্থাৎ পুরুষের যে অধিকার হুবহু নারীরও একই অধিকার। সে সব অধিকারে লিঙ্গের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, অথচ স্বয়ং পশ্চিমা চিন্তাবিদগণ স্বীয় গবেষণায় নারী-পুরুষের মাঝে এ ধরনের পার্থক্যের কথা স্বীকার করেছেন যাকে তারা সাইকোলজিক্যাল ও বায়োলোজিক্যাল ডিফারেন্স হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর ইসলাম নারী-পুরুষের মাঝে সে সমতার কথা বলে তার বুনিয়াদ পারস্পরিক পূর্ণতার ওপর। অর্থাৎ প্রত্যেকে একে অপরের জন্য পূর্ণতা। একে অপরকে ছাড়া দু'জন অসম্পূর্ণ আবার নারী-পুরুষ প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যও আলাদা এবং সেসব

---

১১৩। জ্বাতি সংঘের এ সংবিধান দেখুন এই ওয়েব সাইটে, http://www.un. org/arabic/aboutun/charter.

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাদের অধিকার আলাদা আলাদা।[১১৪] জাতিসংঘ পাশ্চাত্যের ধারণা অনুযায়ী নারী-পুরুষের মাঝে সাম্য ও সমতার ওপর জোর দিয়েছে এবং জীবন, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির মত ক্ষেত্রে পশ্চিমা আদর্শ ও দর্শনের আলোকে নারীর বিশ্বায়ণের জন্য সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে।

তাদের সংবিধান ও গঠনতন্ত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে স্থান দিয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে সকল শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয়ে কোন কসুর করেনি। জাতিসংঘ অঙ্গীকারপত্রের ৮নং উপধারায় এই পশ্চিমা অর্থ অনুযায়ী সাম্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তা হলো জাতিসংঘ সেসব বিধি-নিষেধকে কোনভাবেই খাটো করে দেখবে না যা দ্বারা নারী-পুরুষের মাঝে সমঅধিকারের যে কোন দিক প্রভাবিত হতে পারে।[১১৫]

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের পক্ষ হতে মানবিধার বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক ইশতেহার জারী করা হয়। তাতে মানুষের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কথার উল্লেখ ছিল। উক্ত ইশতেহারে এ কথার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছিল যে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি চায় পুরুষ হোক কিংবা নারী, এই অধিকার অর্জন করতে পারবে। উক্ত ইশতেহারের দ্বিতীয় ধারায় উল্লেখ ছিল, প্রত্যেক মানুষের যে কোন বৈষম্য ছাড়াই ইশতেহারে উল্লিখিত অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার রয়েছে। জাতিসংঘ যে কোন ধরনের বৈষম্যকে অন্যায় ও অবৈধ সাব্যস্ত করে, বিশেষ করে যখন এই বৈষম্য গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ (নারী-পুরুষ), ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক কিংবা অরাজনৈতিক মতামত, জাতীয়তা, সমাজ কিংবা মাতৃভূমি ইত্যাদির কারণে হবে।[১১৬]

অত:পর ১৯৫২ সালে নারী সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির সুপারিশে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস করে। এরপর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়, যা ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘের পক্ষ হতে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। এই চুক্তি 'প্রস্তাব-২২০০' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উক্ত প্রস্তাবের তৃতীয় প্যারায় উল্ল্যেখ আছে, চুক্তিতে শরীক সকল দেশ সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারে নারী-পুরুষের সাম্য ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।[১১৭] এমনিভাবে

---

১১৪। প্রবন্ধ, আল- আওলামাতুল ইজতিমাইয়্যা লিল মারওয়াহ্ ওয়াল উসরা, ফুয়াদ আবদুল করিম আলে আবদুল করিম। মাসিক আল বয়ান, সংখ্যা- ১৭০।

১১৫। আল মারওয়াহ ফিল ইসলাম, পৃ. ১৬৫।

১১৬। হুকুকুল ইনসান ফিল ইসলাম, পৃ. ৩৯২।

১১৭। প্রাগুক্ত।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৬৬ সালে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। তার তৃতীয় প্যারায় বলা হয়েছে, চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকল দেশ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারে নারী-পুরুষের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।[১১৮]

অত:পর ১৯৬৭ সালে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা সংক্রান্ত একটি ইশতেহার জাতিসংঘের পক্ষ থেকে জারী করা হয়। তাতে সাম্য ও সমঅধিকারের ধ্যান-ধারণাকে বিকাশের জন্য জাতিসংঘ তার সকল শক্তি ও উপকরণ প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সরকার ও বেসরকারী সংগঠন সংস্থা ও ব্যক্তিদের কাছে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নির্মূল করার জন্য জোর আহ্বান জানায়।

উক্ত আহ্বানে বলা হয়, ভোট প্রদান নারীর সাংবিধানিক অধিকার (অর্থাৎ আইনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য নেই)। এমনিভাবে বিবাহ, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মত ক্ষেত্রগুলোতে নারী-পুরুষের মাঝে পূর্ণ সমঅধিকার।[১১৯] এরপর ১৯৬৮ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে তেহরানে মানবাধিকার শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যাকে তেহরান ইশতেহার ১৯৬৮ নাম দেওয়া হয়। উক্ত সেমিনারে যে ইশতেহার প্রকাশ করা হয়, তার ১৫নং ধারায় বলা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী সমাজ যে বৈষম্যের শিকার এই সেমিনার তার পূর্ণাঙ্গ নির্মূলের প্রতি জোর দেয়। কারণ নারী-পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা প্রদান জাতিসংঘের সংবিধান ও মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ইশতেহারের বিরোধী। মানব উন্নয়নের জন্য নারী সমাজের প্রতি চলমান বৈষম্যকে সমূলে উৎপাটিত করা একান্ত প্রয়োজন।[১২০] ১৯৪৫ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত জাতিসংঘ বিভিন্ন প্রস্তাব পাস করেছে এবং সদস্য দেশগুলোর মাঝে বিভিন্ন চুক্তি করিয়েছে। এভাবে জাতিসংঘ নারী-পুরুষের সমঅধিকারের পশ্চিমা অর্থ ও ধ্যান-ধারণাকে পুরো বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচার-প্রসার করছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করার জন্য রাস্তা সুগম করছে। এ বিষয়ে পাসকৃত বিভিন্ন প্রস্তাবে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূণ।

কিন্তু তা কখনোই স্পষ্টভাবে সে সমস্ত অধিকারের কথা বিশ্লেষণ করেনি, যে অধিকারের মধ্যে পাশ্চাত্য নারী সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। এ ব্যাপারে তারা প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়েছে। অত:পর জাতিসংঘ প্রস্তাব ও চুক্তি হতে

---

১১৮। প্রাগুক্ত।

১১৯। প্রাগুক্ত।

১২০। প্রাগুক্ত।

এক ধাপ অগ্রসর হয়ে মানবাধিকারের শিরোনামে 'তেহরান সম্মেলন'- এর আয়োজন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল নারী বিষয়ে পশ্চিমা ধান-ধারণার বিকাশ করা। এ জন্য মানবাধিকারকে সাইনবোর্ড বানানো হয়েছে। তারা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, নারী-পুরুষের মাঝে কোন ধরনের পার্থক্য, ভিন্নতা ও বৈষম্য পুরো মানবতার বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক অপরাধ। তথাকথিত সাম্যের পতাকাবাহীদের যখন এই প্রশান্তি লাভ হলো যে, এখন বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে রাস্তা সুগম হয়েছে, তখন জাতিসংঘ বিশেষভাবে নারীদের বিষয়ে কনফারেন্স করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ বিষয়ে 'নারী, সাম্য ও নিরাপত্তা' শীর্ষক সর্বপ্রথম সম্মেলন মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে প্রায় ১৩৩টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এবং সরকারী ও বেসরকারী পরিমণ্ডলে নারীর পরিস্থিতি সংক্রান্ত সর্বপ্রথম পরিকল্পনা তৈরি হয়, তার মধ্যে নারীর প্রশিক্ষণ ও ফ্যামিলী প্ল্যানিং- এর মত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্মেলনে ভবিষ্যতে সাম্য ও সমঅধিকারের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ ও বিস্তারের জন্য কৌশল গ্রহণ করা হয়।[১২১]

অত:পর ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ নির্মূল শীর্ষক একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনে আমন্ত্রিতদের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ধরনের চুক্তিকে সর্বপ্রথম আইনী রূপ দেওয়া হয় এবং প্রতিটি দেশকে এই চুক্তি মেনে নেওয়ার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়। যে সমস্ত দেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে তাদের জন্য জরুরী ছিল এই চুক্তিকে মেনে নেওয়া। আর যারা এই চুক্তির পরে সদস্য পদ গ্রহণ করেছে তাদের ওপর সদস্যপদ গ্রহণের জন্য এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার শর্তারোপ করা হয়। ১৯৯৫ সালের প্রসিদ্ধ বেইজিং সম্মেলন পর্যন্ত এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সদস্য দেশের সংখ্যা ১৩৩-এ এসে দাঁড়ায়। আসুন! আমরা এবার দেখি, এই দীর্ঘ বছরের পর বছরের শ্রম, প্রচেষ্টা ও পরিবেশ তৈরির পর নারী বিষয়ে দ্বিতীয় সম্মেলনে সম্পাদিত চুক্তিতে সদস্য দেশগুলোকে কি ধরনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো:

(ক) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।

(খ) সে সকল আইন ব্যবস্থা ও প্রথা-প্রচলন যার মধ্যে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যের ঘ্রাণ পাওয়া যায়, তা নির্মূলের সম্ভাব্য সকল কৌশল অবলম্বন করা।

---

১২১। প্রবন্ধ, আল- আওলামাতুল ইজতিমাইয়্যা লিল মারওয়াহ্ ওয়াল উসরা, ফুয়াদ আবদুল করিম আলে আবদুল করিম। মাসিক আল বয়ান, সংখ্যা- ১৭০। পৃ. ৩৭।

(গ) প্রতিটি দেশ সহশিক্ষার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করবে যাতে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো ধরনের পার্থক্য না থাকে।

(ঘ) জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশ নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে সে অধিকারই দেবে যে অধিকার পুরুষকে দেওয়া হয়। সাথে সাথে সে অধিকার প্রদর্শনের সুযোগও সরবরাহ করবে।

(ঙ) নারীরও তার সন্তানের সংখ্যা ও দুই সন্তানের মাঝে দূরত্বের বিষয়ে পুরুষের সমান সমান অধিকার ও স্বাধীনতা হওয়া উচিত।

(চ) যেমনিভাবে একজন পুরুষকে সন্তানের যিম্মাদার ও অভিভাবক মনে করা হয় তেমনিভাবে নারীকেও তার যিম্মাদার ও অভিভাবক মনে করতে হবে।[১২২]

অত:পর 'নারী' বিষয়ক দ্বিতীয় সম্মেলন ১৯৮০ সালে ডেনমার্কের রাজধানী 'কোপেনহেগেন'-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭৫ সালে নারী বিষয়ক জাতিসংঘের প্রথম আন্তর্জাতিক "মেক্সিকো সম্মেলন"-এ যে সুপারিশমালা উত্থাপিত হয়েছিল তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল জাতিসংঘের মাধ্যমে নারী বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তির কিছু অংশে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা।

এরপর জাতিসংঘ 'ডেনমার্ক' থেকে নাইরোবির দিকে যাত্রা করে এবং পূর্ববর্তী সকল সম্মেলনে পাসকৃত প্রস্তাবের ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার জন্য ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নারী বিষয়ক তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা নারীর উন্নয়নে নাইরোবি সম্মেলনের "প্রস্তাবিত কৌশল" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাতে প্রায় ১৫৭টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে। উক্ত অধিবেশনে সম্মেলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতে সেসব উদ্দেশ্য কার্যকর করার প্রতি জোর দেয়া হয়। সাথে সাথে ১৯৮৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সে সব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধা ও প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে তার ওপর প্রাধান্য লাভের জন্য সম্ভাব্য সকল কৌশল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার অনুমতি দেওয়া হয়।

এরপর ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ "নারী বিষয়ে" চতুর্থ সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলন বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং বেইজিং সম্মেলন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পাসকৃত প্রস্তাবাবলী ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বাস্তবতার রূপ দেওয়ার ব্যাপারে প্রচেষ্টা খুব দ্রুত

---

১২২। হুকুকুল ইনসান মাহমুদ বসূনী। ১ম খন্ড, পৃ. ৯৭।

করার প্রতি আহ্বান জানানো-যাতে একবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্ব নারী সম্পর্কে যে সব পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছে তা বাস্তবায়িত হয়।

কিন্তু শতাব্দী শেষ হতে শুধু পাঁচ বছর বাকী ছিল। পশ্চিমা বিশ্বের তখনো স্বীয় লক্ষ্যপানে পৌঁছতে অনেক বাকী ছিল। এজন্য শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত স্বীয় স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার এই সুযোগকে তারা হাতছাড়া করতে চাচ্ছিল না। তাই তারা শতাব্দীর শেষে আরেকটি সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলন পূর্ববর্তী সকল সম্মেলন হতে কিছুটা ভিন্ন ছিল। পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থার বিশ্বকরণের স্বপ্নদ্রষ্টারা এই সম্মেলনে প্রথমবার সুস্পষ্ট ভাষায় এমন এমন ঘোষণা দিল যা ইসলামী শরীয়ত, বরং মানব প্রকৃতির বিরোধী ছিল।

বেইজিং সম্মেলনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও ফ্রি-সেক্সের কায়দায় সমঅধিকার ও সমতার আহ্বান জানানো হয়। আসমানী শরীয়ত নির্ধারিত নীতিমালা, প্রকৃতির চাহিদা ও নারীর রুচির বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের মাঝে সকল পার্থক্য পদদলিত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা হয়। শরয়ীভাবে অবৈধ যৌন সম্পর্কের দেরাজ খুলে দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। উক্ত সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ-

১। নর-নারীর অবাধ মিলনের বা স্বাধীন যৌন সম্পর্কের অনুমতি।

২। যৌবনের সূচনাতে বিবাহ হতে ঘৃণা।

৩। গর্ভ প্রতিরোধের উপায়-উপকরণের বিকাশ।

৪। অপারেশন ইত্যাদির মাধ্যমে পুরুষের শক্তিকে খতম করা।

৫। অল্প ও সীমিত সন্তান গ্রহণ।

৬। নিরাপদ পদ্ধতিতে গর্ভপাতের অনুমতি।

৭। নারী-পুরুষের মাঝে সহশিক্ষার বিকাশ।

৮। তরুণ বয়সেই ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংস্কৃতি শিক্ষা দান।

৯। এসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মিডিয়া ব্যবহার করা।

এমনিভাবে উক্ত সম্মেলনে ঘোষণা দেওয়া হয়, "এখন সমাজ প্রতি ধরনের বাধা-নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে নগ্নতার প্রতি ধাবমান হবে। যে কোন ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের এই উন্নত সমাজের গতি পরিবর্তন করার কোন অধিকার নেই

সন্তানের ওপর পিতা-মাতার কোন দায়িত্ব থাকবে না। আর পুরুষ মহিলার দায়িত্বশীল হবে না।"[১২৩]

---

১২৩। প্রবন্ধ, আল- আওলামাতুল ইজতিমাইয়্যা লিল মারওয়াহ ওয়াল উসরা, ফুয়াদ আবদুল করিম আলে আবদুল করিম ; মাসিক আল বয়ান, সংখ্যা- ১৭০, পৃ. ৩৮।

উক্ত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী দ্বারা ভালভাবেই অনুমিত হয়, এ ধরনের সম্মেলনের উদ্দেশ্য শুধু পশ্চিমা সমাজ ও তার প্রকৃতিবিরোধী মূল্যবোধকে গোটা বিশ্বে ব্যাপক করা। বিশ্বায়নের পতাকাবাহী ও বিভিন্ন সরকার সামাজিক বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিকল্পিত ও প্ল্যানিং-এর সাথে ধীর রাস্তা গ্রহণ করেছে। প্রথমে বিশ্বায়নবাদীরা নারীদেরকে মজলুম বানিয়ে উপস্থাপন করেছে। তারপর দুনিয়াবাসীকে এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, সাম্য ও সমঅধিকারই এই জুলুম ও নির্যাতন নির্মূল করতে পারে। এভাবে সমঅধিকারের ধারণা বিপুল আকারে প্রচার-প্রসার করা হয়। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করার পর বেইজিং সম্মেলন প্রকৃতিবিরোধী, স্বভাববিরোধী ও ইসলামবিরোধী পশ্চিমাদের মূল্যবোধকে বিশ্ববাসীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকারী দেশকে মানবাধিকার লংঘনকারী দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের স্বপ্ন দেখার সাথে সাথে দীর্ঘদিন ধরে এ স্বপ্নও দেখে আসছিল যে, পশ্চিমা সমাজই হবে বিশ্ববাসীর জন্য একটি আদর্শ ও অনুসরণীয় সমাজ। যাতে প্রতিটি জাতি চোখ বুজে এই সমাজ ব্যবস্থাকে স্বীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করে। এর জন্য তারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে নারীকে নির্বাচন করেছে। তাদের আশা ছিল, তারা স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে সফলকাম হবে। এ কারণেই "নারী সমাজের সমস্যা" বিষয়টি তাদের মস্তিস্কে ছিল। এ বিষয়টিই তাদের সকল সম্মেলনের সৌন্দর্য বিবেচিত হয়েছিল। জাতিসংঘ শুধু নারী বিষয়ে সম্মেলন করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং অন্যান্য বিষয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেও "নারীদের সমস্যা" বিষয়টি শীর্ষ স্থানে রেখেছে এবং এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাস করেছে। সে মতে "জনসংখ্যা" বিষয়ে জাতিসংঘের অধীনে বহু সম্মেলন বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে আমরা এ ধরণেরই কিছু সম্মেলনের বিশ্লেষণ করব:

১৯৭৪ সালে জনসংখ্যা বিষয়ে রোমানিয়াতে সর্বপ্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে একটি "আন্তর্জাতিক প্লান" তৈরি করা হয়। তাতে এই আহ্বান জানানো হয়েছিল, সমাজে নারীর ভূমিকাকে উন্নত করতে হবে। তাকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করতে হবে এবং ফ্যামিলী প্লানিং- এর বিকাশ দান করতে হবে যাতে প্রতিটি পরিবার অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক সন্তান যথেষ্ট মনে করে। এজন্য নারীদেরকে বেশীর পক্ষে দু'টি সন্তান গ্রহণের পর গর্ভধারন ক্ষমতা নি:শেষ করে দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে হবে। এরপর ১৯৮৪ সালে মেক্সিকোতে

“জনসংখ্যা” বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

(ক) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া।

(খ) বিয়েতে দেরী করা এবং গর্ভধারণে তাড়াহুড়ো না করা।

(গ) পুরুষকে ঘরের কাজে শরীক করা আর নারীকে বাইরের যিম্মাদারীতে শরীক করা।

(ঘ) তরুণ-তরুণীদেরকে পারস্পরিক দৈহিক সম্পর্কের শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

(ঙ) পরিবারের সীমারেখার বাইরে নর-নারীর দৈহিক সম্পর্কের বিকাশ দান করা।

(চ) ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে আর্থিক সহায়তা দান করা এবং তাদের বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত জায়গা প্রদান করা।[১২৪]

অত:পর ১৯৯৪ সালের ৫ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতার প্রাচীন লীলাভূমি মিসরের রাজধানী কায়রোতে “জনসংখ্যা ও উন্নয়ন” বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও সে সম্মেলনের বিষয় ছিল “জনসংখ্যা” কিন্তু তাতে নারীদের বিষয়টি ছিল প্রবল এবং প্রায় বেইজিং সম্মেলন বরং তার থেকেও বেশী ভয়াবহ প্রস্তাব পাস করা হয়। যদি এই সম্মেলন পশ্চিমা কোন দেশে অনুষ্ঠিত হতো, তবুও বিষয়টির গুরুত্ব কম হতো না। কিন্তু এ ধরনের সম্মেলন ইসলামী দেশে অনুষ্ঠিত হওয়া বিরাট উদ্বেগের কারণ! যদি একথা বলা হয় তাহলে ভুল হবে না যে, পশ্চিমা শক্তি কায়রোতে এই সম্মেলনের আয়োজন করে ইসলামী বিশ্বের মুখে চপেটাঘাত করেছে। কায়রো সম্মেলনে যে সংবিধান রচিত হয় তার কিছু ধারা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১। ব্যক্তিই আসল ভিত্তি, তার স্বার্থ ও তার চাহিদাই মানদণ্ড। ধর্ম, জাতি, পরিবার, প্রথা-প্রচলন ও রীতি-অভ্যাস কোন মানদণ্ড নয়। সুতরাং এসব প্রচলিত বস্তুর পক্ষ থেকে আরোপিত বিধি-নিষেধ থেকে মুক্তি অর্জন করা ব্যক্তির অধিকার।

২। সংবিধানে লিখিত আছে- বিবাহ বন্ধন ছাড়াই নর-নারীর দৈহিক কর্মকাণ্ড হওয়া উচিত। এ ধরনের দৈহিক কর্মকাণ্ডকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে তার বিকাশ দান করা উচিত। তবে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, এসব কাজ যেন কোন রোগ-বালাই আপতিত না করে। এজন্য তরুণ-তরুণীদেরকে দৈহিক মিলনকর্ম ও গর্ভরোধ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে এবং এ বিষয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণ

---

১২৪ । প্রাগুক্ত।

নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং তাদের এসব কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

৩। এই সংবিধান গর্ভপাতের নিন্দা করে না, এ কাজে মায়ের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা যতই হুমকির সম্মুখীন হোক না কেন। অবশ্য এতটুকু দৃষ্টি অবশ্যই দিতে হবে, মায়ের জীবন যেন হুমকির সম্মুখীন না হয়ে পড়ে!

৪। এই সংবিধানে তাড়াতাড়ি 'মা' হওয়াটাকেও ভুল সাব্যস্ত করা হয়েছে- নারী চায় বৈধভাবে মা হোক কিংবা অবৈধভাবে মা হোক। কারণ তাড়াতাড়ি মা হওয়া দ্বারা জন্মের হার বৃদ্ধি পাবে এবং নারীরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাইরের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

৫। কায়রো সম্মেলনের এই সংবিধানে নারী-পুরুষের জন্য স্বামী-স্ত্রীর পরিবর্তে 'সাথী' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ সংবিধান রচনাকারীদের দৃষ্টিতে এটি একটি নিরপেক্ষ শব্দ যা দ্বারা নির্দিষ্ট আইনী সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করা হয় না, বরং এ শব্দ বিবাহ বন্ধন ছাড়া জৈবিক চাহিদা পূরণ, নগ্নতা ও শারীরিক সম্পর্ককে গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হওয়ার পরিকল্পনা পেশ করে।

৬। নারী-পুরুষের মাঝে সমঅধিকারঃ এ সংবিধানে নারী-পুরুষের মাঝে সম্পূর্ণ সমতা বিধানের আহ্বান জানানো হয়েছে। নারীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা নারী-পুরুষের মাঝে বিদ্যমান সকল প্রকার বিরোধী পার্থক্য নির্মূল করে দেবে। সুতরাং পুরুষ নারীদের মত ঘরের কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করবে এবং শিশু প্রতিপালন করবে। আর নারী বাইরের কাজে পুরুষের সহযোগিতা করবে।[১২৫]

ইসলামী বিশ্বের জন্য এটি একটি লজ্জার বিষয় যে, ইসলামী সভ্যতার প্রাচীন লীলাভূমি কায়রোতে এ ধরনের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আবার তাতে এমন এমন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যা সম্পূর্ণ মানবতাবিরোধী, প্রকৃতিবিরোধী, স্বভাব বিরোধী ও অশ্লীল। জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশকে এই প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত স্বীয় দেশে বাস্তবায়ন করার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথচ নগ্নতা ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ এই সংবিধান শুধু ইসলামই নয়, বরং সকল ওহি ভিত্তিক ধর্মের নীতিমালাবিরোধী। কারণ ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান কোনো ধর্মই এসব ফ্রি-সেক্স, নগ্নতা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনাকে অনুমতি দেয় না, অথচ এই সংবিধানের পুরাটাই ফ্রি-সেক্সের কথা বলে। এই সংবিধান গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন, তাতে

---

১২৫। আল ইসলাম ওয়াল আওলামা, পৃ. ১২১-১২২।

এমন কিছু শব্দ রয়েছে যা বার বার ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন যৌন সুস্থতা, মিলন কর্মকাণ্ড, যৌন সুড়সুড়ি, গর্ভধারণ, গর্ভপাত, ব্যক্তিস্বাধীনতা, যৌন স্বাধীনতা, ফ্রি-সেক্স ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব শব্দ এদিকেই ইঙ্গিত বহন করে যে, কায়রোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন 'জনসংখ্যা' শীর্ষক ছিল না, বরং তা ছিল 'যৌন স্বাধীনতা' শীর্ষক। উক্ত সম্মেলনে এই মহাগুনাহের বিকাশ ও বিস্তার করার জন্য নিত্য নতুন কৌশল উপস্থাপন করা হয়েছে, এমন কি একটি মার্কিন সংগঠন পর্যন্ত এসব প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের ফলে সংঘটিতব্য বিপর্যয় থেকে সতর্ক করেছে!

একজন ফরাসি ইসলামী চিন্তাবিদ রেজাউল জারুদী মিসরীয় পত্রিকা 'আশ-শাআব' (১৬/৯/১৯৯৬)- এ লেখেন, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, মার্কিন তরুণ মাতাদের একটি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট কায়রো সম্মেলনে মুসলমানদেরকে মার্কিনাইজেশন করার বিপদ থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, এসব লোক মার্কিন সমাজ ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন তারা তাদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা নিয়ে ইসলামী বিশ্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যাতে তাদেরকেও ধ্বংস করা যায় এবং তাদের সাথে সাথে মুসলিম নারী ও সমাজে তার ভূমিকাকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া যায়।[১২৬]

## অন্যান্য বিষয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলন

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি সামাজিক বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার 'নারী', যাকে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ব্যবহার করে বিশ্বায়নবাদীরা স্বীয় স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারে। এজন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে নারী তাদের মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে আছে। এর মাধ্যমে তারা তাদের হীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বহু সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

এমনিভাবে জনসংখ্যা বিষয়ক সম্মেলনেও তারা নারীর সমস্যাটিই সর্বশীর্ষে রেখেছে, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি এই স্বল্প সংখ্যক সম্মেলনের ওপরই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং জনসংখ্যা ও নারী বিষয় থেকে দূরে সরে অন্যান্য বিষয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেও তারা নারীর সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কমপক্ষে নারীর নাম উল্লেখ না করেও তারা সমাজকে ধ্বংস করার ঘৃণিত চেষ্টা করেছে- চায় শিশুদের মাধ্যমে হোক কিংবা অন্য কোন পদ্ধতিতে হোক। নিম্নে আমরা এ ধরনেরই কিছু সম্মেলনের বিশ্লেষণ করব!

---

১২৬। সুদূতুল হাজারাতিল গরাবিয়াহ-রুয়াতুম মিনাদ দুখুল, আহমদ মানসূর কৃত।

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডে শিক্ষা বিষয়ক একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়, বিশেষ করে সহশিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। এতে সহশিক্ষাবিরোধী দেশগুলোর নিন্দা করা হয়। ১৯৯০ সালে নিউ ইয়র্কে শিশু বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে ১৯৮৯ সালে পাসকৃত সিদ্ধান্তাবলীরই পুনরাবৃত্তি করা হয়। সে সিদ্ধান্তাবলীতে বলা হয়েছিল, শিশুদের ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চেতনাগত দিক দিয়ে স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। অন্য ভাষায় তারা যে ধর্ম ইচ্ছা সে ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে। চায় সে ধর্মের কল্যাণ ও অকল্যাণকর কোন বিষয়ে তার জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক। এ ব্যাপারে পিতা-মাতা বাধ্য করতে পারবে না। প্রতিটি বিষয়ে তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সে নিজেই জীবনের মালিক। সে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে যে, সে জীবনকে কোন রাস্তায় পরিচালিত করবে। পিতা-মাতা যদি সংশোধনের নিমিত্তে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে তাহলে তা অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর হবে, বরং প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সন্তানের ওপর পিতা-মাতার কোন অভিভাবকত্ব থাকবে না। এ ছাড়াও আরো অনেক প্রস্তাব রয়েছে যা সম্পূর্ণ ইউরোপ-আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থার সুস্পষ্ট প্রতিনিধিত্ব করে।

পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। চরম নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার সে সমাজ। সে সমাজে পিতা-মাতা শিশুদের প্রতিপালন করলেও তাদের বিশ্বাস রয়েছে, আগামীকাল প্রয়োজন পড়লে এই সন্তান তার কোন কাজে আসবে না। এজন্য তারা যৌবন বয়সেই বৃদ্ধ বয়সের প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। পুরো জীবন সম্পদ উপার্জন করে ব্যাংক-ব্যালেন্স তৈরি করে নেয় যাতে বৃদ্ধ বয়সে যখন তার কোন আশ্রয় থাকবে না তখন এই উপার্জিত সম্পদই তার ইজ্জতের সাথে জীবন চলার পথে সাহায্য করবে। পরিশেষে যখন সে মৃত্যুবরণ করে তখন তার এসব সম্পদ ছেলে সন্তানের পরিবর্তে স্বীয় কুকুরের নামে উৎসর্গ করে যায়, যে কুকুর তার মজ্জাগত আনুগত্যের কারণে সন্তানের চেয়ে বেশী বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর সেবা করে। এ ধরনের নোংরা পতিত সমাজের বিশ্বায়ন এবং পুরো বিশ্বে তার বিকাশ দান, বরং এটাকেই প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি দেশের সমাজ বানানোর উদ্দেশ্যে বিশ্বায়নবাদীরা এ ধরনের সম্মেলন কনফারেন্স করে আসছে।

এমন কি সম্মেলনের আসল আলোচ্য বিষয় থেকে সরে গিয়ে সেখানে পাসকৃত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে নারীর বিষয়টি বেশী ওঠানো হয়েছে। কমপক্ষে এমন সব বিষয়কে ইন্ধন যোগানো হয়েছে কিংবা উসকানি দেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জাতি

স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে পারে। এমনিভাবে ১৯৯২ সালে 'পরিবেশ ও উন্নয়ন' বিষয়ে একটি সম্মেলন ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনেও এ কথা বলা হয়েছে, সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। পুরুষ তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নারীই সিদ্ধান্ত নেবে সন্তান গ্রহণের জন্য কোন সময় তার জন্য উপযোগী ও উত্তম এবং কয়টি সন্তান সে গ্রহণ করবে। প্রস্তাবে সীমিত সন্তান গ্রহণের প্রতিও জোরদার ওকালতি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নারীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। নারী-পুরুষের মাঝে সমঅধিকারের পথে অন্তরায় সকল আইনী সাংবিধানিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা-বিপত্তিকে নির্মূল করার জন্য প্রতিটি দেশ একটি পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত কৌশল গ্রহণ করবে।

১৯৯৩ সালে 'মানবাধিকার' বিষয়ে অস্ট্রেলিয়াতে একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উক্ত সম্মেলনে আসল আলোচ্য বিষয় হতে দূরে সরে গিয়ে শুধু নারীর অধিকার নিয়েই আলোচনা করা হয়। নারী-পুরুষের মাঝে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা স্টাইলে সমতা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি জোর দেওয়া হয়। প্রতিটি দেশকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, নারীর বিরুদ্ধে সকল বৈষম্যমূলক আচরণ নির্মূল করাই তার সরকারের প্রথম অঙ্গীকার হতে হবে, যাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে এবং তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কিংবা লোকচক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত সকল প্রকার বৈষম্য নির্মূল হয়। উক্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী সকল দেশকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়, যাতে এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মেলনের সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তারা বাস্তবায়ন করে। এ ক্ষেত্রে ১৯৯৩ সালেই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে পাসকৃত একটি ইশতেহার সামনে রাখা হয়, যার শিরোনাম ছিল "নারীর বিরুদ্ধে কঠোরতা নির্মূল করা।"

১৯৯৫ সালে "সামাজিক উন্নয়ন" বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আলোচনা করা হয়, একটি পরিবার তার পুরাতন রীতিনীতি পরিবর্তন করে কিভাবে জীবন যাপন করবে। নারী পুরুষের মাঝে কী পরিমাণ সমতা প্রয়োজন এবং পরিবারে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য কিভাবে নির্মূল করা যাবে। উক্ত সম্মেলনে এ কথার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়, পুরুষ পারিবারিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করবে আর নারী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। এমনিভাবে প্রতিটি দেশ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর ওপর আরোপিত সকল বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন প্রত্যাখ্যান করবে এবং ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে পৈতৃক সম্পত্তি আইন বাস্তবায়ন করবে।

১৯৯৬ সালে "মানব কলোনী" বিষয়ে তুরস্কে জাতিসংঘের স্টেজে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও নারীর সক্রিয় অংশীদারিত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়, যাতে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানব কলোনীর উন্নয়নের রাস্তায় নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারে। উক্ত সম্মেলনে সমঅধিকারের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কারেরও আহ্বান জানানো হয়। তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি আইন সর্বশীর্ষে।

২০০০ সালে "একুশ শতকে সাম্য, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা" বিষয়ে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পাসকৃত প্রস্তাবাবলীর কিছু ধারা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১। তরুণ-তরুণীদের নগ্নতা ও যৌন স্বাধীনতার প্রতি আহ্বান করতে হবে এবং তরুণ বয়সেই যৌন কর্মে উৎসাহিত করতে হবে। আর তারা বিবাহ করবে দেরীতে।

২। পরিবারের গণ্ডির বাইরেও নারী-পুরুষের মাঝে প্রত্যেক ধরনের যৌন সম্পর্কের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। পরিবার বিনির্মাণে বিয়ের ভূমিকাকে নির্মূল করতে হবে।

৩। গর্ভ বিনষ্টকে আইনগত মর্যাদা দিতে হবে।

৪। পরিবারে পশ্চিমা দর্শনের বিকাশ ও বিস্তার ঘটাতে হবে। আর পরিবারের পশ্চিমা দর্শন হলো একটি ফ্যামিলী দুইজন মানুষ নিয়ে গঠিত হয়। তা একই লিঙ্গের হোক না কেন (অর্থাৎ পুরুষ+পুরুষ ও নারী+নারী)।

৫। ঘরের কাজ কারবার না করার প্রতি নারীদের উৎসাহিত করতে হবে। কারণ ঘরের কাজে পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না।

৬। এমন পারিবারিক আদালত স্থাপন করতে হবে, যেখানে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অধিকার হরণের মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবে এবং সেখানে তার যথাযোগ্য শাস্তি হবে।

৭। সমকামিতাকে বৈধ আখ্যায়িত করতে হবে, বরং এমন আইন লংঘনের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে যার আলোকে যৌন কর্মকাণ্ড অবৈধ।

৮। সমঅধিকারের পাশ্চাত্য দর্শন বাস্তবায়ন করতে হবে এবং নারী-পুরুষের মাঝে পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্য কায়েম করতে হবে। উভয়কে ঘরের কাজ করার, সন্তানের দেখা-শোনা, পৈতৃক সম্পত্তি ইত্যাদিতে বরাবর অংশীদার মানা হবে।

৯। বেইজিং সম্মেলনের ইশতেহারের ওপর কিছু কিছু ইসলামী দেশের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অভিযোগকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

এই সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য ছিল মূলত সেসব দেশকে সর্বশেষ সতর্ক করা, যারা এখনও পর্যন্ত পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলোর প্রস্তাব ও এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করেনি। এজন্য সেসব দেশের জনগণকে স্বীয় দেশের আইন লংঘন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সেসব দেশের জন্য 'ডেড লাইন'ও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সম্মেলনকে বাস্তবায়নকল্পে অনেক ছোট ছোট সম্মেলন বিভিন্ন দেশে করা হয়েছে যাতে সেসব ছোট ছোট সম্মেলনে পাসকৃত সিদ্ধান্তাবলী এ সম্মেলনের ইশতেহারের অংশ বানানো যায়।

সুতরাং ২০০০ সালে বেইজিং সম্মেলনের প্রতীক (বেইজিং+৫)-এর অধীনে নিউ ইয়র্কে একটি সম্মেলন হয়। এ প্রতীকের মাধ্যমে বেইজিং সম্মেলনের ৫ম বর্ষপূর্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়। এ সম্মেলনে বেইজিং সম্মেলনের ইশতেহারের অংশ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার চেষ্টা করা হয়। মার্চ মাসে 'সুযোগ, বাধা ও প্রত্যাশিত ভূমিকা' বিষয়ে বাহরাইনে উপসাগরীয় নারীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের আয়োজন করে 'বাহরাইনের গার্লস এসোসিয়েশন।' এ সম্মেলনে প্রায় সব উপসাগরীয় দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ অংশ গ্রহণ করে। ১৯৯৬ সালে তিউনিসে পাশ্চাত্য ও আরব নারী বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ বছরই আফ্রিকান নারীদের ৬ষ্ঠ সম্মেলন আদ্দিস আবাবাতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের আয়োজন করে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক কমিটির শাখা 'আফ্রিকান সেন্টার।' এ বছরই 'পশ্চিম এশিয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি'- এর তত্ত্বাবধানে জর্দানের রাজধানী আম্মানে ও বৈরুতে পৃথক পৃথক দু'টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১২৭]

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিগত শতাব্দীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত ৫৫ বছরের এই দীর্ঘ সময়ে প্রায় ১০ থেকে ২০টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বায়নের নীতি-নিধারকরা পাশ্চাত্য সমাজ ও তার নগ্ন মূল্যবোধের বিশ্বায়নের প্রয়াস চালিয়েছে। প্রতিটি দেশের ও প্রতিটি জাতির সমাজ ব্যবস্থা নির্মূল করে পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থাই পুরো বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় তারা। এদিকে তাদের লক্ষ্য নেই যে, এই সমাজ ব্যবস্থা অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে কি না! এই সমাজ

---

১২৭। প্রবন্ধ, আল- আওলামাতুল ইজতিমাইয়্যা লিল মারওয়াহ্ ওয়াল উসরা, ফুয়াদ আবদুল করিম আলে আবদুল করিম। মাসিক আল বয়ান, সংখ্যা- ১৭০

ব্যবস্থা বিশ্বের চলমান অশান্তি, বিশৃংখলা ও লাগামহীনতা নির্মূল করতে পারবে কি না। বাস্তবতা এই যে, পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা অনুসরণীয় হওয়ার পরিবর্তে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এ দ্বারা বিশ্বের অশান্তি দূর হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধিই হতে থাকবে। এ দ্বারা প্রতিটি ঘরে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। মানসিক প্রশান্তি নির্মূল হবে। চিন্তা জগতে জং ধরে যাবে। এ সমাজ ব্যবস্থায় প্রভাবিত প্রতিটি দেশ নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হবে। এসব অকল্যাণকর ও অনিষ্টকর বিষয় থাকা সত্ত্বেও বিশ্বায়নবাদীরা এই নোংরা সমাজ ব্যবস্থা জোরপূর্বক পুরো বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। এ হীন উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন দেশে সম্মেলনের আয়োজন করে, প্রস্তাব পাস করে, সংবিধান তৈরি করে, ইশতেহার প্রকাশ করে।

এতে তারা নারীকে সবচেয়ে বেশী মজলুম, নির্যাতিত ও নিগৃহীত আখ্যা দিয়েছে। তাদের সমাজ ব্যবস্থাকে তারা নারী নির্যাতন ও দুরবস্থা থেকে মুক্তিদাতা প্রমাণ করেছে। এ ধ্যান-ধারণার এত বিস্তার ঘটানো হয়েছে যে, প্রত্যেক সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি তাদের সুরে সুর মেলায়। কিন্তু এ দিকে কারো লক্ষ্য নেই যে, যে সুর তাদের সম্মেলন হল থেকে ভেসে আসছিল এ সুর কত অস্বস্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক! সে শয়তানী মঞ্চে নাচনেওয়ালাদের মধ্যে সে সব আরব নেতাও ছিল, যারা সম্মেলনের প্রস্তাব ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করে পশ্চিমা শক্তির পক্ষ হয়ে স্বীয় দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কেবল হাতে গোণা কয়েকজন ব্যক্তি এসব সম্মেলনের অনিষ্টকর ও ভয়াবহ বিষয়গুলো সম্পর্কে মুখ খোলার সৎ সাহস করেছেন। কিন্তু এঁদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য, অথচ সম্মেলনের এ প্রস্তাবাবলী ইসলামী ব্যবস্থার সাথে সম্পূর্ণ সংঘর্ষপূর্ণ।

এসব প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোর অর্থ ইসলামী আইন প্রত্যাখ্যান করা, বরং এ ঘোষণা দেওয়া যে, ইসলাম ১৪ শত বছর পর্যন্ত সমাজ বিনির্মাণের প্রচেষ্টা করেছে কিন্তু সে সংস্কার সাধনে চরম ব্যর্থ হয়েছে। এখন এসব নোংরা সমাজের সৃষ্ট লোকদেরকেও সমাজ সংস্কারের সুযোগ প্রদান করা উচিত। শত ধিককার সেসব মুসলিম নেতৃত্বের বিবেকের প্রতি, যারা চোখ বন্ধ করে এসব প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। তাদের মনে এতটুকু চিন্তার উদ্রেক হলো না যে, এসব প্রস্তাব ও চুক্তি দ্বারা নৈতিক ও সামাজিক সুস্থতা এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে কি কি ভয়াবহতা ও অনিষ্ট সামনে আসতে পারে। সংক্ষিপ্তভাবে সকল সম্মেলনের প্রস্তাবাবলীর আলোকে নিম্নে কিছু অনিষ্ট চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

## সম্মেলনের কিছু নেতিবাচক দিক

পূর্বে আমরা নারীসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত যে সমস্ত সম্মেলনের কথা আলোচনা করেছি, তা দ্বারা সর্বপ্রথম সমাজ ও নৈতিকতার ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। কারণ সে প্রস্তাবাবলীর মধ্যে এমন কিছু প্রস্তাবও রয়েছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য সমাজে যেনা, ব্যভিচার ও জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়না ব্যাপক করা, মানুষের নৈতিক চরিত্র যাতে এমন নিম্নস্তরে পৌঁছে যায় যেন মানুষ প্রবৃত্তির কামনা পূরণকেই সব কিছু মনে করে। সুতরাং বিশ্বায়নের নীতি নির্ধারকরা এ রাস্তায় সূচিত সকল বাধা ও অন্তরায়কে নির্মূল করার অব্যাহত প্রয়াস শুরু করে দিয়েছে। নিম্নে আমরা কিছু প্রস্তাব তুলে ধরছি যা তাদের পরিকল্পিত প্রচেষ্টার ইঙ্গিত বহন করে:

১। নর-নারীর অবৈধ ও অবাধ মেলামেশা নারীর মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

২। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সমাজকে নোংরা ও অশ্লীল বানানো এবং পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্য জাতি, যাদের পিতা-মাতার কোন খোঁজ-খবর নেই এবং তাদের জানা নেই যে, তারা কোন মায়ের পেটে আর কোন বাপের ঔরসে জন্ম লাভ করেছে। অন্যান্য জাতিও যেন এদের মত হয়ে যায়!

৩। নারীকে যৌন সুস্থতার সকল সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা।

৪। প্রকাশ থাকে, যখন নারীকে বাজারে বসিয়ে দেয়া হবে এবং দৈহিক কর্মকাণ্ডের মুক্ত অনুমতি দিয়ে দেওয়া হবে, তখন অবশ্যই নানা-রকম রোগ জন্ম নেবে এবং তা সমাজ জীবনে ছড়িয়ে পড়বে। অত:পর বিশ্বের তথাকথিত সংস্কার করা এসব রোগের উৎস মূল কেটে ফেলার পরিবর্তে এর ফলে জন্ম নেয়া রোগ-বালাইয়ের ব্যাপারে সুস্থতার সকল সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করবে যাতে দৈহিক কাজে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না হয় এবং রোগও না ছড়ায়।

৫। গর্ভরোধের বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ব্যাপক করতে হবে, যাতে তরুণ-তরুণীরা বিনা ভাবনায় এই অমানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয় এবং স্বাধীনভাবে এসব প্রকৃতিবিরোধী কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে নতুবা সন্তানের কারণে তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেড়ে যাবে। তাদের মেধা সন্তান লালনে-পালনে ব্যয় হবে। ফলে সে অর্থনৈতিক সমস্যার শিকার হবে। সুতরাং উদ্দেশ্যও যাতে পূরণ হয় এবং কোন বাধাও সামনে না আসে, এজন্য গর্ভরোধের উপায়-উপকরণ পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে নৈতিক ভ্রষ্টতার শিকার প্রত্যেক ব্যক্তি এই উপকরণ সহজেই হাতের মুঠোয় পেতে পারে।

৬। সীমিত সন্তান গ্রহণের ধ্যান-ধারণার বিকাশ দান করা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা পশ্চিমা শক্তির জন্য বিরাট মাথা ব্যথার কারণ। স্বাধীন যৌনকর্মের বিকাশের কারণে জনসংখ্যার খুব দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে। এজন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সীমিত সন্তানের পরিকল্পনা ও ফর্মূলা পেশ করেছে। আর লোকদের মস্তিষ্কে এই মন্ত্র বসিয়ে দিয়েছে, যদি অর্থনৈতিকভাবে তোমাদের মজবুত ও সুসংহত হতে হয় তাহলে ফ্যামিলী প্লানিং করতে হবে এবং অল্প সন্তানই যথেষ্ট মনে করতে হবে। এতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই যে, পাশ্চাত্য জাতি এই ধ্যান-ধারণা চোখ বুজে মেনে নিয়েছে।

৭। কারণ তাদেরও একথা নিশ্চিতভাবে জানা আছে যে, তাদের সন্তান দ্বারা তাদের ভবিষ্যতে কোন আশ্রয় মিলবে না। বরং তাদেরকে পরিণত বয়সে কুকুর ও অন্য কোন জানোয়ারের নিকটেই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হবে। এজন্য সীমিত সন্তানের ফর্মুলা তাদের জন্য নিয়ামত থেকে কম নয়।

৮। ব্যভিচারী নারী-পুরুষের অধিকার স্বীকার করতে হবে। পাশ্চাত্য মস্তিষ্ক তো ব্যভিচারীগোষ্ঠীকে আইনগত স্বাধীনতা দান করেছে। কিন্তু সচেতন ও বিবেকমান জাতির সমাজ এ শ্রেণীকে গ্রহণ করতে কখনই প্রস্তুত নয়। কারণ পাশ্চাত্যের এ জারজ সন্তানেরা তাদের অনুসারী লোকদের নিকট নৈতিকভাবে এ ধ্যান-ধারণা গ্রহণযোগ্য বানানোর জন্য সমাজে অবতীর্ণ হয়েছে।

৯। সমকামিতার বৈধতা স্বীকার করতে হবে। নারী-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশার ফলে যে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড সমাজ জীবনে চলছে তা লূত সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো সচেতন ও বিবেকবান মানুষের নিকট একথা আর গোপন নেই যে, এসব সম্মেলন, কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও তার গৃহীত প্রস্তাবাবলীর উদ্দেশ্য ইসলাম ও অন্যান্য পবিত্র আসমানী শিক্ষার ওপর আক্রমণ করা এবং সকল সমাজকে পশ্চিমা স্টাইলে গড়ে তোলা।

১০। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বিবাহকে ঘৃণার কারণ মনে করা এবং তার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা। সমাজকে কলুষিত করতে হলে সর্বপ্রথম জরুরী নারীকে বিবাহের শৃংখল হতে মুক্ত করে দেওয়া। কারণ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সমাজে যৌন কর্মকাণ্ড বিবাহের পূর্বে তো অনেকটা সম্ভব কিন্তু বিয়ের পর এই আশংকা নিঃশেষ হয়ে যায়। এজন্য বিয়ের ধ্যান-ধারণা ও পরিকল্পনাকেই টার্গেট বানাতে হবে। সুতরাং পশ্চিমারা এই পলিসি গ্রহণ করল, যখন নারী-পুরুষ স্বীয় যৌন কামনা-

বাসনার অগ্নি নির্বাপিত করে ফেলবে তখন সে নিজে নিজেই বৃদ্ধ বয়সের আশ্রয় অনুসন্ধানের জন্য বিবাহ বন্ধনের ব্যাপারে চিন্ত-ভাবনা করবে।

১১। নারীদের ওপর পুরুষের যে অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব রয়েছে তা নির্মূল করতে হবে। এমনিভাবে শিশুদের ওপরও পিতা-মাতার অভিভাবকত্ব প্রত্যাখ্যান করতে হবে যাতে পুরো সমাজে নারীকে বাধা দেওয়ার আর কেউ না থাকে। স্বামী, পিতা-মাতা, ভাই কেউ থাকবে না, বরং তারা স্বাধীনভাবে অশ্লীল কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারবে। ঠিক এ অবস্থাই হবে শিশুদের। তাদেরকে অধ:পতন থেকে বাঁচাবার আর কেউ থাকবে না।

## শিক্ষা ও সম্মেলনের ক্ষতিকর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থাকে গোটা বিশ্বে বিকাশ দান করা এবং তা সবার জন্য আদর্শ বানানো। এজন্য তারা প্রত্যেকে এমন ক্ষেত্র নির্বাচন করেছে, যেখান থেকে তারা স্বীয় লক্ষ্যপানে খুব সহজেই পৌঁছতে পারে। তারা জীবনের এমন প্রতিটি দিককে টার্গেট বানিয়েছে যা লক্ষ্যপানে পৌঁছার রাস্তায় প্রতিবন্ধক হতে পারে। এমনই একটি দিক হলো শিক্ষা, যা যে কোন ধ্যান-ধারণা ও মতবাদকে পূর্ণ শক্তির সাথে পদদলিত করার শক্তি রাখে। এ দ্বারা চিন্তার পানি সিঞ্চন ও মস্তিষ্ক পরিচ্ছন্ন হয়। এখান থেকেই চিন্তা একটি রাস্তা খুঁজে পায় এবং অনুধাবন শক্তি একটি সরু পথ পায়। এজন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই ক্ষেত্রকেও অপবিত্র করা হতে পিছপা হয়নি, বরং এটাকে তাদের নিন্দনীয় উদ্দেশ্য অর্জনের একটি মাধ্যমে পরিণত করেছে যাতে আজ যে প্রজন্ম শিক্ষা অর্জন করছে আগামীকাল যখন তার স্কন্ধে সমাজ বিনির্মাণের দায়িত্ব আসবে তখন তার দ্বারা বিনির্মিত সমাজের ভিত্তি পশ্চিমা মূল্যবোধের আলোকে হয়। আর এভাবেই পশ্চিমা সমাজ নিজে নিজেই সব জায়গায় অস্তিত্ব লাভ করবে। সুতরাং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব পাস হয়েছে তন্মধ্যে কিছু শিক্ষা সম্পর্কেও ছিল। বিশ্বায়নবাদীরা সেসব সম্মেলনে শিক্ষার ওপরে যে সব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে তা নিম্নরূপ:

১। সহশিক্ষার বিকাশ দান।

২। শিক্ষা কারিকুলামে সমঅধিকার ও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অর্থাৎ পাঠ্যসূচীতে নারী-পুরুষের মাঝে কোন ধরনের পার্থক্য করবে না, বরং যাতে এসব পুস্তক পড়ে আরো সমঅধিকারের ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটে।

৩। নারী-পুরুষের যৌন বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এসব প্রস্তাব দ্বারা পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্য সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ সহশিক্ষা দ্বারা সমাজ জীবনে যেসব অনিষ্টকর বিষয় ছড়িয়ে পড়েছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে তা কারো কাছে গোপন নয়। সহশিক্ষা নারী-পুরুষকে দৈহিক কর্মের পথে নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এ ব্যবস্থার পরিনতিতে অশ্লীলতার যে ধারা স্কুল থেকে শুরু হয় তা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে গিয়েও থেমে থাকে না।

অত:পর এটা কিভাবে সম্ভব যে, যে ছাত্র তার শিক্ষা জীবনের একটি বড় অংশ এসব ধ্বংসাত্মক ও অশ্লীলতার মধ্যে ব্যয় করেছে তার প্রভাব তার বাস্তব জীবনেও সংক্রেমিত হবে না? এই সহশিক্ষার ফলে সংঘটিত অনিষ্ট ও অশ্লীলতা সে ছাত্রের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়, যা এই ব্যবস্থার অন্তরালে হয়ে থাকে। বিশ্বায়নের নীতি নির্ধারকরা তাদের এই টার্গেটেও সফলকাম হয়েছে। তারা প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে সহশিক্ষাকে উন্নতি ও উন্নত তাহযীব-তামাদ্দুনের নিদর্শন আর পৃথক শিক্ষাকে পাশ্চাদ্পদতা ও সেকেলে আখ্যা দিয়েছে। সুতরাং সৌদি আরবের সামান্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া পৃথিবীতে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুব কমই পাওয়া যাবে যেখানে সহশিক্ষার প্রচলন নেই। উন্নতির নিদর্শন হওয়ার কারণে এ ব্যবস্থার অসংখ্য ক্ষতিকর বিষয় পর্দার অন্তরালে চলে গেছে। আর বিশ্ব চোখ বুজে এই শয়তানী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। কিন্তু তখন আমাদের বিবেক শোক পালন করে যখন এ তথ্য আমাদের সামনে আসে যে, ইসলামী বিশ্বের সে সব ইউনিভার্সিটিও এ শয়তানী ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে যা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার করা।

মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। মর্যাদাবান আরব নেতারা উক্ত ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলরের কাছে দাবী করেছিল, সহশিক্ষা ব্যবস্থা নির্মূল করে পৃথক ব্যবস্থা প্রচলন করা হোক এবং মেয়েদের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধাসহ একটি পৃথক ভবন নির্মাণ করা হোক। এই প্রজেক্টে যত খরচ আসে তা আমরা বহন করব। কিন্তু ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর আরব নেতাদের এ দাবী প্রত্যাখ্যান করে হাজারো লোকের জনসমাবেশে আরব নেতাদের যে জবাব দিয়েছেন তা শুনে কলিজা বের হয়ে আসে।

নৈতিক অবক্ষয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় এ পরিমাণ প্রভাবিত হওয়ার ওপর যতই আফসোস করা যায় তা অতি নগণ্য। ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেব তার ইসলামী মর্যাদাবোধ ও চেতনাকে বিসর্জন দিয়ে বলেন, “সহশিক্ষা নির্মূল করে পৃথক শিক্ষা

ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমাদের ওপর মৌলবাদ ও পশ্চাৎপদতার অভিযোগ আসতে পারে। এ দ্বারা আমাদের ইউনিভার্সিটির ভাব-মর্যদা বিনষ্ট হতে পারে। এজন্য মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা কোনক্রমেই পৃথক করা সম্ভব নয়।" এ ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়, যারা সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে তারা তাদের হীন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কী কী কৌশল গ্রহণ করেছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারাকে সভ্যতা ও উৎকর্ষের নিদর্শন আখ্যা দেওয়া এবং তার মোকাবেলায় অন্যান্য মতবাদকে পরিত্যক্ত ও অসভ্য প্রমাণিত করতে তারা কত ধরনের প্রোপাগান্ডর আশ্রয়ই না নিয়েছে!

নি:সন্দেহে বিভিন্ন উপকরণ ও মিডিয়ার সাহায্যে পরিচালিত এই প্রোপাগান্ডার ফলই হলো একটি মুসলিম দেশ, যে দেশকে পাশ্চাত্য শক্তি সব সময় আতংক মনে করে। কারণ সে পাশ্চাত্য শক্তির অর্থনৈতিক গোলামীর নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে ইসলামী অর্থনীতির আলোকে একটি নিজস্ব অর্থনীতি চালু করেছে, তার এ অর্থনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রচার মাধ্যমের সচেতন শ্রেণী তাকে 'এশিয়ান টাইগার্স' উপাধি দিয়েছে। সে দেশের ইসলামিক ইউনিভার্সিটির একজন ভাইস-চ্যান্সেলর ইসলামী চিন্তাধারা ও শিক্ষাকে পরিত্যক্ত ও সেকেলে আখ্যা দিয়ে পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে পরিচালিত ক্রমবর্ধমান প্রোপাগান্ডার সয়লাবে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন।

## স্বাস্থ্যের ওপর পতিত ক্ষতিকর প্রভাব

আল্লাহ্ তায়ালার প্রকৃতি ও অমোঘ নিয়মবিরোধী যে কাজই হবে তার খারাপ ও ক্ষতিকর প্রভাব নি:সন্দেহে প্রকাশিত হবে এবং তা ব্যক্তি ও সমাজ-উভয়ের ওপরেই প্রভাব ফেলে। পশ্চিমা সমাজ মূলত প্রকৃতিবিরোধী বস্তুরই নাম। সে সমাজে যেসব আচার-আচরণ ওহি ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা ও বিবেক অনুযায়ী হবে, তাকে অপছন্দনীয় ও পশ্চাৎপদতার নিদর্শন মনে করা হয়। আর জ্ঞান ও বিবেকবিরোধী যে কর্মকাণ্ডই করা হয় তা সে সমাজের পালিত লোকদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয়। বিশ্বায়নের সাইনবোর্ডে অনুষ্ঠিত সকল সম্মেলনে যে সব নিন্দনীয় প্রস্তাব পাস হয়েছে, তার উদ্দেশ্য পশ্চিমা সমাজের বিশ্বায়ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এজন্য সে সব প্রস্তাবের পূর্ণ শক্তি এর ওপরেই ছিল যে, 'নারী' কে তার নিরাপদ ঘর থেকে বের করে সড়কে বসিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে বাজারের একটি পণ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে। আর এসব কিছু তার ক্ষমতায়ন ও অধিকারের নামে করা হবে,

যাতে ঐ স্থানে আসা পর্যন্ত সে কোন সন্দেহ-সংশয়ের শিকার না হয়। ফল এই হয়েছে, পশ্চিমা সমাজে নারী পুরুষের পশুত্ব নিবারণের একটি মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সেখানে আত্মীয় ও সম্পর্কের কোন অস্তিত্ব অবশিষ্ট নেই। বিবাহ বন্ধন ছাড়াই নারী-পুরুষ এক সাথে রাত কাটানো ও আমোদ-ফূর্তি করা একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে!

এই হলো পশ্চিমা সমাজের অবস্থা। আর এই পাশ্চাত্য সমাজেরই আজ বিশ্বায়ন হচ্ছে। বিশ্বায়নবাদীরা আজ বিশ্ববাসীর কাছে দাবী করছে, তারা এই 'অসভ্য' সমাজের জন্য তাদের দুয়ার খুলে দেবে। অথচ এই পশ্চিমা অসভ্য সমাজের ফলেই আজ বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক রোগের একটি "এইডস" খুব দ্রুত প্রসার লাভ করছে। প্রতিটি দিন লাখ লাখ মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এ রোগের সবচেয়ে বড় কারণ ঐ অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক ও মেলামেশা, পশ্চিমা বিশ্ব যার সবচেয়ে বড় পতাকাবাহী ও প্রবক্তা। কিন্তু সেসব সম্মেলনে এ বিপজ্জনক রোগের আসল ও শিকড়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে শুধু এমন কিছু প্রস্তাব পাস হয়েছে যা 'এইডস' প্রতিরোধে কোনই ভূমিকা রাখতে পারে না। সে সব প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নারী-পুরুষের মাঝে নিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক হওয়া উচিত, যাতে কোন ভয়াবহ রোগ সৃষ্টি না হয়। এমনিভাবে সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দৈহিক সম্পর্কের কারণে সৃষ্ট রোগের প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সেসব রোগ আক্রান্ত তরুণ-তরুণীদের চিকিৎসা অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে করা হবে। উক্ত রোগ থেকে মুক্তিদাতা উপায়-উপকরণ খুব অল্প মূল্যে প্রদান করতে হবে, যাতে দৈহিক কাজের মাঝে তা ব্যবহার করে রোগ থেকে বাঁচতে পারে।

প্রকাশ থাকে, এই কিছু ফাঁকা বুলি দ্বারা মহামারীর রূপ ধারণকারী এক ভয়াবহ রোগ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের প্রবৃত্তি পূজারীদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ রোগ বর্তমানে সবচেয়ে বেশী ও দ্রুত প্রসারিত একটি রোগে পরিণত হয়েছে। এজন্য এইডসের শিকার লোকদের দু:খ-ব্যথায় অংশ গ্রহণ করার জন্য সেসব সম্মেলনের মুখ থেকে আরো অতিরিক্ত কিছু বাক্য বের হয়েছে। যেমন- "এইডসের শিকার লোকদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।" অথচ পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে তাদের সমাজ ব্যবস্থার বিশ্বায়নের অভিলাষের ভিত্তিতে টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে এ নোংরা মতবাদের খুব প্রসার করা হচ্ছে।

এজন্যই অবৈধ দৈহিক সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট রোগ-বালাইয়ের কোন হ্রাস হচ্ছে না বরং এইডস ছাড়াও আরো অনেক কঠিন কঠিন রোগ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। আর কুমারী মেয়েদের সাথে দৈহিক সম্পর্কের প্রবণতা প্রবল আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোপ ও আমেরিকাতে ২০/২৫ বছর বয়সী নারী-পুরুষ বিয়ে ছাড়াই যৌন পিপাসা নিবারণ করে এবং এভাবেই জীবন কাটানোকে পছন্দ করে। ইউরোপে এ ধরনের লোকদের হার ৪০ থেকে ৯০ শতাংশ অর্থাৎ হাজারে মাত্র ৩৬ জন লোক বিয়ে করে।[১২৮] এত বিপুল পরিমাণ অবৈধ দৈহিক কর্মকাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল এই যে, পশ্চিমা দেশসমূহের জনসংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বর্তমান সময়ে জাতিসংঘের জন্য সবচেয়ে বড় মাথাব্যাথার কারণ। এজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে বিশ্বায়নবাদীরা গর্ভরোধের ধ্যান-ধারণা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক করা শুরু করেছে। তার বিভিন্ন উপকার শুনিয়ে গোটা জাতিকে অবৈধ কাজে লিপ্ত করে মানব হত্যার প্রতি উৎসাহিত করছে, বরং এটিকেও নারীর মৌলিক অধিকার সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং গর্ভরোধ সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "এমন আইন, যা গর্ভরোধকে বেআইনী বলে তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।" "গর্ভরোধ নারীর একটি মৌলিক অধিকার। তার এই অধিকার খুব সহজেই অর্জিত হওয়া উচিত।" "গর্ভরোধের জন্য বিশেষ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

প্রবৃত্তির দাসদের আর কি চাই? এসব প্রস্তাব পাস হওয়ার পর গর্ভরোধ প্রবণতা অন্য ভাষায় মানব হত্যার প্রবণতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৬-এর সমীক্ষা মতে ৭৫ শতাংশ অবিবাহিতা নারী গর্ভরোধ করে, সরকার ২ লাখ আইনগতভাবে গর্ভরোধকারীদের জন্য ৫৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। ৭৫ শতাংশ বিবাহিতা রমণী গর্ভরোধ করে আর দুই-তৃতীয়াংশ শ্বেতাঙ্গ নারীরা গর্ভরোধ করে। তন্মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ১৪ থেকে ১৫ এর মধ্যে।[২] নোংরা জীবন ও ভয়াবহ রোগের শিকার এই সেই পাশ্চাত্য সমাজ যাকে বিশ্বায়নবাদীরা অনুসরণীয় মনে করে এবং গোটা বিশ্বে বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চায়, যার জন্য তারা তাদের টিভি স্টুডিও 'হলিউড' কে ওয়াক্‌ফ করে রেখেছে। সেখান থেকে নগ্ন ও অশ্লীল চলচ্চিত্র বিপুল হারে তৈরি হয়ে গোটা বিশ্ব, বিশেষ করে আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে।

---

১২৮ । মাগরিবী মিডিয়া আওর উসকে আছারাত, পৃ. ৩৫ ।

বরং আরব বিশ্বেই হলিউড-এর পদাঙ্ক অনুসরণে বিপুল আকারে নগ্ন ও অশ্লীল চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে যা দেখে আরব তরুণ-তরুণীরা নৈতিকতাশূণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিমা দেশের মত আরব দেশেও বিশেষ করে মিসরে অবৈধ দৈহিক সম্পর্কের প্রবণতা খুব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গর্ভরোধের প্রবণতাও বিরাট উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি বলা হয়, অর্ধেক আরব দ্বীপে আইনগতভাবে ও পুরো আরব বিশ্বে বেআইনীভাবে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা ছেয়ে গেছে এবং সামাজিক বিশ্বায়নের হীন স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে গেছে তাহলে মোটেই ভুল হবে না!

## অর্থনীতির ওপর পতিত ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ

নারীর সঠিক মর্যাদা ও লুণ্ঠিত অধিকার ফিরিয়ে আনার নামে পাশ্চাত্য যে সব সম্মেলন ও কনফারেন্স করেছে তার নেতিবাচক প্রভাব শুধু সমাজ, চরিত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপরেই পড়েনি, বরং পাশ্চাত্য নারী সমাজকে পুরো বিশ্বের মডেল ও আদর্শ বানানোর ধ্যান-ধারণা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমা সমাজ যেখানে নারীকে তার নিরাপদ ঘর থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে সড়কে ঠেলে দিয়েছে এবং যেখানে নারীদের মর্যাদা বাজারে বিক্রীযোগ্য সাধারণ পণ্যের চেয়ে মোটেও বেশী নয়, সেখানে নারীদের ব্যাপারে এটা কোনই আশ্চর্যের বিষয় নয়, তারা সমঅধিকারের স্লোগান দিয়ে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অফিস-আদালতে চাকুরী করবে। আর ঘর ও পারিবারিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব সাথী বা স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। কারণ পাশ্চাত্য শক্তি যারা নারীর অধিকারের নামে নারীকে "উলঙ্গ ও ফ্রি সার্ভিস" বানানোর জন্য জোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, তারা একথা ভালোভাবেই জানে যে, যেই সমঅধিকারকে বুনিয়াদ বানিয়ে নারীকে বাজারী বানানোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তা বাস্তবতার রূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং নারী পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা।

কিন্তু যেহেতু পাশ্চাত্যের আসল উদ্দেশ্য হলো নারী থেকে তার সতীত্ব, পবিত্রতা ও শালীন পোশাক খুলে দূরে নিক্ষেপ করে তাকে উলঙ্গ করা, সে মতে এ উদ্দেশ্য পুরো করার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীর ওপর নির্যাতন শুরু হলো। নারীকে দোকানের কাউন্টারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো যাতে ব্যবসায় লাভ হয়। ইউরোপ, আমেরিকা ও পাশ্চাত্য পূজারী দেশগুলোতে চাকরী শুধু নারীর জন্যই খাস করে দেওয়া হলো। বিমানের এয়ার হোস্টেস দেখে মনে হয় বিমান আবিষ্কারের

পূর্বেই এ চাকরী নারীদের জন্য লিখে দেওয়া হয়েছিল। পাশ্চাত্যের এয়ার লাইন্সতো দূরে থাক, আরব বিশ্বের এয়ার লাইন্সের অবস্থাও এই, এমন কি সৌদী আরব যেখানে পর্দা এখনো সরকারীভাবে বাস্তবায়িত আছে তারাও নারীকে এয়ার হোস্টেস বানানো ছাড়া থাকতে পারেনি। পাশ্চাত্য তাদের কৌশল ও যুদ্ধে ১০০% সফলকাম। কারণ এমন কোন দেশ বর্তমানে নেই যার এয়ারলাইন্সে নারীরা কাজ করে না। ঘর থেকে বের করে নারীকে বাইরের কাজে লাগানোর জন্য পাশ্চাত্য যেসব অস্ত্র ব্যবহার করেছে তার সফলতার জন্য উল্লিখিত সম্মেলনসমূহের প্রস্তাবাবলীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ সেসব সম্মেলনের পর তুলনামূলক কম স্বাধীন মনোভাবী দেশগুলোও এমন আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছে যার মধ্যে নারীর বাইরের দায়িত্ব পালন করার অনুমতি থাকবে। ইসলাম নারীর জন্য বাইরের কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের কখনোই বিরোধী নয়। তবে এক্ষেত্রে শরীয়তের একটি সীমারেখা আছে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। অন্য ভাষায় নারীর জন্য ইসলামী শরীয়ার সীমারেখা ভঙ্গ করে বাইরের কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে কোনক্রমেই অনুমতি নেই। কিন্তু পশ্চিমা সমাজ নারীকে এমন স্থানে এসে বসিয়ে দিয়েছে যেখানে শরীয়তের সীমারেখা ঠিক রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

দুঃখজনক বিষয় হলো, সমঅধিকারের দর্শনের মোকাবেলায় মুসলিম নারীদের দৃষ্টিতে শরীয়তের সীমারেখার কোনই মূল্য নেই। সঠিক অর্থে বলা যেতে পারে, উপমহাদেশের সামান্য কিছু মুসলিম অঞ্চল বাদ দিয়ে আরব বিশ্বসহ এমন কোন মুসলিম দেশ নেই যেখানে এই সমঅধিকারের ধ্যান-ধারণা জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি, যেখানকার জনগণ এই সাম্য ও সমঅধিকারের জাদুতে আচ্ছন্ন নয়। উল্লিখিত সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী পূর্ণভাবে সফলকাম হয়েছে। সেসব প্রস্তাবে নারীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল "তারা ঘরের কাজ কর্ম করবে না, কারণ এতে তার কোন পারিশ্রমিক অর্জিত হয় না এবং অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত হয় না। এজন্য নারী ঘরের বাইরে ততটুকু সময়ই কাটাবে যতটুকু সময় পুরুষ কাটায়। এ ব্যাপারে সরকারও তার আইন ও প্রশাসন সংস্কার করবে যার ভিত্তিতে নারীর কোন চাকুরী গ্রহণের কষ্ট না হয়।"[১২৯]

## নারী বিষয়ক বিভিন্ন সম্মেলনের কিছু ইতিবাচক দিক

ইতোপূর্বে আমরা 'নারী অধিকার' সংক্রান্ত জাতিসংঘের পতাকাতলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মেলনের প্রস্তাবের মাধ্যমে সংগঠিত নেতিবাচক দিকসমূহের বিশ্লেষণ ও

---

১২৯। প্রবন্ধ, আল- আওলামাতুল ইজতিমাইয়্যা লিল মারওয়াহ্ ওয়াল উসরা, মাসিক আল বয়ান, সংখ্যা- ১৭০।

পর্যবেক্ষণ করেছি। এসব নেতিবাচক দিক বিশেষ কোন ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমিত নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এটাও একটি বাস্তবতা যে, সেসব প্রস্তাবের কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে যদিও তার মর্যাদা আটার মধ্যে লবণের সমতুল্য। কিন্তু নিম্নে আমরা সে ইতিবাচক দিকগুলোর বিশ্লেষণ করব। কারণ ইনসাফের দাবী এটাই। আল্লাহ্ পাক বলেন, "কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো, এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী।" (সূরা আল মায়েদাহ্, আয়াত- ৮)

মোট কথা উল্লিখিত সম্মেলনসমূহের প্রস্তাবাবলী দ্বারা নিম্নবর্ণিত ইতিবাচক দিকগুলো সামনে আসেঃ

১। নারীদের শিক্ষা দ্বারা সজ্জিত করা এবং তাদের থেকে নিরক্ষরতা দূর করার প্রয়াস চালানো।

২। নারী, বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণীর নারীদের বিশেষ রোগ নির্মূল করার প্রচেষ্টা করা।

৩। আন্তর্জাতিক কিছু চক্রের মাধ্যমে পরিচালিত নারী ও শিশু ব্যবসা ও তাদের যৌন নিপীড়নের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং এগুলোকে আন্ত র্জাতিক ক্রাইমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

৪। নারীদের নিম্ন স্তরের জীব ও যৌনবাজারে একটি পণ্যের মর্যাদা দিয়ে প্রদর্শন না করার প্রতি মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমকে উৎসাহিত করা।

৫। একই ধরনের কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে বেতন সমান রাখা।

৬। কর্মজীবী নারীদের গর্ভের সময় ছুটি প্রদানের জোরালো আহ্বান।

৭। পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর বিরুদ্ধে যৌন বর্বরতার প্রতিরোধ।

৮। সন্তানদের বৈষম্য সৃষ্টি না করার প্রতি পিতা-মাতাকে উপদেশ।

৯। উদ্বাস্তু ও শরণার্থী নারীদের অসহায় অবস্থা ও তাদের দারিদ্র্য থেকে ফায়দা উঠিয়ে নির্যাতন করার ওপর নিষেধাজ্ঞা।

১০। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করার ওপর পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা।

এই সামান্য কিছু ইতিবাচক দিক যা প্রস্তাবাবলী নিশ্লেষণ করলে সামনে আসে, যদিও নেতিবাচক দিকসমূহের তুলনায় তার সংখ্যা ও তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিতান্তই

নগণ্য ও সীমিত, বরং যদি বলা হয়, সেসব পাসকৃত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তাবলীকে "উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশী" তাহলে ভুল হবে না।

## ইসলামী বিশ্বে সম্মেলনের কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা যেহেতু পশ্চিমা সমাজের বিশ্বায়নের রাস্তায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক, এজন্য পাশ্চাত্য শক্তি তাদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে রাস্তা হতে এ কাঁটা ও প্রতিবন্ধকতা সরানোর জন্য। পশ্চিমাদের সবচেয়ে বেশী প্রচেষ্টা হলো, যে কোনভাবেই হোক, ইসলামী বিশ্ব পশ্চিমা বিশ্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাক। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিশ্বায়নবাদীরা ইসলামী বিশ্বেও কিছু সম্মেলন করেছে। সে সময় ইসলামী বিশ্বে নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় অবস্থাই সামনে এসেছে। নেতিবাচক দিকসমূহের বিশ্লেষণ করলে আফসোস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না, বরং আরো এই আশংকা সৃষ্টি হয়, সামাজিক বিশ্বায়ন তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের অতি নিকটে পৌঁছে গেছে। হয়তোবা খুব তাড়াতাড়ি ইসলামী বিশ্ব হতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বিদায় হয়ে যাবে এবং তার স্থানে নৈতিকতা ও সভ্যতাশূন্য একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় ইসলামী বিশ্বে এমনও কিছু নারীবাদী সংগঠনের জন্ম লাভ হয়েছে যারা ইসলামী সভ্যতা ও সমাজ ধ্বংস করার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের প্রস্তুতিতে ব্যাপক অংশ গ্রহণ এবং তা সফল করার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সবচেয়ে জঘন্য সম্মেলন 'বেইজিং সম্মেলন'- এর প্রস্তুতি সংক্রান্ত কিছু বৈঠক ও মিটিং নারীবাদী সংগঠনের তত্ত্বাবধানে জর্দানে অনুষ্ঠিত হয়। নারীদের এভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে আরব নারীদের মধ্যে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা উদ্বেগের পর্যায়ে পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাশ্চাত্য পূজায় চরম উৎকর্ষ ঘটেছে। অনেক নারী এই ভুলের শিকার হয়েছে যে, ইসলাম তাদের অধিকারের ব্যাপারে নীরব এবং তার ক্রোড়ে থেকে তারা তাদের অধিকার অর্জন করতে পারেনি। আর পাশ্চাত্য এ সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে খুব সচেতন। এমনিভাবে ইসলামী বিশ্বের নারীবাদী সংগঠন, নারী ও পরিবার বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার জন্য বিদেশী সাহায্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশ থেকে এই সাহায্য তখনই মিলবে যখন উল্লিখিত সংগঠন ও সংস্থাসমূহ পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার বিকাশ ও বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে।

সে সব নারীবাদী সংগঠনের ভূমিকাতেই আজ ইসলামী বিশ্বে নারী ও পরিবার সংক্রান্ত আইন-কানুন পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন বিয়োজন করার জোর দাবী উঠেছে, বরং মিসরে তো এ দাবী একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে! মিসরে এ আন্দোলন তখনই স্তিমিত হয় যখন পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আলোকে রচিত আইন মিসরে বাস্তবায়ন করা হয়। এ নেতিবাচক পরিস্থিতির মোকাবেলায় যদি আমরা সেই দূর-দূরান্তের ইতিবাচক অবস্থার বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আশার একটি কিরণ উঁকি মারে। সম্ভবত ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের অনুসারী ও ইসলামী সমাজে লালিত বীর পুরুষেরা সেই পাশ্চাত্য সমাজের সয়লাব প্রতিরোধে সক্ষম হবেন যা বিশ্বায়নের পতাকা নিয়ে খুব দ্রুত ইসলামী বিশ্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, যদি তাৎক্ষণিক কোন সক্রিয় পদক্ষেপ ও সামষ্টিক কৌশল গ্রহণ না করা হয় তাহলে বিস্তৃত ইসলামী বিশ্বকে বিজয় করতে তাদের দেরী হবে না। কিন্তু ইতিবাচক পরিস্থিতি দ্বারা হৃদয়ে অবশ্যই এ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে যে, এ সয়লাব ও প্লাবন প্রতিরোধ করা এবং তার ওপর বাঁধ নির্মাণ করা মুসলিম উম্মাহর শক্তির বাইরে নয়, বরং হিম্মত করলে পাশ্চাত্য থেকে আসা এ সয়লাবের ওপর বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু মুসলমানদের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র গভীরভাবে অনুধাবন ও সচেতনতা সৃষ্টি হওয়া। আর তা ব্যাপকভাবে পশ্চিমীকরণের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। কায়রো ও বেইজিং সম্মেলনের পর ইসলামী বিশ্বে এ ধরনের কিছু প্রতিক্রিয়াও পরিলক্ষিত হচ্ছে যা দ্বারা মনে হচ্ছে, সে সব সম্মেলনের মাধ্যমে সংঘটিত বিপর্যয়ের ব্যাপারে ইসলামী বিশ্ব ওয়াকেফহাল আছে!

বেশ কিছু ইসলামী সংগঠন, বিশেষ করে সৌদি আরবের সুপ্রীম উলামা কাউন্সিল, উলামায়ে আযহার কায়রোও বেইজিং সম্মেলনের ইশতেহারের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন এবং জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে পরিচালিত প্রোপাগান্ডা দ্বারা প্রভাবিত না হয়। উলামাদের এ আহ্বান ও সতর্ক করার ফলে বিপুল সংখ্যক জনগণ পশ্চিমা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে গেছে, বরং নারীদের কিছু অংশ এক কদম অগ্রসর হয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করে জাতিসংঘের সম্মেলনের মত তারাও সম্মেলনের আয়োজন করেছে এবং নারী ও শিশু বিষয়ক ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকেফহাল করেছে। সুতরাং ১৯৯৬ সালে খারতুমে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর উইমেন (আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন)- এর ভিত্তি স্থাপিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল দ্বীন, ধর্ম, মানব সভ্যতা ও

নারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অত্যাচার ও নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধ করা। এ ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বপ্রথম ২৫ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০০- এ একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। এমনিভাবে আন-নদওয়াতুল আলামিয়াহ্ লিশ শাবাবিল ইসলামী [ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইউথ(ওয়ামী)]-এর জেনারেল সেক্রেটারী ড. মানে' হাম্মাদ আল জুহানী মরহুমও তার সংগঠনের প্লাটফরমে জাতিসংঘের মাধ্যমে রচিত ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। এছাড়াও আরো অনেক সংগঠন-সংস্থা এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছে। এসব প্রয়াস দ্বারা এতটুকু তো অনুমান করা যায় যে, মুসলিম উম্মাহর মৃত শরীরে এখনো কিছুটা প্রান বাকী আছে।

## এসব সম্মেলন কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়

সামাজিক বিশ্বায়নের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত এসব সম্মেলন তার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ করতেই থাকবে। ভবিষ্যতেও পশ্চিমা শক্তির পক্ষ থেকে এ ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকবে যার উদ্দেশ্য জীবন্ত জাতিকে মৃত জাতির অনুসারী বানানো এবং বিবেকবান ব্যক্তিকে বিবেকহীন মানুষের গোলাম বানানো। এসব সম্মেলনের উদ্দেশ্য রুহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতা নির্মূল করে বস্তু এবং জড়বাদের বিকাশ দান করা। পাশ্চাত্য সমাজকে অনুসরণীয় ও আদর্শ বানানোর আগ্রহে নৈতিকতাসম্পন্ন জাতিকে নৈতিক অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেওয়া। কিন্তু প্রশ্ন হলো: সম্মেলনের আকৃতিতে পরিচালিত এসব ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ কিভাবে করা যাবে? কিভাবে তাতে পাসকৃত প্রস্তাবাবলীর প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করা যায় এবং এর পূর্বে যে সব ক্ষতিকর ফলাফল সামনে এসেছে তার মূলোৎপাটনের জন্য কি পদ্ধতি ও কর্মকৌশল গ্রহণ করা যায় ?

ড. ফুয়াদ বিন আবদুল করীম আলে আবদুল করীম এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন যার সাহায্যে সে সমস্ত ষড়যন্ত্রের উত্তর দেওয়া যেতে পারে। তিনি তার উপস্থাপিত সুপারিশগুলো দুই ভাগে বিভক্ত করেন:

১। দৃষ্টিভঙ্গিগত পদক্ষেপ।

২। কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপ।

### ১. দৃষ্টিভঙ্গিগত পদক্ষেপ

ক) মুসলিম উম্মাহকে এসব সম্মেলনের ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো, এমন কি তার অনৈসলামী বরং ইসলামবিদ্বেষী উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে অবহিত করতে

হবে। জনগণকে বলতে হবে, এসব সম্মেলন বিশ্বায়নের (যা সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ) রাস্তা সুগম করার একটি মাধ্যম। এসব কাজের জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়া ব্যবহার করতে হবে। এমনিভাবে আলেম-উলামা, দাঈ-মুবাল্লিগ, পীর-মাশায়েখ, চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও তাতে উপস্থাপিত লেকচারের আলোচ্য বিষয় একেই বানাতে হবে।

খ) মুসলিম বিশ্বের মন্ত্রণালয়, সরকারী, বেসরকারী সংগঠন ও সংস্থা, বিশেষ করে প্রতিটি মুসলিম দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয় ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এমনিভাবে রাবেতা আলমে ইসলামী, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ও প্রতিটি স্থানের ফতওয়া বিভাগ এসব ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধরনের সম্মেলন ও তার ঘৃণ্য সংকল্পের বিরুদ্ধে বিপুল আকারে পত্র-পত্রিকায় নিন্দা জ্ঞাপন করবে যাতে জনগণ এর দ্বারা প্রতারিত না হয়।

১। ইসলামী সংগঠনগুলো মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটনের জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ইসলামকে একটি অনুকরণীয় ও আদর্শ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জাতির সামনে উপস্থাপন করবে।

২। মুসলিম সংগঠন-সংস্থা, বিশেষ করে ইসলামী নারীবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে মুসলিম ফ্যামিলী ল' সংক্রান্ত এমন পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশ করবে যার মধ্যে নারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা থাকবে এবং পশ্চিমা সমাজে নারীর অবস্থা ও মর্যাদা সম্পর্কে মুসলিম নারীদের অবহিত করবে।

৩। অত্যন্ত সচেতনতার সাথে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সম্মেলনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এমনিভাবে অতীতে নারী সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলনসমূহের প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গৃহীত বাস্তব পদক্ষেপসমূহের বিশ্লেষণ করবে।

৪। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন করবে এবং তার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করবে, জাতিসংঘের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এসব সম্মেলন ইসলাম বিরোধী।

৫। যেসব মিডিয়া সম্মেলনের কভারেজ দেয় তাদের ওপর গণচাপ বৃদ্ধি করবে যাতে নৈতিকতাহীন কোন প্রস্তাব বিপুল আকারে জনগণের সামনে না আসতে পারে এবং জনগণ তার ঘৃণ্য প্রভাব মুক্ত থাকে।

৬। বালক-বালিকাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবে যার মধ্যে পরিবারের গুরুত্ব, ইসলামে নারীর মর্যাদা, নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের শরয়ী তাৎপর্য, দাম্পত্য অধিকার, সন্তান প্রতিপালনের সক্রিয় ও কার্যকর মাধ্যম ইত্যাদি বিষয় থাকবে এবং তাতে প্রকৃতিবিরোধী চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের বিশ্লেষণ করা হবে। এমনিভাবে তাতে পরিবার ও মুসলিম রমণীদের অধ:পতন ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া এবং সামাজিক বিশ্বায়নের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারের মুখোশ উন্মোচন করা হবে এবং সেসব সম্মেলনের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য জনসম্মুখে তুলে ধরা হবে।

৭। ইমাম ও খতীবগণ এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁরা তাদের ভাষণ ও আলোচনায় দ্বীনী দিকনির্দেশনার সাথে সাথে এসব সম্মেলন ও তার সুপারিশমালার প্রতিও কড়া সমালোচনা করবেন যাতে বর্তমান সময়ের তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীরা পাশ্চাত্যের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

### ২. কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপ

ক) এসব চরিত্রবিধ্বংসী সম্মেলন ও বৈঠকে প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং সামাজিক বিষয়ে ইসলাম প্রদত্ত সমাধান বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

এমনিভাবে পশ্চিমা জীবন পদ্ধতির মাঝে নিহিত ক্ষতিকর বিষয়গুলো সম্পর্কে জাতিকে অবহিত করতে হবে। কারণ এসব সম্মেলন যদি বয়কট করা হয় তাহলে এ দ্বারা কিছুই প্রভাব পড়বে না। কারণ দুর্বল যদি শক্তিশালীকে বয়কট করে তাহলে এ দ্বারা শক্তিশালী ও সবলের ওপর বিশেষ কোন প্রভাব সৃষ্টি হবে না। কিন্তু যদি এ বয়কট শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে করা হয় তাহলে প্রতিপক্ষ মাথা নত করতে বাধ্য হবে। এর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে বিদ্যমান। আমেরিকা জাতিসংঘের নিম্ন সংগঠন ইউনেস্কোকে বয়কট করেছে যার ফলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারী আন্তর্জাতিক সংগঠন শেষ পর্যন্ত বিদায়ের প্রহর গুণতে বাধ্য হয়েছে।

আজ যদি মুসলিম উম্মাহ এসব সম্মেলন বয়কট করে তাহলে এ দ্বারা কিছুই প্রভাব পড়বে না। কিন্তু এর পরিবর্তে যদি মুসলমানরা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে এবং ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা পূর্ণ শক্তির সাথে বিশ্বায়নবাদীদের সামনে তুলে ধরে তাহলে এর দ্বারা ইতিবাচক ফলাফল বের হওয়ার

আশা করা যেতে পারে, বরং অতীতে এমনটি দেখাও গেছে। সুতরাং ১৯৯৪ সালের কায়রো সম্মেলন এবং ১৯৯৫ সালের বেইজিং সম্মেলনে ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন এবং উক্ত দুই সম্মেলনের কিছু কিছ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা কিংবা তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খ) ইসলামী বিশ্বে যেভাবে পশ্চিমা চিন্তাধারার বিস্তার ঘটছে তার বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ এবং তার মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে কৌশল গ্রহণ করার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র কায়েম করতে হবে।

সেসব প্রতিষ্ঠানে সামাজিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ব্যাপারে পূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য বিদ্যমান থাকবে, সাথে সাথে এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক এমন গবেষক ও চিন্তাবিদদের সাথেও থাকতে হবে, যাদের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার মূলোৎপাটনের দুরন্ত আকাংখা বিদ্যমান, যাতে এসব প্রতিষ্ঠান সে সমস্ত চিন্তাবিদদের অভিযানে সহায়তা করতে পারে।[১৩০]

এত বিস্তারিত আলোচনার সারমর্ম হলো, বিশ্বায়ন নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক বিশ্বায়ন ও পশ্চিমা সমাজকেই আদর্শ ও মডেল বানানোর খাতিরে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে এবং চরিত্র বিধ্বংসী বিভিন্ন প্রস্তাব পাস করে, যার মধ্যে তারা নারীকে নিজেদের ফাঁদে আটকিয়ে জীবন্ত জাতির সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস ও বরবাদ করার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যৌনতার সুড়সুড়ি ছড়িয়ে আছে। এর ছত্রছায়ায় পালিত নব প্রজন্মের লক্ষ্য এই থাকে যে, কিভাবে তাদের যৌন পিপাসা নিবারিত হয় এবং তারা একটি অমানবিক ও অপ্রাকৃতিক কর্মকে সবচেয়ে প্রিয় কাজ মনে করে গ্রহণ করে। এমন সমাজ যেখানে নির্লজ্জতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতাকে প্রগতি ও আধুনিকতার নিদর্শন মনে করা হয় আর লজ্জা-শরম, পবিত্রতা ও সততাকে পশ্চাৎপদতা ও সেকেলে মনে করা হয়। সে সমাজ আজ প্রাচ্যের দিকে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, বরং তার পা মজবুত করে বসেছে। যে দৃশ্যের অবতারণা ও কল্পনা একসময় শুধু পাশ্চাত্যেই করা হতো, আজ তা প্রাচ্যের দেশগুলোতেও প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমের মত প্রাচ্যেও যৌন বিপথগামিতা, নগ্নতা ও

---

১৩০। প্রাগুক্ত।

অশ্লীলতা একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি বড় বড় শহরে সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্যের বাজার বসে। সেখানে যে কেউ ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে পারে।

কিন্তু শুধু যে যৌনতাই পাশ্চাত্য থেকে এসে প্রাচ্যে মহামারীর রূপ ধারণ করছে এমনটি নয়, বরং সামাজিক বিশ্বায়নের ফলে এর ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক রোগ, যা চরিত্রবান ও উন্নত রুচির মানুষের জীবন পদ্ধতির জন্য একটি ক্যান্সারতুল্য তাও প্রাচ্যে ছেয়ে যাচ্ছে।

আসুন! আমরা পাশ্চাত্য সমাজের তৈরিকৃত কিছু চরিত্রবিধ্বংসী সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করি যেগুলোর বিশ্বায়ন অত্যন্ত পরিকল্পিত ও খুব জোরেশোরে চলছে।

## সামাজিক বিশ্বায়নের কিছু প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

সামাজিক বিশ্বায়নের ফলে উন্নত ও অনুন্নত সকল দেশে অন্যায়-অপরাধ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জার্মান লেখক হ্যান্স পটার মার্টিন ও হেরাল্ড সৌমিন স্বীয় গ্রন্থ "ফাখখুল আওলামা" (আরবী অনুবাদ)-এ লিখেন, "অর্থনীতির উপর আরোপিত আইনী নিষেধাজ্ঞা দূর হয়ে যাওয়া দ্বারা অপরাধী গোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশী ফায়দা হয়েছে, যাদের নেটওয়ার্ক কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে আছে। পুলিশ ক্রাইম কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠানের নিকট এ বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে সুসংগঠিত অপরাধের হার বিস্ময়কর সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। আন্তর্জাতিক পুলিশ (ইন্টারপোল)-এর একজন অফিসার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "যেসব বিষয়কে আজ আমরা মুক্ত বাণিজ্যের স্বার্থের অনুকূল মনে করি, সেসব বিষয়ই আজ অপরাধী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূলে চলে যায়।"

প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বায়নের এ ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক সেক্টরে ততটুকু প্রবৃদ্ধি ঘটেনি, যতটুকু সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও অপরাধের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। স্মাগলিং- এর সাথে জড়িত গোষ্ঠী প্রতি বছর ৫০০ মিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জন করে, অথচ তারা সবচেয়ে বেশী দু'টি জিনিসেরই লেনদেন করে তা হলো হেরোইন ও কোকেন। এক সমীক্ষা মতে, শুধু ১৯৯০ সালেই সেসব 'গোপন হাত' যতটুকু হেরোইন চোরাচালান করেছে

গত দীর্ঘ ২০ বছরেও এতটুকু হেরোইন চোরাচালান হয়নি। কোকেনের ব্যবসাতেও ৫০ গুণ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।[১৩১]

প্রকাশ থাকে, এই বিপুল পরিমাণ হেরোইন ও কোকেন এমন সমাজেই ব্যবহৃত হয়, যে সমাজের মানুষ নাইট ক্লাবে যাওয়া এবং মদ ও নেশাকেই উন্নত জীবন মনে করে। ইউরোপ ও মার্কিন সমাজে মাদক ও নেশা দ্রব্য অর্জন করা কোনই কঠিন নয়। অত:পর স্কুল-কলেজে পড়ুয়া নতুন প্রজন্মের জন্য তো কেমন যেন শুধু নেশাযুক্ত বস্তুর চাহিদাই অধিক। এসব কিছু তাদের চোখের সামনেই সব সময় বিদ্যমান। এ কারণেই নতুন প্রজন্মের নিকট নেশাযুক্ত ড্রাগস-এর ব্যবহার লজ্জা-শরমের কারণ হওয়ার পরিবর্তে সাধারণ জিন্দেগীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ও বিবেক-বুদ্ধি বিলুপ্ত করে যখন এই জাতি ঘর থেকে বের হয় তখন পশুত্ব ও মানবতার মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যায়! সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে যায়, সভ্যতা ও ভদ্রতাশূন্য ঐ সমস্ত লোককে মানবরূপী পশু বলা হবে না পশুরূপী মানব বলা হবে?

সুসংগঠিত অপরাধও পশ্চিমা সমাজের একটি ধর্ম। যদিও অন্যায়-অপরাধ ও সন্ত্রাস হতে বিশ্বের কোন ভূ-খন্ডই মুক্ত নয়, কিন্তু সভ্যতার দুর্গ দাবীদার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধ, বরং সুসংগঠিত অপরাধ একটি মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। মার্কিন প্রদেশ ক্যালিফোর্নিয়া (যে নিজেই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শক্তির ক্ষেত্রে সপ্তম নম্বরে) সেখানে শিক্ষার জন্য নির্ধারিত বাজেটের চেয়ে বেশী বন্দী-কয়েদীদের জন্য বরাদ্দ। ২৮ মিলিয়ন মার্কিন নাগরিক (অর্থাৎ জনসংখ্যার এক-দশমাংশ) নিজেদেরকে অত্যন্ত সুদর্শন ও সুরম্য অট্টালিকা ও অঞ্চলে আবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়। এ কারণেই মার্কিন নাগরিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের সশস্ত্র গার্ডের ওপর ব্যয় করে।[১৩২] শুধু ১৯৯৬ সালেই গোটা আমেরিকায় ৫ মিলিয়ন অপরাধ সংগঠিত হয়। অত:পর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার গতির ফলে আরো দশ গুণ বেশী দ্রুততার সাথে ভয়াবহ অপরাধ বৃদ্ধি হতে থাকে অর্থাৎ প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৩ শতাংশ, আর ক্রমবর্ধমান অপরাধের হার ১৮৭ শতাংশ। অতএব, অবস্থা এত শোচনীয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১২ সেকেন্ডে একটি ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হয়। প্রতি ঘন্টায় একটি হত্যাকান্ড ঘটে। প্রতি ২৫ মিনিটে কাউকে ধর্ষণ করা হয়। (অথচ মার্কিন

১৩১। ফাখখুল আওলামাহ।

১৩২ । আল আওলামা আল হাকিকীয়া ওয়াল আবআদ। ফাখখুল আওলামা- এর সৌজন্যে। পৃ. ৩৬৭-৩৬৮।

সমাজে যৌন কর্মকান্ডকে কোন দূষণীয় মনে করা হয় না। মার্কিন সমাজে এই ব্যাপক মহামারীর ফলাফল, এ সমাজে সে ব্যক্তির উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হয় যে, বিবাহ ছাড়া অবৈধ কোন যৌন সম্পর্ক কায়েম করেনি)। প্রতি ৫ মিনিটে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয় এবং প্রতি মিনিটে কোন একটি গাড়ী চুরি হয়।[১৩৩] এই জরীপ ১৯৯৪ সালের। যে দ্রুততার সাথে মার্কিন সমাজে অপরাধ ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে ১৯৯৪ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে আমেরিকায় সংঘটিত অপরাধের রেকর্ড রাখাও সম্ভবত অসম্ভব হয়ে পড়েছে! কারণ এ ধরনের এমন অসংখ্য অপরাধ রয়েছে যেগুলো পুলিসের রেকর্ডে লিপিবদ্ধ নেই। তবে একথাও অস্বীকার করি না, উন্নয়নশীল দেশ যেমন ভারত-পাকিস্তানে এর চেয়ে বেশী অপরাধ সংঘটিত হয় না। কিন্তু এসব দেশে ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হওয়া এত বেশী বিস্ময়কর নয়। কারণ পুলিশ ও সিকিউরিটি সংস্থা থাকা সত্ত্বেও সরকার স্বীয় জনগণকে রক্ষা করতে অক্ষম, বরং উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলোও বিভিন্ন সময় অভ্যন্তরীণ অপরাধে জড়িত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিজেকে সভ্য দেশ দাবী করে, সেখানকার নাগরিক স্বীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে উন্নতির মাপকাঠি দাবী করতে দ্বিধা করে না। আর টেকনোলজি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের বিস্ময়কর উন্নতি দেখে তাদের দাবী খণ্ডনও করা যায় না। এরকম দেশে এত বিপুল আকারে অপরাধ সংঘটিত হওয়া শুধু বিস্ময়ের কারণই নয়, বরং সেসব দাবীর পুল খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, যে সব দাবী তারা রাত-দিন করে বেড়ায়।

এসব অপরাধের কারণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে জানা যায়, হলিউডের চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই গোটা মার্কিন সমাজ অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। সে সব চলচ্চিত্র দেখে নতুন প্রজন্ম অপরাধ ও সন্ত্রাসের নতুন নতুন পদ্ধতি শেখে। এ কথার স্বীকৃতি স্বয়ং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনও দিয়েছেন। তিনি হলিউডের ওপর অভিযোগ করেছিলেন, অশ্লীল, নগ্ন ও যৌন সুড়সুড়িমূলক এবং ভয়াবহ অপরাধ বিস্তারকারী ফিল্ম তৈরি করে মার্কিন সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আরেকজন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন হলিউডের চার শত চলচ্চিত্র নির্মাতার উদ্দেশে বক্তৃতাকালে তাদের কাছে মার্কিন সমাজের ওপর দয়া করার আবেদন করেছিলেন এবং তাদের নিকট অশ্লীল-নগ্ন ও যৌন সুড়সুড়িমূলক ছবির প্রোডাক্ট থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৩৪]

---

১৩৩ । আল ইসলাম বাইনাশ- শারক ওয়াল গারব, ড. আলী ইজ্জত প্রনীত, পৃ. ১১৭।

১৩৪ । অছিকাতু মুতামারিস-সুক্কান ওয়াত-তানমিয়া, রুয়াতুন শরইয়্যাহ। ড. আল হুসাইনি সালমান ইলজ্জাদ, পৃ-৭১।

এমনিভাবে সামাজিক বিশ্বায়নের ফলে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যাধুনিক উন্নতি-প্রগতি ও যান্ত্রিক জীবনের কারণে অগণিত মানুষ বেকার হয়ে গেছে। কারণ তাদের স্থান নতুন আবিস্কৃত যন্ত্রগুলো দখল করে নিয়েছে। এক সমীক্ষা মতে, যদি পরিস্থিতি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে সমাজের মাত্র এক অংশ কাজের যোগ্য থাকবে আর বাকী চার অংশ বেকারত্বের জীবন কাটাতে বাধ্য হবে। সাম্প্রতিক জাতিসংঘের পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বিশ্বায়ন যেমনিভাবে অনেক দেশ ও সেখানকার জনগণকে উপকার করছে, তেমনিভাবে তার কারণে অনেক দেশে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের শতাংশের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজ করার সুযোগ-সুবিধা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং এমন সংস্থাও হ্রাস পাচ্ছে যারা দরিদ্রদের সামাজিক সাহায্য-সহযোগিতা করবে।[১৩৫]

এটাই হলো পাশ্চাত্য সমাজের একটি হালকা চিত্র যার বিশ্বায়নের জন্য আজ পাশ্চাত্যের শয়তানী মস্তিষ্ক বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, বরং প্রত্যেকে এমন কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ করছে- যার মাধ্যমে অন্য জাতির সমাজকে পরিবর্তন করা যায়। এর জন্য তারা মৌলিকভাবে নারী সমাজকে পথভ্রষ্ট করার হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং সমঅধিকারের সোনালী স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের পবিত্রতা, কোমলতা ও সতীত্বের ওপর হামলা চালিয়েছে। নারী পরিবারের একটি মৌলিক উপাদান। যখন তার ওপর আক্রমণ হবে তখন অবশ্যই পরিবার প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারবে না। আর পরিবার প্রভাবিত হলে সমাজ প্রভাবিত হওয়া অনিবার্য। অত:পর যেহেতু প্রতিটি নষ্ট সমাজকেই পশ্চিমা সমাজ বলা হয়, এজন্য সামাজিক বিশ্বায়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে বেশী সময় লাগার সম্ভাবনা নেই। তবে যদি মুসলিম উম্মাহ আবার জেগে ওঠে, স্থবিরতা ও গাফলতির চাদর দূরে নিক্ষেপ করে, নিজের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করে, নিজের ধর্মকে আদর্শ ও আইডিয়াল মনে করে, তার বিশ্বজনীন পয়গামকে স্বয়ং নিজে গ্রহণ করত: তা ব্যাপক করার প্রানান্তকর প্রয়াস চালায় এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও অনুসরণ ত্যাগ করে, তাহলে হয়ত মুসলিম উম্মাহ সামাজিক বিশ্বায়নের আগ্রাসনের সামনে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াতে সক্ষম হবে এবং এই প্লাবন ও সয়লাবের ধ্বংসকারী অবক্ষয়ের ওপর বাঁধ নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

---

১৩৫। মাসিক আল-মুশহিদু'স সিয়াসী সংখ্যা-১০৮, ১৯৯৮ইং।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

# ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বায়ন

## ইসলামের বিশ্বায়ন ও বিশ্বজনীনতা

পৃথিবীতে অসংখ্য দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু আসমানী আর কিছু মানব রচিত। কিন্তু ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হলো- ইসলাম আসমানী ও সত্য দ্বীন হওয়ার সাথে সাথে একটি আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম বিশেষ কোন জাতি ও গোত্রের জন্য নয়, বরং পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক মানবের জন্য। ইসলাম তার দিকে আহ্বান করার জন্য বিশেষ কোন জাতিকেই সম্বোধন করেনি, বরং গোটা মানব জাতিকেই সে সম্বোধন করেছে। তার দাওয়াত ও পয়গাম কোন গোত্র, বংশ, জাতি কিংবা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই সীমিত থাকেনি। বিশ্বের যে কোণায়ই মানুষ কদম রেখেছে, ইসলামের দাওয়াতও সেখানে পৌঁছেছে এবং তার উন্নত শিক্ষা ও সমুন্নত মূল্যবোধ দ্বারা মানুষকে স্বীয় ক্রোড়ে তুলে নিয়েছে।

বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার ও সমাজের ঘৃণিত লোকদের সামনে ইসলাম সাম্যের সেই শিক্ষা উপস্থাপন করেছে যার মধ্যে দাস ও মনীবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামের এই উন্নত শিক্ষা ও উচ্চ মূল্যবোধ এবং নজিরবিহীন ও তুলনাহীন ন্যায় ও ইনসাফের ফলে তার ক্রোড়ে বাদশাহও এসেছে, জনসাধারণও এসেছে, আরবও এসেছে, অনারবও এসেছে, শ্বেতাঙ্গও এসেছে এবং কৃষ্ণাঙ্গও এসেছে। মোট কথা, প্রতিটি শ্রেণীর, প্রতিটি স্তরের লোক ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। নি:সন্দেহে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এমন সম্পদ অর্জন করেছে, যা তাদের কখনো অর্জন হতো না। এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর প্রতিটি শ্রেণীর ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আসাই ইসলাম একটি সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা হওয়ার প্রমাণ। যদি ইসলাম কোন বিশেষ জাতি কিংবা গোত্রের জন্য হতো তাহলে তার অনুসারীরা প্রতিটি জাতি ও গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত হতো না।

এছাড়াও পবিত্র কুরআনও বিভিন্ন স্থানে ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ব্যবস্থা হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল (সা.) -এর রেসালাত, কুরআনের দাওয়াত ও ইসলামের পয়গাম প্রত্যেক মানবের জন্য।

ইরশাদ হচ্ছে, "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া-১০৭]

আল্লাহ পাক বলেন, "আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" [সূরা সাবা- ২৮]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা খোদাভীরু হবে।" [সূরা বাকারা- ২১]

আল্লাহ পাক বলেন, "বলে দাও, হে মানবমণ্ডলি! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। সমগ্র আসমান ও যমীনের রাজত্ব তাঁর।"

পবিত্র কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা এবং তার দাওয়াত বিশ্বজোড়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম তার সভ্যতা জোরপূর্বক অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়নি, বরং প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সভ্যতা বিশ্বের সকল সভ্যতার এক সমন্বিত রূপ। ইসলাম অন্যান্য সভ্যতার ভাল কথা গ্রহণ করেছে এবং নিজের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ নয় এমন অভ্যাস ও রীতিনীতি পরিত্যাগ করেছে। ইসলাম দ্বীন, ধর্ম, জাতি ও ভাষার ভিন্নতাকে মানব জাতির স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করেছে।

এটাই পার্থক্য ইসলামের আন্তর্জাতিকতা আর বিশ্বায়নের মাঝে। ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক জীবন ব্যবস্থা কিন্তু সে নিজে নিজেকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয় না, বরং অন্যান্য জাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করে এবং আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতির স্থায়িত্বের প্রবক্তা। আর বিশ্বায়ন বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীর সকল সভ্যতাকে বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। তার উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গোটা মানবতাকে উপকার করা নয়, বরং একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে বিশ্বের সকল ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক বানানো।[১৩৬]

---

১৩৬। মাফহূমূল আওলামাহ, ওমর আবদুল করিম প্রনীত, http://www.Islamway.com

বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহসিন আবদুল হামীদ লেখেন, "ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, গোত্র ও দেশের লোক বাস করে। তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, সবাই পরস্পরে ঐক্য ও সহযোগিতার সাথে বসবাস করবে আর এটাই ভূ-পৃষ্ঠের জন্য কল্যাণকর। এক জাতি যদি অন্য জাতির রীতিনীতি ও আচার-আচরণ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি কোন জাতি তার সভ্যতা-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও আচার-আচরণ অন্য জাতির ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয় তা হলে অবশ্যই এটা অনৈতিক, অন্যায়। ইসলামী ইতিহাসের কোথাও এ কথা পাওয়া যায় না, যা দ্বারা একথা জানা যায়, মুসলিম জাতি অন্যান্য জাতির জন্য কোন রাস্তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাদেরকে কোন এক দিকে পরিচালিত করেছে, কিংবা কোন বিশেষ ব্যবস্থার অধীন করেছে, বরং মুসলিম জাতি সর্বদা বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও জাতির স্বীকৃতি দিয়েছে। অন্যের সাথে নিজের মত ব্যবহার করেছে। এ কারণেই ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত মুসলিম শাসনকালে ইহুদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক, অগ্নিপূজক ও বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করেছে। মুসলমানরা সর্বদা আল্লাহ পাকের নির্দেশকে সামনে রেখেছে।

"হে মানব সমাজ, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার, আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশী সম্মানী যে বেশী তাকওয়া সম্পন্ন।"[১৩৭]

কিন্তু বিশ্বায়ন সর্বদা পুরো বিশ্বকে একই রঙ্গে রঙ্গীন করা, গোটা মানবতাকে একই পথে পরিচালিত করা এবং মানুষকে একই সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছে।[১৩৮]

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা ইসলাম ও বিশ্বায়নের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলাম ও বিশ্বায়ন নিয়ে অধ্যয়নকারীরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইসলামের বুনিয়াদ ন্যায়, ইনসাফ ও সাম্যের ওপর। সে জুলুম-অত্যাচারকে অনুমতি দেয় না, বরং জালেমদের জুলুমকে নির্মূল করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। সে অন্যের অধিকার স্বীকার করে এবং "জোরপূর্বক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করাকে" গর্হিত

---

১৩৭। সূরা আল হুজরাত : ১৩

১৩৮। আল আওলামা মিন-মানযুরিল ইসলামীয়্যন। **http://www.Islamway.com**

সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে বিশ্বায়নের ভিত্তি জুলুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে ন্যায়-ইনসাফের কোন অস্তিত্ব নেই। তার উদ্দেশ্য পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। এতে দরিদ্র জনগণ ও দরিদ্র দেশের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। বিশ্বায়নে শুধু পুঁজিবাদীদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। বিশ্বায়ন স্বার্থ উদ্ধারে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয়। চায় এ কারণে মানবাধিকার পদদলিতই হোক না কেন।

এর সাক্ষ্য একজন ফরাসী চিন্তাবিদ তার ভাষায় এভাবে দিয়েছেন, "বিশ্বায়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা যত দ্রুত প্রসার লাভ করবে তত দ্রুতই বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মের নামে যুদ্ধবিগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। যোগাযোগ ক্ষেত্রে যতই উন্নতি সাধিত হবে ততই মানুষ গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হবে। ঐক্য টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। পরিবার, গোত্র ও দেশের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকার কারণে ভয় ও ত্রাস বৃদ্ধি পাবে। জীবনমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যত দ্রুত উন্নতি সাধিত হবে ততই জুলুম, বর্বরতা ও অপরাধ বৃদ্ধি পাবে।"[১৩৯]

ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বায়নের মাঝে মৌলিক পার্থক্য এই যে, প্রথমটা কল্যাণকর এবং গোটা মানবতার জন্য মঙ্গলজনক। আর দ্বিতীয়টা শুধুমাত্র অকল্যাণকর এবং গোটা মানব সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক। ইসলাম যেখানেই পৌঁছেছে সেখানেই সে তার উন্নত শিক্ষা দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করেছে। আর এ কারণেই সে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পুরো দুনিয়ার ওপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তার উদ্দেশ্য সাম্রাজ্য বিস্তার আর অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করা। তার মৌলিক ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতার ওপর আর তার কারণ বস্তুবাদ ও ধন-সম্পদের সীমাহীন লোভ।

## ইসলাম জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা

ইসলাম নিয়ে গবেষণা করলে জানা যায়, ইসলামের সম্পর্ক শুধু তাদের সাথেই নয়, যারা রাসূল (সা.)-এর ওপর ঈমান এনেছে, বরং যখন থেকে দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকে তার শিক্ষার অস্তিত্ব রয়েছে। প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে সে পয়গামই নিয়ে এসেছেন যার নবায়ন ও সংস্কার করেছেন আমাদের রাসূল (সা.)। এজন্য যদি বলা হয়, হযরত আদম (আ.) থেকে

---

১৩৯। মাসিক আল বায়ান, আরব আমিরাত ২ রমাজান ১২২৩ হিজরী, প্রবন্ধ আল আওলামাহ ওয়া আলমিয়াতুল ইসলাম।

নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ইসলামেরই দাওয়াত দিয়েছেন তাহলে ভুল হবে না। কুরআন-হাদীসে তাই বলা হয়েছে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, "সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল, অত:পর আল্লাহ তায়ালা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষ বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারে।" (সূরা বাকারাঃ ২১৩)

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন, "হযরত নূহ (আ.) ও হযরত আদম (আ.)-এর মাঝে দশ শতাব্দীর দূরত্ব ছিল। এ শতাব্দীগুলোতে সকল লোক একই ধর্মের অনুসারী ছিল।"[১৪০]

হযরত নূহ (আ.)-এর পরে বনী ইসরাঈলের আম্বিয়াও সেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন যার দাওয়াত তার পূর্বে হযরত নূহ (আ.) এবং নূহ (আ.)-এর পূর্বে হযরত আদম (আ.) দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, "আপনার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না।" (সূরা ইসরাঃ ২৩)

হুজুর (সা.)-এর আবির্ভাবের পর তিনিও সে দাওয়াতেরই নবায়ন করেছেন এবং সে ইসলামের দিকেই লোকদেরকে আহ্বান করেছেন, যার দিকে হুজুর (সা.)-এর পূর্বে সকল আম্বিয়া পুরা মানবতাকে আহ্বান করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "আমি আপনার পূর্বে এমন কোন নবী প্রেরণ করিনি যার কাছে আমি এ মর্মে ওহী প্রেরণ করিনি যে, আমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।" (সূরা আম্বিয়াঃ ২৫) (নোট-২৬৭ পৃষ্ঠা)

উক্ত আয়াতের আলোকে এই দাবী করা যায়, ইসলামের দাওয়াত কিন্তু নতুন নয়, বরং ভূ-পৃষ্ঠে আগমনকারী সকল নবী এই ইসলামেরই দাওয়াত দিয়েছেন, যার নবায়নের জন্য রাসূল (সা.)-এর আবির্ভাব হয়েছে। আর এই ইসলাম যেহেতু একটি বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক জীবন ব্যবস্থা, তাই একথা বলা অবশ্যই সঠিক হবে যে, ইসলাম সে দিন থেকেই বিশ্বজনীন, যখন থেকে তার জন্ম হয়েছে এবং সে তখন থেকেই সার্বজনীন, যখন থেকে এ বিশ্বকে সজ্জিত করা হয়েছে।

---

১৪০। তাফসীরে ইবনে কাছির, প্রথম খন্ড, পৃ. ২৫১।

## বিশ্বায়ন একটি ইসলামবিরোধী মতবাদ

বিশ্বায়ন শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের নামই নয়, বরং এটি সরাসরি ইসলামের ওপর আগ্রাসনও বটে! কারণ ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যে তার বিশ্বজনীনতার গুণাবলীর কারণে বিশ্বায়নের প্রতিরোধ করতে পারে নতুবা আজকের যুগে এমন কোন ধর্ম এমন কোন আন্দোলন দৃষ্টিগোচর হয় না যে বিশ্বায়নের সামনে সীসাঢালা প্রাচীর হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। অতএব, বিশ্বায়নের নীতি-নির্ধারণী সংস্থাগুলোর পরিকল্পনার মধ্যে যেমনিভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থ উদ্ধার করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তেমনিভাবে ইসলামকে দুর্বল করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমন কি ইসলামের ওপর আগ্রাসন চালানো তাদের প্রথম টার্গেট। বিশ্বায়ন ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যে সব ষড়যন্ত্র করছে, আসুন! আমরা তার মুখোশ উন্মোচন করি:

১। বিশ্বায়নের প্রচেষ্টা হলো- মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়া যাতে মুসলিম উম্মাহ ধর্মের আশ্রয় নিতে না পারে যা মূলত মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় আশ্রয়।

২। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী, জড়বাদী ও নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারাকে বেশী প্রসার করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলো পশ্চিমা শক্তির অধীনে নিয়ে আসা, যাতে মুসলমানদের নিকট কোন কেন্দ্র না থাকে।

৩। প্রতিটি দেশে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের স্থানে বস্তুবাদী দর্শন চাপিয়ে দেওয়া যাতে মুসলমানরা ইসলামী আকাইদ থেকে আলো না পায়।

৪। ইসলামকে রাজনীতি ও নেতৃত্ব থেকে বিদায় করে দেওয়া এবং পশ্চিমা মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে সেক্যুলার দর্শনের আলোকে বিভিন্ন সরকার গঠন করা।[১৪১]

আজ প্রতিটি দেশে এমন সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়েছে যারা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত। সে সব সংগঠনের প্রতি চিন্তা ও বস্তুগত দিক দিয়ে পাশ্চাত্যের সমর্থন রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরোধিতা করা। ইসলামী আইনের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা। নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক ও মুসলিম রমণীদের সমস্যা নিয়ে সমালোচনা করা। কিছু কিছু মুসলিম দেশে তো

---

১৪১ । আল আওলামা আমামাহ আল মিয়াতিশ শারিয়্যাতীল ইসলামীয়া, ড. ওমর ইলহাজ্জীকৃত।

সরাসরি ও প্রকাশ্যভাবে এসব সংগঠন সরকারের কাছে এই আপীলও করছে যে, মানবাধিকারের ব্যাপারে জাতিসংঘের পাসকৃত প্রস্তাবাবলীর আলোকে আইন-প্রণয়ন করা হোক এবং ইসলামী শরীয়াকে এ ধরনের আইন থেকে দূরে রাখা হোক! কিন্তু এর চেয়েও বড় বিপজ্জনক বিষয় হলো, বিশ্বায়নের নেতৃবৃন্দ ইসলামী নীতিমালার ওপর হামলা চালাচ্ছে। তাদের সকল প্রচেষ্টা যে কোনভাবে ইসলামের স্বীকৃত আকাইদের অস্তিত্ব নির্মূল করার ওপর ব্যয় হচ্ছে, এমন কি যাতে ভূ-পৃষ্ঠ ইসলামের অনুসারীদের থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এজন্য এ স্পর্শকাতর বিষয়ে যে ব্যক্তি নেতিবাচকভাবে কলম ধরে তাকেই পাশ্চাত্য পূর্ণ সমর্থন দিয়ে বসে। সাম্প্রতিক আরব বিশ্বে তিনজন নাস্তিক কলামিস্টের আবির্ভাব হয়েছে আর তারা হলো সিরিয়ার অধিবাসী মুহাম্মদ শাহরুর, মিসরের অধিবাসী মুহাম্মদ সাঈদ আল আশমারী ও আলজেরিয়ার মুহাম্মদ আরকোন। এ তিনজন ইসলামী নীতিমালা ও আইন-কানুনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়েছে। তারা ইসলামী বিশ্বাস, শাস্তি, উত্তরাধিকার ও পারিবারিক আইনকে জাহেলী যুগের প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করার হীন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো লোকদেরকে একথা বোঝানো যে, ইসলামী আইন এ যুগে অচল।

এ তিনজনের লিখিত পুস্তক জনসমক্ষে আসার পর পাশ্চাত্য তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে দেয়, এমন কি সাবেক মার্কিন প্রশাসনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ব্লেলটেরো তিনটি পুস্তকেরই খুব প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে মুক্ত বুদ্ধি ও উজ্জ্বল চিন্তাধারার অধিকারী আখ্যা দিয়েছেন।[১৪২] প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নবাদীরা ভালভাবে জানে যে, ইসলাম যেহেতু তার উত্তম বিকল্প ও প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা ইসলামের মধ্যে রয়েছে, এজন্য তারা ইসলামকে শুধু এমন একটা ধর্ম বানিয়ে দিতে চায়, যা শুধু কিছু আনুষ্ঠানিকতা ও কর্তব্য পালন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাছাড়া যিন্দেগীতে তার আর কোন ভূমিকা থাকবে না।

## ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অন্যান্য ধর্ম শুধু কিছু আচার-অনুষ্ঠান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সে সব ধর্মের কোন সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

---

১৪২ । প্রাগুক্ত।

এজন্য তাদের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে দিশা দেয়। স্থান-কালের ঊর্ধ্বে সে সকল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে হেদায়েতের বার্তাবাহী। তার নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা রয়েছে। তার একটি বিশেষ সভ্যতা ও একক সংস্কৃতি রয়েছে। এজন্য এটা অসম্ভব যে, ইসলামের সঠিক অনুসারীরা ইসলামী শিক্ষা ছেড়ে বিশ্বায়নের উপস্থাপিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর ভিত্তিতে বলা যায়, বিশ্বায়নের রাস্তায় সবচেয়ে বড় বাধা ইসলাম।

রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই, বরং শুধু কিছু কৌশল ও পরিকল্পনা রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অবশ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে যাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলে। এজন্য এখানে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি- যে ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী ও একতার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা জীবনকে শান্তি, নিরাপত্তা প্রদান করে এবং সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে দূরত্বকে দূর করে।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আরাবী ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন-

"ইসলামী অর্থনীতি সাধারণ অর্থনীতির নীতিমালার এক সমন্বিত রূপ, যেগুলোকে আমরা প্রতিটি যুগ ও পরিবেশের আলোকে কুরআন হাদীস থেকে বের করি।"[১৪৩]

যখন আমরা ইসলামী অর্থনীতির নীতিমালা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি, তখন অনুমিত হয় এসব মূলনীতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এর মধ্যে দৃঢ়তা, সাথে সাথে চাকচিক্যও আছে। আর এ কারণেই ইসলামী অর্থনীতি প্রতিটি যুগে অনুসরণযোগ্য।

অবশ্য এ নীতিমালার মধ্যে এমন কিছু নীতিমালাও রয়েছে যা অপরিবর্তনীয় এবং স্থান ও কালের পরিবর্তন তার মধ্যে প্রভাব ফেলে না। যেমন যাকাত ও ফাইয়ের (বিজিত দেশের জনগণের পরিত্যক্ত সম্পদ) খাতসমূহ, গনীমতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ, সুদ, জুয়া, চুরির নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধ পদ্ধতিতে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার উপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। এসব মূলনীতির মধ্যে যে দৃঢ়তা

---

১৪৩। আন নিযামুল ইকতিসাদী ফিল ইসলাম মাবাদিউহু ওয়া আহদাফুহু, পৃ. ১৫।

রয়েছে তা সম্পদশালী, আমীর, বাদশা, বিশেষ করে শাসকদেরকে স্বেচ্ছাচারী জীবন কাটানো থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখে এবং তাদেরকে বস্তুবাদের লালসার শিকার হতে বাধা দেয়। অপর দিকে ইসলাম রাষ্ট্রপ্রধানকে এ অনুমতি প্রদান করেছে যে, সে স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে অর্থনীতিকে পরিচালিত করবে এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে ইসলামের পয়গাম ও বার্তা ব্যাপকভাবে প্রসারিত করবে।

## ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পৃথিবীর অন্যান্য অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে নেই। যেমনঃ

১। ইসলামের সাথে অর্থনীতির শরয়ী, নৈতিক ও আকীদাগতভাবে মজবুত সম্পর্ক রয়েছেঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাকে আকীদা, ইসলামী শরীয়ত ও নৈতিকতা থেকে পৃথক করে অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। কারণ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা শরীয়তের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারণেই যদি বৈধ বস্তুগত কাজে সঠিক নিয়তের সংমিশ্রণ থাকে তাহলে এ কাজ সওয়াব ও প্রতিদানের যোগ্য হবে।[১৪৪]

২। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্যঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যা বিশ্বায়নের ভিত্তি, তার সমগ্র মনোযোগ ব্যক্তিমালিকানার দিকে। এ ব্যবস্থার দৃষ্টিতে ব্যক্তিই একক মালিক, তার নিকট ব্যক্তিস্বার্থ সামাজিক স্বার্থ হতে উর্ধ্বে।

এ ব্যবস্থার ফলে স্টক বৃদ্ধি পায়। মানুষের যে বস্তুর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী পুঁজিবাদীরা তা স্টক করে রাখে। অত:পর পরবর্তীতে তা চড়া মূল্যে বিক্রি করে, উপরন্তু এ ব্যবস্থার কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এ দু'টি বিষয় আজকাল ভালভাবে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। অপর দিকে কমিউনিস্ট অর্থ ব্যবস্থার সকল মনোযোগ সামষ্টিক স্বার্থের ওপর ব্যয় হয়। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল মাধ্যম ও উপকরণ, যেমন ক্ষেত, বাগান ও কারখানা ইত্যাদি এ সব কিছু রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে। জনগণ শুধু বেতনের অধিকার রাখে যা সমাজের সেবাদানের বিনিময়ে সে পাবে। এ ব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় হলো, এটা খোদায়ী প্রকৃতির বিরোধী ব্যবস্থা, যা মালিক হওয়ার অভিলাষের সময় মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়াও অলসতা ও হীনমন্যতা এই ব্যবস্থার ধর্ম। এ কারণেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনের হার প্রচুর কম দেখা গেছে, বরং এমনও অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, এক

---

১৪৪। মাসিক আত-তারবিয়াতুল ইসলামীয়াহ, ইরাক সংখ্যা-১১, প্রবন্ধ, ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য।

বেলা পেট চালানোর জন্য লোকদের স্বর্ণ-রৌপ্য পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে।[১৪৫] কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি ব্যক্তি ও সামষ্টিক উভয়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে।

এ ব্যবস্থা একদিকে যেমন প্রকৃতি ও ব্যক্তি অধিকার প্রদান করে, তেমনি অভ্যন্তরীণভাবে তার কিছু নৈতিক সীমারেখা এবং বাহ্যিকভাবে কিছু আইনগত সীমারেখারও অধীন করা হয়েছে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সামষ্টিক মালিকানাও পাওয়া যায়। এ কারণেই যদি কখনো ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় তখন ইসলাম সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। ফুকাহায়ে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন, প্রয়োজন পড়লে এমন ব্যক্তির কাছ থেকে জোরপূর্বক শস্য ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে যে ব্যক্তি এসব শস্য স্টক করে রেখেছে।[১৪৬] ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই ফ্রান্সের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর জ্যাক আউস্ট্রোবী "প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা" নামক স্বীয় গ্রন্থে একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন, "অর্থনৈতিক উন্নয়ন পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দ্বিতীয় আরেকটি ব্যবস্থা রয়েছে, যাকে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বলা হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাই ভবিষ্যতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে।"[১৪৭]

## ইসলামী ও অনৈসলামী অর্থ ব্যবস্থার মাঝে পার্থক্য

১। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সাধারণ নীতিমালা আল্লাহ পাকের তৈরি, যিনি মানব জাতির স্রষ্টা এবং তাঁর উন্নত অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। আর অন্যান্য অর্থ ব্যবস্থার জনক মানব মস্তিষ্ক, যা ভ্রান্তি এবং ভুল করে। নি:সন্দেহে আল্লাহর সৃষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে তেমনিই পার্থক্য যেমন আসমান-যমীনের মাঝে পার্থক্য।

২। মানব রচিত অর্থ ব্যবস্থা শুধু বস্তুগত সমাধান উপস্থাপন করেছে, তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পদ উপার্জন করা। আর ইসলামের দৃষ্টিতে বস্তু শুধু একটি উপায় ও উপকরণ, উদ্দেশ্য নয়, বরং মানবের আসল উদ্দেশ্য প্রভুর পরিচয় লাভ করা।

৩। মানব রচিত অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে নৈতিকতা, উন্নত চরিত্র ও সমুন্নত মূল্যবোধের কোন গুরুত্ব নেই, বরং তার সকল মনোযোগ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি কেন্দ্রীভূত থাকে, চায় বৃদ্ধি যে কোনোভাবে হোক না কেন। আর ইসলামী অর্থ

---

১৪৫। প্রাগুক্ত।

১৪৬। প্রাগুক্ত

১৪৭। আল ওয়াজুলইসলামী (মাসিক) প্রবন্ধঃ ইসলাম ও প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা, মুহাম্মদ শওকী আল-ফাজরী, সংখ্যা- ১১২।

ব্যবস্থার ইসলামী মূল্যবোধের সাথে পূর্ণাঙ্গ সম্পৃক্ততা রয়েছে, বরং তা ইসলামের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা হতে প্রবাহিত পানি যা মানুষকে পরস্পর সাহায্য করা এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়।[১৪৮]

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা কয়েক বছর হলো দাফন হয়ে গেছে। এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিরোধের জন্যই পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাকে বিকল্প হিসেবে পাশ্চাত্য বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছে, যা আজ বিশ্বায়নের ভিত্তি। কিন্তু এ ব্যবস্থার উল্লিখিত ক্ষতিকর বিষয়াবলীর আলোকে এ কথা বলা ১০০% সঠিক হবে যে, আসলে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাই পুরো বিশ্বের নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখে। কিন্তু ইসলাম বিশ্বায়নের মত এ ব্যবস্থাকে জোরপূর্বক কোন জাতির উপর চাপিয়ে দেয়না।

## বিশ্বায়ন জাহেলী যুগের আদর্শ

জাহেলী যুগে যেমনিভাবে অসংখ্য অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর বিষয় পাওয়া যেত তেমনিভাবে সুদ খাওয়া, যৌনতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদির মত সমস্যাও বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর বস্তু মানুষকে ঘিরে রেখেছিল। সে যুগকে যদি মানবতার সবচেয়ে অন্ধকারময় যুগ বলা হয় তাহলে ভুল হবে না; সুতরাং একটি ছহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, হুজুর (সা.) বলেন, "আল্লাহ পাক দুনিয়াবাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন কিছু আহলে কিতাব ছাড়া পুরো আরব অনারব সবার ওপর ক্ষুদ্ধ হলেন।"[১৪৯]

আজ বিশ্বায়ন যে দৃষ্টিভঙ্গির দাওয়াত দিচ্ছে এবং যে চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা বাস্তবায়ন করতে চায়, তা সেই জাহেলী যুগেরই ক্ষতিকর বিষয় যা আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের কারণে পরিণত হয়েছিল। জাহেলী যুগের মত সুদ, নগ্নতা, যৌনতাকে বৈধ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক সুসংহতির নামে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছড়ানো হচ্ছে। জাহেলী যুগে সম্পদশালীদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো এবং দরিদ্রদের জীবনকে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হতো। বিশ্বায়নের যুগেও মুষ্টিমেয় কিছু হাতে গোণা মালিকদের ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং পূর্বের মতই অসহায়, নি:স্ব মানুষকে লুণ্ঠনের টার্গেট বানানো হয়। জাহেলী যুগে যেমনিভাবে নারীর মর্যাদা একটি পণ্যের চেয়ে বেশী ছিল না, তেমনিভাবে বিশ্বায়নের যুগেও নারীর মর্যাদা

---

১৪৮। মাসিক আত-তারবিয়াতুল ইসলামীয়াহ, ইরাক সংখ্যা-১১

১৪৯। সহীহ মুসলিম-হাদীসঃ ২৮৬৫।

একটি সস্তা পণ্যের চেয়ে বেশী নয়। নারী স্বাধীনতার নামে তার ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে, যেমনিভাবে নবী আবির্ভাবের পূর্বে করা হতো। মানব ইতিহাসের সে অন্ধকারময় যুগে তারাই ক্ষমতার মালিক হতো যারা শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর। বর্তমানের এই তথাকথিত সভ্য যুগেও বিশ্ব ক্ষমতা ও নেতৃত্ব সে সব ক্ষমতাশীনদের হাতে, যারা নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। এজন্য যদি বলা হয় যে, বিশ্বায়ন সে যুগেরই নতুন সংস্করণ তাহলে ভুল হবে না।

জাহেলী যুগের এত প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে সহ্য করা হয়নি। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লবের মাধ্যমে তা নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে আজকের এই জাহেলী যুগের নতুন সংস্করণকেও নির্মূল করার জন্য সেই ইসলামী চেতনাবোধের প্রয়োজন, যে চেতনা প্রদর্শন করেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা:)-দের পবিত্র জামাআত। স্বীয় ঈমানী শক্তি ও ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ ও অটল থাকার কারণে ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারতম যুগকে সবচেয়ে উন্নত ও উজ্জ্বল যুগে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। বিশ্বায়নের প্রতিরোধের জন্য আমাদেরকে ইসলামের দিকেই আবার ফিরে যেতে হবে। কারণ একমাত্র ইসলামের মধ্যেই সেই শক্তি নিহিত আছে যার মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক ফেতনার মূল উৎপাটন করা যেতে পারে। আমাদেরকে দ্বীন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির খাতিরে প্রতি ধরণের চাকচিক্য পাশ্চাতে ঠেলে দিয়ে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর কঠোরভাবে আমল করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতির দৃষ্টিতে আমাদের মেনে নিতে হবে, বিশ্বায়নের অন্ধকার রাতের সূচনা হয়ে গেছে! যদিও এই অমানিশা এখনো পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে গোটা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি কিন্তু যদি মুসলিম উম্মাহ গাফলতে বিভোর থাকে তাহলে সে সময়ও বেশী দূরে নয় যখন বিশ্বায়নের অমানিশা গোটা বিশ্বের ওপর ছেয়ে যাবে এবং প্রতিটি বস্তুকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত করে দেবে।

অবশ্য মুসলমান ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রেমিকদের নিরাশ হলে চলবে না। কারণ ভূ-পৃষ্ঠে যদি ফেরাউন-নমরূদদের আবির্ভাবের আশংকা থাকে, তাহলে মুসা ও ইব্রাহীম (আ.) এরও আবির্ভাবের সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদেরকে যদি আজকের ফেরাউন নমরূদদের মোকাবেলায় মুসা ও ইব্রাহীম হতে হয় তাহলে আমাদের মধ্যেও মুসার মত সাহসিকতা এবং ইব্রাহীমের মত হিম্মত ও মর্যাদাবোধ থাকতে হবে। সর্বশেষ আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এর আদর্শকে আমাদের জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

০০০০

# গ্রন্থপঞ্জী


১। মাল আওলামাহ, বৈরুত

২। তারিখুল আদব, হাসান যিয়াত

৩। আল-আওলামাহ, ড. সালেহ আর রাকাব।

৪। আনহিয়ারু মায়ায়িমিল আওলামাহ, ইজ্জত- আস সাইয়েদ আহমদ।

৫। আল মুস্তাকিবুল আরাবী, আহমদ মোস্তফা ওমর।

৬। আল আরব ওয়াল আওলামাহ, মুহাম্মদ আবেদ আল-জাবেরী।

৭। আল-ইসলাম ওয়াল আওলামাহ, মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল মাবরুক।

৮। মা-হিয়াল আওলামাহ? সাদেক জালালু আযম।

৯। আল ইসলাম ওয়াল গারব ওয়াদ্দীমাকরাতিয়াহ, জাওদাত সাঈদ ও আবুল ওহাব উলওয়ানী।

১০। আল-আওলামাহ ওয়াল আলমিন ইসলামী, আরকান ওয়া হাকায়েক: আবদে সাঈদ ও আবদে ইসমাঈল।

১১। দিরাসাতু হাওলাল বু'দিত্তারীখী ওয়াল মুআসির লিমাফহুমিল আওলামা।

১২। তাহাদ্দিয়াতুন নিয়ামিল আলমিল জাদীদ, ইমাদুদ্দীন খলীল।

১৩। আল-আওলামাতুল জাদীদাতু ওয়াল মাজালুল হায়ারিয্যি লিশ-শারকীল আওসাত সাইয়ারুল জামীলকৃত।

১৪। আমিরিকা আল মুস্তাবাদ্দাহ, আল বিলায়াতুল মুত্তাহাদ্দাহ ওয়া সিয়াসাতুস সায়তারাহ আলাল আলম, মাইকেল মাউন্ট (অনুবাদ) হামেদ ফারযাত।

১৫। আল-আওলামাহ, মুহাম্মদ সাঈদ আবূ যারু।

১৬। মাল-আওলামাহ? পাল হ্যারেস্ট গ্রাহাম থামসান, অনুবাদ (ড.) ফালেহ আব্দুল জাব্বার।

১৭। তাআম্মুলাতু মুশকিলতুল হাযারাহ, মালিক বিন নবীকৃত।

১৮। আল-ইসলাম ওয়াল উম্মাতুল ইসলামিয়্যাহ, জামালুল মুজাহিদ।

১৯। ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া

২০। আর-রিসালাহ লিশ-শাফেয়ী।

২১। আল আমালুল কামিলাহ লি জামালুদ্দীন আফগানী (রহ.), ড. মুহাম্মদ উমারাহ।

২২। আল-লুগাতিল-আরাবিয়া ফী আসরিল আওলামাহ, ড. আহমদ বিন মুহাম্মদ যবীর।

২৩। আল-আওলামাহ মামা আলমিয়াতিশ-শরীয়াতুল ইসলামিয়্যা, ড. ওমর ইলহাজী।

২৪। সুকূতুল হাযারাতিল গারবিয়া, আহমদ মনসুর।

২৫। আ-নিয়ামুল-ইকতিসাদী ফীল ইসলাম: মাবাদিউহু ওয়া আহদাফুহু।

২৭। মাগরিবী মিডিয়া আওর উসকে আসারাত, মাওলানা নযরুল হাফীজ নদভী।

২৮। মদীনা সে হোয়াইট তক, মুহাম্মদ আনিসুর রহমান।

২৯। শিকানজায়ে ইহুদ, পান কস্তিলে।

৩০। ইসলাম আওর জাদীস মায়িশাত, বিচারপতি তকী উসমানী।

৩১ । New Collegiate Dictionary.
32| To International Encyclopaedia of Business and Management.
33| Globalization from the Perspective of Islam and Modernity আতেক সুহাইল সিদ্দিকী ।
৩৪ । Globalization in Question.
৩৫ । The work of Nation.

## পত্র-পত্রিকা

১ । দৈনিক আল-আলম-আল-ইসলামী (আরবী)
২ । মাসিক আল-হজ্ব আল উমরাহ (আরবী)
৩ । মাসিক আল হেলাল (আরবী)
৪ । মাসিক আল-বয়ান (আরবী)
৫ । পাক্ষিক আর-রায়েদ (আরবী)
৬ । মাসিক আল ওয়াতন (আরবী)
৭ । দৈনিক আস সফীর (আরবী)
৮ । দৈনিক আল-খলীজ (আরবী)
৯ । মাসিক আল-মুনতাদা (আরবী)
১০ । মাসিক আল-মুস্তাকবিল (আরবী)
১১ । মাসিক আত-তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যা (আরবী)
১২ । দৈনিক আল- আহরাম (আরবী)
১৩ । মাসিক আল-হাওয়াদেস (আরবী)
১৪ । আল-মুস্তাকবিলুল আরাবী (আরবী)
১৫ । মাসিক আল ইসলাম আল ইয়াওম (আরবী)
১৬ । মাসিক আল মুজতামা (আরবী)
১৭ । মাসিক আফাকুন আবারিয়া (অআরবী)
১৮ । মাসিক আল ইত্তেহাদ (আরবী ।
১৯ । মাসিক আদদিয়ার (আরবী)
২০ । মাসিক আল হায়াত (আরবী)
২১ । মাসিক আল কাস (আরবী)
২২ । মাসিক আস সাকাফাহ আল আলমিয়াহ
২৩ । দৈনিক আর রাইয়ুল আম
২৪ । মাসিক আর রিসালা ।
২৫ । মাসিক আল ফিকরুল আরাবী আল মুআসির
২৬ । দৈনিক আকতুবার
২৭ । মাসিক আল উসরা
২৮ । আল মানারুল জাদীদ
২৯ । দৈনিক উকায
৩০ । মাসিক আল বয়ান
৩১ । আল মাজমাউল রাবীলিল মুহাসিবীনাল কানূনীন
৩২ । মাসিক আশ-শাকায়েক ।
৩৩ । মাসিক আল-মুশাহিদুস-সিয়াসী ।
৩৪ । মাসিক আল-ওয়ায়ুল ইসলামী ।
৩৫ । দৈনিক রাষ্ট্রীয় সাহারা (উর্দূ)
৩৬ । The times of India
৩৭ । The Economist
৩৮ । Mew Left Review
৩৯ । International Herald Airbune
৪০ । The Crlobulist

ওয়েব সাইট

http://www.ummah.com
http://www.islamway.com
http://www.islamweb.net
http://www.krysstal.com/english.html
http://www.aljazeeth.net
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter

PP

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক ওয়ারলেছ রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১১-১২৮৫৮৬
e-mail : professors_pub@yhaoo.com
ISBN : 984 31 1426 55